ষড়বিংশ বর্ষ।] [১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৯ সাল।

আলোচনা

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ম্যানেজার ও স্বত্বাধিকারী—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

কর্ম্মযোগ প্রেস,

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

IMPERIAL LIBRARY

বার্ষিক মূল্য—সডাক ২৷৶০ দুই টাকা ছয় আনা মাত্র। এই সংখ্যার মূল্য।০ চারি আনা।

সূচী পত্র।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
১।	আশা	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব	১
২।	ব্রত গ্রহণে	শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু এম্‌-এ, বি-এল্‌	৩
৩।	বশিষ্ঠের তপোবন	শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে সেন	৭
৪।	ত্রিবেণী	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ	১৮
৫।	শিবরাত্রি	পণ্ডিত শ্রীদাশরথী স্মৃতিতীর্থ	২৫
৬।	শুক্রনীতিসার	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব	৩০

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

"অষ্টাদশটী কথা"

ইংরাজী ১৯২২ সালের ক্যালেণ্ডার সহিত

ছবির মত ছাপা।

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলেই পাইবেন।

সত্বর হউন

বিলম্বে হতাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—

কর্ম্মযোগ প্রেস—হাওড়া।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ বর্ষ।

ম্যানেজার ও সত্বাধিকারী—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

হাওড়া, ৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে

শ্রীযুগলকিশোর সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ২।৵০ আনা।

১৩২৯ সালের আলোচনার সূচীপত্র।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	আশা	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতির্ষার্ণব	১
২।	ব্রতগ্রহণ	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল্	৩
৩।	বশিষ্ঠের তপোবন	শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে সেন	৭
৪।	ত্রিবেণী	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ,	১৮।৩৪।১০০।১২০। ১৩৮।১৭০।২১১।২৫০।২৭৬।৩১৮।৩৩৭।৩৬৮
৫।	শিবরাত্রি	পণ্ডিত শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ	২৫।৪৬।১৫১
৬।	শুক্রনীতি সার	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতির্ষার্ণব	৩০।১৯৫।২৩১।২৯৫।৩১৫।৩৮৭
৭।	ধর্ম্ম আমার	শ্রীজয়কুমার বর্দ্ধন রায়	৩৩
৮।	সংসার ধর্ম্ম	শ্রীযোগীন্দ্রমোহন বিশ্বাস	৪১
৯।	রাজা দিলীপের গোচারণ	শ্রীকিশোরীমোহন চৌবেসেন	৫৮
১০।	আজকালের বৈদ্যবুড়া	ঐ	৬৯।১৪৬।২০৫।২৪৫।৩৩৫
১১।	শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	৭৩
১২।	কমলার মা	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য	৭৪
১৩।	পাগলের কথা	শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২।১১৬।২১১
১৪।	ইন্দ্ররঘুর যুদ্ধ	শ্রীকিশোরিমোহন চৌবেসেন	৮৯
১৫।	কেন জাগাইলে	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	১০৫
১৬।	শ্রীকৃষ্ণের রূপ	শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী	১০৫
১৭।	গুরুকরণ	শ্রীচন্দ্রশেখর রায়	১১১

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১৮।	এড্‌ভার্টাইজিং	শ্রীতারাপদ বন্দোপাধ্যায়	১২৪।১৫৯।২৩৩
১৯।	জন্মাষ্টমী	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন	১২৭
২০।	সভ্যজাতির সময় নরমেধ	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	১২৯।১৫৬
২১।	তপোবন	পণ্ডিত শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ	১৩৭
২২।	রঘুর দিগ্বিজয়	শ্রীকিশোরিমোহন চৌবেসেন	১৬২।১৯০
২৩।	মাতৃপূজা	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব	১৬৯
২৪।	দুর্গাপূজা	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন	১৭৫
২৫।	মানব জাতি	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	১৭৮
২৬।	গ্রহণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব	১৮১
২৭।	মায়ের পূজা	গীতার যৌগিক ব্যাখ্যাকার	১৮৫
২৮।	মতিঘোষের মহাপ্রয়াণ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	১৮৮
২৯।	ভ্রান্তি	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ	২০০।২০২
৩০।	শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব	২০১
৩১।	ক্ষমাভিক্ষা	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দে	২১০
৩২।	কোজাগরী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২১০
৩৩।	কেরাণী স্তুতি	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	২২৮
৩৪।	নির্ভরতা	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	২৩৩
৩৫।	গান	শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক	২৩৭
৩৬।	কতই রূপ	শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী	২৩৮
৩৭।	মুক্তি	গীতার যৌগিক ব্যাখ্যাকার	২৪২
৩৮।	গয়ার ইতিহাস	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল	২৬২।৩২৭।৩৮৪
৩৯।	রঘুর সুমেরুতুল্য হিরণ্যদান	শ্রীকিশোরিমোহন চৌবেসেন	২৬৫
৪০।	জীবে প্রেম	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	২৮৩

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা
৪১।	পঞ্চমকার	শ্রীচন্দ্রশেখর রায়	২৮৫
৪২।	ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য	শ্রীসন্তোষকুমার দাস এম্-এ	২৯০।৩১৩
৪৩।	যাবার বেলা.	শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিশ আলি	২৯।
৪৪।	অনুযোগ	শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়	২৯৭
৪৫।	কেলেঙ্কারি	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ	২৯৮
৪৬।	জ্যোৎস্নারাত্রি	শ্রীরাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়	৩২৬
৪৭।	শ্রীকৃষ্ণের বংশী	শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস	৩২৯
৪৮।	ভারতীয় ভাব	পণ্ডিত শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ	৩৩১
৪৯।	শ্রীচৈতন্যপ্রয়াণে	শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী	৩৩৫
৫০।	প্রাচীন আর্য্যসমাজে প্রতিলোম বিবাহের উৎপত্তি ও প্রসার	শ্রীললিতমোহন রায়	৩৪৫
৫১।	গোরক্ষা	শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য	৩৫১
৫২।	অন্নপূর্ণা	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৫৬
৫৩।	কোন পথে	শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী	৩৬০
৫৪।	দ্রৌপদী	শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ	৩৬১
৫৫।	ওমর খৈয়ামের বাণী	শ্রীসন্তোষকুমার দাস এম্-এ	৩৬২
৫৬।	লোক ও জাতি সম্বন্ধে ধারণা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	৩৭৭
৫৭।	রতন না মিলিল	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দে	৩৮০
৫৮।	দুই দিক্	পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতির্ণার্ণব	৩৮৬
৫৯।	রত্নকণা	শেখ মহম্মদ ইদরিস আলী	৩৮৬

সমাপ্ত।

বশিষ্ঠের তপোবন—৫১ ও ৫২ শ্লোক।

শ্রীশ্রীকালীকায়ৈ নমঃ।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

ষড়্‌বিংশ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২৯ সাল। [প্রথম সংখ্যা।

"আশা"।

(শ্রীভবতোষ জ্যোতির্মার্ণব।)

অজ্ঞানে অতীত স্মৃতি প্রহেলিকাময়ী ,
কিছু জানি নাই।
বৃশ্চিকদংশন সম যন্ত্রণার মাঝে ;
রয়েছি সদাই ॥
ভবিষ্যৎ গাঢ়তম নয়নবারক ;
দেখা নাহি যায়।
কিরূপে আনিব স্নিগ্ধ শান্তি হৃদি পরে ;
না দেখি উপায় ॥
কে তুমি ! আনন্দময়ী আনন্দ দানিতে ;
দেখাও আলোক।

পারিবে কি নিবারিতে দগ্ধ হৃদয়ের ;
আকুলিত শোক ?
শীর্ণ হৃদি জীর্ণ প্রাণ রাক্ষস তাড়নে ;
ভগ্ন ধ্বস্ত প্রায় ;
কত জ্বালা, কত ব্যথা জানাব কাহারে ;
জানিবে কে হায় !
পার যদি দিতে হেথা শান্তিবারি ধারা ;
অজ্ঞাননাশিনি।
পার যদি জাগাইতে অঙ্গুলি-চালনে ;
ত্রিদিবের ধ্বনি।

এস মা এস মা তবে দীন আকিঞ্চন ;
কবহ পূবণ।
শুধু আশারূপে কেন চপলার মত ;
ধাঁধিছ নয়ন ?
সাধি যদি এইরূপে আপনার কাজ ;
দগ্ধহৃদি লয়ে।
ক্ষণেকে মিশায়ে যাইবে আনন্দিত মনে ;
নির্ম্মম হইয়ে ॥
চাহিনা চাহিনা তোমা ওগো মায়াবিনী ;
যাও যথা তথা।
থাকিব পড়িয়া আমি পরিত্যক্ত মত ;
মনস্থুখে হেথা ॥
ছুটিযাছি বহুদিন তোমাব আশ্বাসে ;
কর্ত্তব্যরহিত।
শ্রান্তিহীন দিশেহারা মুগ্ধ মূঢ় প্রায ;
সংকল্পসহিত ॥
কতরূপ তব খেলা নূতন নূতন ;
হেরিয়া সদাই।
হয়েছি হতচেতন, বলিয়াছ যাহা
সাধিতে তাহাই ॥

ভয় হয় পরকালে কি হবে উপায় ;
করিলাম যাহা।
যাইয়া কি সাথে মম করিবে উদ্ধাব
সেই থানে তাহা ?
অথবা কিসের ভয়, জেনেছি নিশ্চয় ;
মায়েরই বিভূতি।
সর্ব্বরূপে বিবাজিছে সংসারমাঝাবে
লইয়া সংহতি ॥
আশারূপে মাতা যদি না থাকিত সদা ;
হৃদয়ে মোদের।
থাকিত না কোন কালে শৃঙ্খলা কিছুর ;
বন্ধন ভবের ॥
পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা পত্নী প্রিয়জন ;
স্নিগ্ধ ভালবাসা।
পাইত না জনগণ অমৃত-সন্ধান
পরম ভরসা ॥
যে দেবী সকল হৃদে হয়ে স্থিতিমতী ;
আশা-স্বরূপিণী।
প্রণমি প্রণমি তাঁরে প্রণমি সর্ব্বদা
দিবস যামিনী ॥

ব্রতগ্রহণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু।)

(২)

দ্রোহাদ্দেবৈ[illegible]বাপ্তানি দিবিস্থানানি সর্ব্বশঃ।

মহাভারত।

মাতা পুত্র আহারান্তে কক্ষতলে বসিয়াছিল। অর্থহীন অসম্বদ্ধ ভাষায় মাতা ও শিশুপুত্রে আলাপ রীতি। সে ভাষার সন্ধি নাই, বিচ্ছেদও নাই—ধারা নাই, ব্যাকরণও নাই। স্নেহ-হর্ষ-আনন্দ অভিব্যক্তির ভাষা আজও সৃষ্টি নাই। শিশুপুত্রকে চুম্বন করিয়া মাতা কখনও ক্লান্ত হয় না—শিশুকে আদরে ঢেকে রাখবার কোন আবরণ মাতা খুঁজিয়া পায় না। পুত্রস্নেহ ও পতি অনুরাগ একত্র যুগপৎ প্রকাশের ভাষা কোন শব্দকার আবিষ্কার করিতে পারে না। প্রেমময়ী জায়া কি সেজন্য পুত্রবতী হইতে এত সাধ করে?

সতু বাবু দাঁড়িয়ে আছে—মায়া তাহার হাত ধরে দরজার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসে আছে। সতুবাবু কচি কচি গালভরা খিল খিল হাসিতে মায়াকে প্লাবিত করিতেছিল—মাতাও সে স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছিল। সতুবাবু চুল টানিয়া টানিয়া হৃদয়ের অজ্ঞাতভাব জানাইতেছিল—মাতা শান্তিস্বরূপ সতুবাবুর ফুটন্ত গণ্ডদেশ চুম্বনে চুম্বনে রঞ্জিত করিতেছিল। মায়া তখন জগৎসংসার ভুলে গেছে—বুঝিবা আপনহারা হয়ে গেছে। ক্রীড়ানিরতা মায়ার পৃষ্ঠদেশের বসন সেই বিমল আনন্দ উপভোগের অসুবিধা দেখিয়া বহুক্ষণ স্বস্থানচ্যুত হয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম সারা পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত হইয়া বসনের অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন একরাশি স্বর্ণচাঁপা ফুলের উপর কৃষ্ণবর্ণ বিষধরগণ খেলা করিতেছে—চারিদিকে সঞ্চরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধগতি হইয়া ফনা-বিস্তার করিয়া আছে।

মায়ার রূপে যোগেশ মুগ্ধ, গুণে মনপ্রাণ ভরা। দ্বারদেশে আসিয়া এখন এই মাতৃগর্ব্ব-স্ফুরিত মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া অপরূপ ভাবে বিভোর হইল। নিঃশব্দে সে স্বর্গীয় সুষমা যেন পান করিতে লাগিল। সে সেই দেবদুর্ল্লভ দৃশ্যের ব্যাঘাত করিতে পরিল না।

এই ভাবে কতক্ষণ যে কাটিল যোগেশ বা মায়া কেহ জানিল না। সতুবাবুর অস্ফুট ঐ—ই—বা—বা! শব্দে মায়ার ঈষৎ চমক ভাঙ্গিল। এবং পুত্রকে চুম্বন করিতে গিয়া অতর্কিত বাধা পাইয়া আর মুখ অগ্রসর করিতে পারিল না—

যোগেশ ইতিমধ্যে মায়ার গণ্ডদ্বয় পশ্চাৎ হইতে চাপিয়া ধরিয়াছেন।

লজ্জারক্ত মুখে মায়া বলিল আঃ! হাত ছাড় না। ছেড়ে দাও।

যোগেশ চমকিত হইয়া দুই হাত ছাড়িয়া দিল এবং বলিল—ওগো, যশোদা রাণী! তোমাদের খেলা দেখে আমি একদম সব ভুলে-ছিলাম। আমার মনে হলো কতকগুলো কালো কালো সাপ বড় বড় চক্র বিস্তার করে সতুকে কামড়াতে যাচ্ছে—তাই তাড়াতাড়ি তোমার গণ্ডদেশ দুই পাশ হ'তে চেপে ধরেছিলাম।

মায়া—আহা মরি মরি, নবীন কবির কল্পনার বলিহারি যাই। আজ মা মনসার পূজা পাঠিয়ে দিই। অমন কথা মুখে আনে? একরত্তি বংশের দুলাল! বলিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

যোগেশ প্রথম একটু থতমত খাইয়া গেল—পুত্রের অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা করিয়া নিমেষে হাসি অধরে মিলিয়া গেল। একটু পরে ব্যাপার বুঝিয়া আপনার নবোদ্গম কবিত্বকে গালি দিল—হাসতে হাসতে বলিল তাই রক্ষা! আমি মনে করেছিলাম কি কু-কার্য্যই করে ফেলেছি।

মায়া—বলি, "আজ অসময়ে কেন হে তব প্রকাশ?" দেখছি পুরুষ জাতই বড় হিংসুক। দুপুরবেলা মায়ে-পোয়ে একটু আনন্দে মেতে ছিলাম সেটা বুঝি তোমার প্রাণে সহ্য হলো না। হাতে দেখছি "পত্রিকা"। কিছু নূতন খবর আছে নাকি? কিছু নূতন খবর না থাকলে এমন অসময়ে তোমার দর্শন পাই?

যোগেশ "ভালবাসি বলে তোমায় ছুটে ছুটে দেখতে আসি।" কি করে সহ্য হয় বলো। তুমি হলে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী তাই তোমার সুখের অর্দ্ধেকও যে আমার প্রাপ্য মায়া? এখন দেখছি বেশ লাভ হলো স্বর্গের ছবি দেখতে পেলাম আমার আপন কুটীরে। আজকের কাগজে আমার ব্যবসা ত্যাগের কথা আছে। আর পাঁচগাছাতে মিটিং করতে গেছলুম তার খবর দিয়েছে।

মায়া আচ্ছা, তুমি এত লোকের সামনে কি করে বক্তৃতা করো? তোমার কথা লোকে শোনে? সেদিন কি তোমাদের গান্ধীর সভা হয়েছিল? ঝড়ের মতন এই প্রশ্নগুলি করিয়া মায়া নিশ্বাস গ্রহণ করিল এবং বলিল—দেখ তোমাদের নন কো-অপারেসন ব্যাপারটা এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। যখন ভাবি সকলে ইংরাজের দপ্তর-তন্ত্রের সংশ্রব ত্যাগ করবে তখনই একটা বড় খট্‌কা প্রাণে

লেগে যায়। আর যদি তাই সম্ভবও হয়, তাহাতে ইংরাজের কি ক্ষতি হবে?

যোগেশ—ইংরাজের ক্ষতি করা আমাদের একটুও ইচ্ছা নাই। দেখ, হাত পা মুখাদি যদি পেটের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করে, তাহলে এত বড় দেহটা খাড়াভাবে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। ভারতবাসীই দপ্তর-তন্ত্রের কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ যদি ভারতবাসী দপ্তর-তন্ত্র হ'তে সরে দাঁড়ায় তাহ'লে কতক্ষণ এই ইংরাজের দপ্তর-তন্ত্র দাঁড়াতে পারে?

মায়া—এইবার মাণিক জোড় মিলেছে, রতনে রতন চিনেছে। শালা-ভগ্নিপতিতে মিলে এবার দেশোদ্ধার করলে দেখতে পাই। স্কুল কলেজের ছেলেরা সরকারী চাকরী করে না। বসে বসে পড়ে মাত্র। কাহারও সঙ্গে কোনও সংস্রব নাই। তাদিকে স্কুল কলেজ ছাড়াবার জন্য এত উঠে পড়ে, লেগেছো কেন? ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়লেই কি দেশোদ্ধার হয়ে যাবে? হুজুকে পড়ে ছেলেদের কাঁচা মাথা খেয়ে ফেল্‌ছো।

যোগেশ—ভারতগভরমেণ্ট, স্কুল কলেজ আদালত, পুলিশ এবং সেনারূপ চারিটি প্রকাণ্ড থামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। ছাত্ররাই জাতীয় জীবন। ছাত্রের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে কালকূট গরল সঞ্চার করেছে। বিকৃত ইংরাজিশিক্ষাই এই হলাহল। এই শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের দেশের যুবকগণের মনের গতি দিন দিন মসীবর্ণ ধারণ করেছে। মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত কেবল কতকগুলি বিলাস-প্রিয় নীচ, স্বার্থপর কেরাণী, উকিল, আর দালালের সৃষ্টি করেছে। সরলতা, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান মোটেই থাকে না। স্বাধীন চিন্তার নামে দেশময় একটা হিংসা, বিদ্বেষ ও দলাদলির আগুন ছুটায়। ছাত্রদের আর এই প্রাণঘাতী বিষ পান করিতে দেওয়া হবে না। আমাদের গান্ধীর ধর্ম্মযুদ্ধে তারাই সেনানায়ক। তাদেরই যুদ্ধ—আর জয় তাদেরই হাতে। তারাই নচিকেতা—মৃত্যুর নিকট আজ মুক্তি-প্রয়াসী। ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়লেই দপ্তর-তন্ত্রের একটা শক্ত অবলম্বন ভেঙ্গে পড়বে—মূলে কুঠারাঘাত পড়বে।

মায়া—উকিল ব্যারিষ্টারগণ স্বাধীন ব্যবসা করছে। সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্য করছে। তাদের আদালত ছাড়লে দেশময় একটা বিষম অরাজকতা আসবে। তাদের ব্যবসা ত্যাগ করবার জন্যে তোমাদের এত জেদ কেন? তারা বরং স্ব স্ব ব্যবসার মধ্যে থেকে দেশের কাজ আরও ভাল করে কর্‌তে পার্‌বে।

যোগেশ—আদালতে শাঁকের করাতে যেতে আসতে কাটার মত বাদী প্রতিবাদীর ধ্বংস-কারী এক প্রকার বিচারাভিনয় হয়। বহুরূপী আইনজীবিগণ এই যন্ত্রের প্রধান পরিচালক। আদালতের তথাকথিত চুলচেরা বিচার ও মিথ্যা ন্যায়বিচার-জ্ঞান সাধারণের মনোমধ্যে এই জীবগণ বিস্তারিত ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ভাইয়ে ভাইয়ে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে বিবাদ উৎপন্ন করাইয়া এবং উপদেশ-মৃতদানে সেই বিবাদ বদ্ধমূল করে দিতে এই ইংরাজ রচিত জীবগণ বিশেষ পটু। লোকের "ভিটে মাটি চাঁটী" করে দিতে এই শ্রেণীর জীবগণকে কেহ অতিক্রম করতে পারে না। মিছরির ছুরী লোকের গলায় ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বসাইয়া দিতে এই আইনজীবিগণ দুর্ব্বৃত্ত দস্যুকেও পরাস্ত করে। থিয়েটারে সেই আমড়া গাছ নিয়ে মোকদ্দমা দেখেছো। আইনের, ন্যায়ের দোহাই দিয়া ইহা অপেক্ষা আরও কতপ্রকার যে নৃশংস দিবালোকে হত্যাকাণ্ড হয়। যাহারা একবার দুর্ভাগ্যক্রমে আদালতে পদার্পণ করেছে সেই ভুক্ত-ভোগীরা বিশেষরূপ অবগত আছেন। "তোর ঘরে মকদ্দমা ঢুকুক"—এর চেয়ে কঠিন অভিশাপ এখন মানুষ মানুষকে দিতে পারে না। আইনজীবিরা বিচার কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাক—বরং বিচারকে ভোঁতা কাটারি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জবাই করে। দেশের লোকের নিঃশেষে উচ্ছেদ করা যদি দেশের কাজ হয়, ইহারাই তাহলে প্রকৃত দেশসেবক। লোকের অনিষ্টের উপর যে ব্যবসার ভিত্তি সে ব্যবসায়ীর দ্বারা দেশের কোন কল্যাণ হইতে পারে না। ফলতঃ আদালতে ন্যায়বিচার সাধারণ লোককে সাপুড়ের সাপের মতন নির্জীব ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। আইন জীবিগণ আদালত ছাড়লেই আর প্রজাসাধারণ দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেই ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের ন্যায়-পরায়ণতার গৌরব ও মর্য্যাদা আকাশ সৌধের ন্যায় আকাশে বিলীন হয়ে যাবে।

মায়ার ভাই সরোজ এই সময়ে একটী স্বদেশী গান গাইতে গাইতে আসিল :—

"কংশ কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তোমার রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাহার সন্তান।"—

গানের ভাবের বন্যায় তানলয় সুর সব ভেসে গেছে। সরোজ বি, এ, ক্লাসে পড়িত। নন-কো-অপারেসান হুজুকে কলেজ ছেড়ে স্বেচ্ছা-

সেবক হয়েছে। পায়ে জুতা নাই গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী ও চাদর। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যোগেশের সঙ্গে দেশের কথার আলোচনায় নিবিষ্ট হয়ে গেল।

ক্রমশঃ।

বশিষ্ঠের তপোবন।*

(শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে সেন।)

কথা ভাবে যেই ভাবে
যুক্ত ভাবে রয়,
একে অন্য পুনঃ ভিন্ন
বলি গণ্য হয় ;
বিশ্ব পিতা বিশ্ব মাতা
পুরুষ প্রকৃতি,
তথা স্থিত ; দেবভূত
হর ও পার্ব্বতী।
নমি তাঁদে রচনায় বসিয়াছি আগে
কথা ভাব বোধ মোর সদা যেন জাগে।
সূর্য্যদেব হ'তে যেই বংশের বিকাশ,
স্বল্পমতি মম তা'য় বর্ণিবারে আশ।
মোহবশে ভেলামাত্র সম্বলে সাগর
উতরিতে সুদুস্তর, হ'তেছি তৎপর। ২।
কবি বলি' যশোলাভ করিবারে গিয়া,
মূঢ় আমি উপহাস আনিব কিনিয়া ;
লোভে পড়ি' দীর্ঘাকার-লোক-লভ্য ফলে
বামন তুলিলে হাত তাহাইত মিলে। ৩।

কালিদাস দার্শনিক শাক্ত ছিলেন ; তিনি গ্রন্থারম্ভে পুরুষ ও প্রকৃতির অবতার হর-পার্ব্বতীকে বন্দনা করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরে শাক্তও বিরল, এবং কালিদাস নামও বিরল। এই উভয় বিধ কারণে মহাকবি বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়। তাঁহার অন্য নাম মাতৃগুপ্ত, অর্থাৎ মাতৃদাস গুপ্ত। মাতৃদাস ও কালিদাস সমার্থক, বোধগম্যতর বলিয়া কালিদাস নামটীই সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্য অতুল সাহসে দুর্দ্ধর্ষ শকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া সাহসাঙ্ক ও শকারি নামে প্রসিদ্ধ হয়েন, এবং সম্বত শাক প্রবর্ত্তিত করেন, কালিদাস তাঁহার নবরত্ন সভার প্রধান রত্ন থাকায় কাব্য রচনার পুরস্কার স্বরূপ কাশ্মীরের রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের দেহান্ত ঘটিলে তৎপুত্র প্রবর সেনকে কাশ্মীর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া কালিদাস বানপ্রস্থী হইয়া কাশীবাস করেন।

* ইহা মহাকবি কালিদাস বিরচিত রঘুবংশ কাব্যের প্রথম সর্গ দর্শনে রচিত।

কথা ও ভাব অর্থে শব্দ ও অর্থ, উপমার অনুরোধে একটী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ও একটী পুংলিঙ্গ শব্দ একত্র যোজিত হইয়াছে।

অথবা শলাকা-বিদ্ধ মণির ভিতরে,
হীনবল সূত্র সেও সুখে গতি ক'রে।
সেইরূপ বহুকবি-বর্ণিত এ কুলে
আমারো প্রবেশ লাভ হইবে কুশলে। ৪।

এই বংশে মহামতি মহীপতি যেবা
সর্ব্ববিধ সংস্কারেই সু-পবিত্র সবা।
কর্ম্মেতে বিরামদান ফলোদয় হ'লে।
রাজত্ব সীমান্ত হয় সাগরের কূলে।
ইন্দ্রের সাহায্যে রথ স্বর্গে কভু ধায়
নিত্য রত অগ্নিগৃহে হোম সমাধায়। ৫।

অর্থীর কামনা মত তা'র আরাধনা,
অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডের যোজনা,
যথা-কালে জাগরণে রাজ্যের চিন্তন,
ধনের সঞ্চয় শুধু দানের কারণ। ৬।

সত্যের সম্মান হেতু পরিমিত-ভাষী,
যশের আশায় দিক্—বিজয়াভিলাষী।
বংশ র'বে বর্ত্তমান হইলে কুমার,
এ হেতু গৃহস্থ-ধর্ম্ম—কলত্র স্বীকার। ৭।

বিদ্যা যত শৈশবেই সকল অভ্যাস,
যৌবনের কালে মাত্র ভোগে অভিলাষ।
আসিলেই বৃদ্ধভাব মুনি ভাবে বনে,
অন্তকালে তনুত্যাগ পরমাত্ম-ধ্যানে। ৮।

যদিও লিখিতে, কথা সহজে না সরে,
ক্লেশ কিছু নাহি হেরি' প্রবেশের তরে,
যত হ'তে এই বংশ বর্ণির যা' হয়।
তাহাদের ভূরি ভূরি গুণ অতিশয়।

কালিদাস দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ কবিতায় আপনার কত বিনয় দেখাইতেছেন, আপনাকে সূত্রের ন্যায় বলহীন বলিতেছেন। অথচ বলহীন হইলেও তাহার সূত্রের ন্যায় মালা-রচনার যোগ্যতা স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহার উপমা প্রয়োগের অদ্ভুত গুণ আছে।

স্বর্গের এক অর্থ জরাব্যাধিবিহীন, সুখকর, সুদৃশ্য প্রদেশ। নব্য এসিয়ার কশ্যপায়ন হ্রদের পূর্ব্ব কূলবর্ত্তী স্থান সর্ব্বভূতের আদিপিতা কশ্যপ ঋষির তপোবন। দেবলোক স্বর্গ বা ইলাবর্ষ উহারই উত্তরে। নরলোক ভারতবর্ষ উহার দক্ষিণে, (আফগানস্থান ঐ প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত।) কশ্যপ তীর্থের অপর দুইটী নাম অন্তরীক্ষ লোক ও হরিবর্ষ।

দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সাহায্যার্থ আহূত হইলে দুষ্মন্ত প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরাক্রান্ত নরপতিগণ কশ্যপ তীর্থ হইয়াই দেবলোকে গমন করিয়াছেন। দেবলোকে যাইবার পথ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে বর্ণিত রহিয়াছে।

আফগানস্থানের ভাষায় রদ শব্দের অর্থ নদী। হরিবর্ষ হইতে নিঃসৃতা নদীর নাম হরি-রদ। ঐ নদীর উপর হেরাদ বা হেরাত নগর অবস্থিত। আফগানস্থান যে প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তগত তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে। গান্ধারী ও পাণিনি ঋষির জন্মস্থান গান্ধার দেশেই "কান্দাহার" বলিয়া বর্ত্তমান কালে পরিচিত। ঐ সকল অঞ্চলে অনেক হিন্দুর চিরকাল বাস। মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে তথাকার সকলেই হিন্দু ছিলেন।

শ্রবণকুহর-মধ্যে করিয়া প্রবেশ,
চপল করিয়া মোরে তুলিছে অশেষ। ৯।

এই সেই রঘুবংশ পুঁথি খান শুন,
সভাগৃহে সমবেত যত সুধী জন।
ইথে যেবা গুণ-দোষ কলহ বিচারে,
অমল সমল হেম অনলেই ধরে। ১০।

বেদারম্ভে আদিতেই যেমন ওঙ্কার,
বেদ সনে প্রণবেরি যেমন প্রসার,
মুনির সমাজে মান্য ভানুদেব-সুনু,
রাজবংশ-বিস্তারের মূলে রাজা মনু। ১১।

ক্ষীরনিধি সম শুচি কুলে তাঁর জাত,
দিলীপ অধিক শুচি কলানিধি মত। ১২।

স্কন্ধদৃঢ় বৃষসম, বক্ষবিস্ফারিত,
শাল-সমুন্নত দেহ, বাহু সুলম্বিত,
স্বকর্ম্মের অনুকূল ধরি' কলেবর,
ক্ষাত্র-ধর্ম্ম বর্ত্তমান যেন ধরা'পর। ১৩।

সারে শ্রেষ্ঠ সকলের, সর্ব্বজয়ী তেজে,
সত্ত্ব হ'তে উচ্চতনু নৃপবর সে যে,
শৈলবর মেরুসম গুণে এ সকল,
অধিকারি' আছিলেন মেদিনী-মণ্ডল। ১৪।

আকারে যেমন ছিল শ্রেষ্ঠ সবাকার
মেধাতেও সেইরূপ প্রধান আবার।
মেধাশক্তি-অনুরূপ শাস্ত্রে পরিচয়,
পরিচয় মত সেই অশেষ আশয়।
যেমন আশায়, ক্রিয়া তেমনি বহুল,
ক্রিয়া যথা, ফলোদয় তেমনি বিপুল। ১৫।

রতনের লোভে লোকে রত্নাকরে ভজে,
জলজন্তু হেতু কিন্তু শঙ্কা নাহি তাজে।
সেইরূপ রম্য গুণে ভীম গুণে পুনঃ,
সভয়ে সেবিত তাঁর পার্শ্বচরগণ। ১৬।

হেন তিনি নিয়ামক প্রজাগণ তার,
মনু-প্রবর্ত্তিত যাহা পদ্ধতি আচার,
বাহিরে তাহার নহে রেখামাত্র গত,
রথ-নেমি চক্র-পথে যথা রয় স্থির। ১৭।

প্রজা হ'তে রাজস্বের গ্রহণে নিবেশ,
তাহাদেরি শ্রীবৃদ্ধির সাধনে অশেষ;
রবি যথা রসভাগ আকর্ষণ করে,
সহস্র গুণেতে তাহা বিতরণ তরে। ১৮।

এদেশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে কোনও ব্যক্তি কোনও পুস্তক রচনা করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে রাজসভার গ্রন্থ পরীক্ষা বিভাগের বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক সেই পুস্তকের পরীক্ষা হইত। পরীক্ষান্তে নৃপতি গ্রন্থকারকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেন, এবং লিপিকর বিভাগে সেই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেন। প্রতিলিপি প্রস্তুত হইলে রাজ্যের প্রতি চতুষ্পাঠীতে এক এক খণ্ড, এবং অপর রাজ্য-গুলির রাজসভায় এক এক খণ্ড প্রেরিত হইত। অপর রাজারাও প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া এক এক খণ্ড স্ব স্ব রাজ্যের চতুষ্পাঠীতে বিতরণ করিতেন। এইরূপে নূতন পুস্তক সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত।

কালিদাস এই দশম কবিতায় ইঙ্গিত করিতেছেন যে সীতার ন্যায় তাঁহার পুস্তিকা অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হওয়াই ভাল।

চতুরঙ্গ বল যেবা ভূষা মাত্র তাঁ'র,
প্রযোজন-সংসাধনে দু'টি বস্তু সার ;—
প্রথমতঃ নীতিশাস্ত্রে জ্ঞানশক্তি-ছটা,
অতঃপর শরাসনে জ্যা-রোপণ ঘটা। ১৯।
মন্ত্রণাগোপনে, গূঢ় ইঙ্গিত আকার ;
সংসাধিত হ'লে, তবে, প্রয়োগ তাঁহার,
ফলোদয়ে অনুমানে লোকে অবগত,
জন্মান্তরকৃত ক্রিয়া-সংস্কারের মত। ২০।
নির্ভীক তথাপি দেহ রক্ষক প্রচুর,
সুকৃতি সঞ্চয়, রোগে না হ'যে আতুর।
নির্লোভ হইয়া ধনে, ধনের অর্জ্জন :
সুখ-ভোগ, কিন্তু সুখে আসক্তি বর্জ্জন। ২১।
জ্ঞান সত্ত্বে মৌনভাব, সামর্থ্যেও ক্ষমা,
বিতরণে, স্বক্রিয়ার কভু না গরিমা।
বিরোধী এসব গুণ তাঁহার অন্তরে
বিরাজিত নিরন্তর সোদর-আকারে। ২২।

হৃদয় না বিষয়ের বসে বশীভূত,
বিদ্যারূপ সমুদ্রের অন্তে উপনীত,
ধর্ম্মেই সতত রতি, বয়সেতে যুবা,
জরা বিনা দিলীপে বৃদ্ধ ভাব কিবা ! ২৩।
প্রজাদের বিদ্যাদান-বিধান কারণ,
ত্রাসেরে আশঙ্কা মাত্রে করি নিরসন,
ভরণের ল'যে ভার তিনি তাদের পিতা,
পিতা যা'রা সবে তা'রা মাত্র জন্মদাতা। ২৪।
অর্থদণ্ডে অভিলাষী ক্ষতির পূরণে,
পরিণয়ে প্রীতিমান্ পাইতে সন্তানে ;
এমনে মনীষী ভূপ, যেবা অর্থকাম,
সম্পাদয় তাহাদেরো ধর্ম্মে পরিণাম। ২৫।
ভূ-দোহনে হ'ত তার যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
খ দোহনে করিতেন ইন্দ্র জলদান ;
সম্পদের বিনিময়ে এরূপে উভয়ে
পোষণে তাঁহারা রত ভুবনের দ্বয়ে। ২৬।

মঙ্গোলিয়া ভাষায় নর শব্দের অর্থ জল। ঐ জলার্থক নর শব্দ মঙ্গোলিয়ার লব-নর, কোক-নর, ও ত্রাম্পি নর শব্দে বিদ্যমান ভারতবর্ষের নারায়ণ শব্দ ঐ জলার্থক নরশব্দ-মূলক। এ কথা মনু জানিতেন, ভারতবর্ষের লোক জানিতেন না। সেই নিমিত্ত মনুকে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। সূর্য্যঋষিপুত্র মনু মঙ্গোলিয়া দেশের অধিবাসী হইতে পারেন, জল প্লাবনের সময় তিব্বতের দিক হইতে আসিয়া উচ্চ হিমালয় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ভারতবর্ষের দিকে ভূমি অগ্রে শুষ্ক হইলে, এই দিকেই অবতীর্ণ হয়েন। শীত প্রধান মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী বলিয়া তাঁহার প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ ছিল। মঙ্গোলিয়াতেও ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদের চর্চ্চা হইত। জলপ্লাবনান্তে মনু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়াই এ দেশে বেদ পুনর্ব্বার সহজে প্রচার হইয়াছিল। ইহাই কাব্যাদিতে রূপক মুখে প্রলয় কালে মনুর নব বিধানে মৎস্য কর্ত্তৃক বেদ রক্ষা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে। ঐ প্রলয়-জনিত মন্বন্তরের পর ভারতবর্ষীয়েরা বেদ বৈবস্বত মনুকে বিনীত দেখিয়া উপযুক্ত বোধে তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন। (মনুসংহিতা ৭২-৭ সঃ।)

যজ্ঞ পুংলিঙ্গ শব্দ। পুরাণাদিতে যজ্ঞ পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিব-রহিত দক্ষযজ্ঞে অনিমন্ত্রিত

সুযশ রক্ষক বলি ছিল যা তাঁহার
নাহি ঘটে তাহা কোন অপর রাজার'
কারণ পরস্ব সহ নষ্ট পরিচয়,
তস্করতা অভিধানে স্থিত মাত্র রয়। ২৭।

শত্রু যদি গুণবান তাহারো সম্মান,
পীড়িতের স্থানে তিক্ত ঔষধ সমান।
প্রিয় যেবা ত্যজ্য সেও হানি যদি করে,
উরগ-দংশনে দুষ্ট অঙ্গুলি-আকারে। ২৮।

মহাভূত-গঠনের যে যে উপাদান,
বিধি বুঝি তাঁরে কৈল তা'তেই নির্ম্মাণ;
যে হেতু যতেকগুণ তাঁহারো শরীরে,
সকলেরি বিনিবেশ পর উপকারে। ২৯।

সিন্ধুকূল যাহে হয় প্রাচীর-বেষ্টন,
সাগর সকল যা'য় পরিখা মতন,
অন্যের শাসন হীন তিনি সে ধরায়
অনায়াসে শাসিতেন এক পুরী প্রায়। ৩০।

মগধ-বংশীয়া যিনি মহিষী তাঁহার
দাক্ষিণ্য গুণের যেন পূর্ণ অবতার।
অবিকল যজ্ঞপত্নী দক্ষিণার মত
এই হেতু সুদক্ষিণা নামেতেই খ্যাত। ৩১।

বসুধার হইবারে তিনি অধীশ্বর
যদ্যপিও পত্নী লোভ হইল বিস্তার,
রাজলক্ষ্মী-স্বরূপিণী মনস্বিনী তাঁ'রে
কলত্র লভিয়া প্রীতি পতির অন্তরে। ৩২।

আত্ম-অনুরূপা তাঁ'য় আত্মজ জনম
হেরিবারে সমুৎসুক সেই নৃপোত্তম,
যাপিলেন বহুকাল আজ কাল ক'রে,
তথাপি ত মনোরথ ফল নাহি ধরে। ৩৩।

সন্তানের কামনায় করিবারে যাগ
মন্ত্রিগণে ভু-রক্ষণে দেন পূর্ণ ভাগ। ৩৪।

বিধাতারে সদাচারে অর্চ্চি' জায়াপতি
চলে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমের প্রতি। ৩৫।

নির্ঘোষ গভীর মিষ্ট এক রথে উভ,
মেঘে স্থিত ঐরাবত বিদ্যুতের নিভ। ৩৬।

ক্রোধোন্মত্ত শিবকে সন্নিহিত হইতে দেখিয়া যজ্ঞদেব ভয়ে মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়নপর হয়েন, এবং পিনাকী শিব পিনাকে বাণ যোজনা করিয়া সেই মৃগের প্রতি ধাবিত হন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

রাজারা যোগ্যকুলে প্রথম বিবাহ করিতেন। কিন্তু যে রাজার সন্ততির মধ্যে এক কন্যা মাত্র, বা যাঁহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইতেন, তাঁহারা সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপনার নিমিত্ত পরাক্রান্ত নরপতিকে কলত্রবান্ শুনিয়াও কন্যাদান করিতেন। পুনশ্চ, প্রজারা কেহ কেহ পরম সুন্দরী যুবতী কন্যাদিগকে অপর পাত্রে সম্প্রদান না করিয়া, রাজাকে সংবাদ দিয়া রাজ-দ্বারে রাখিয়া চলিয়া যাইত। রাজা শাস্ত্রানুসারে বাধ্য হইয়া সেই সকল কন্যা বিবাহ করিতেন। এইরূপে রাজাদিগের বিবাহের সংখ্যা বহু হইত। *

সর্জ্জতরু শালবৃক্ষ; ইহার স্কন্ধ-নিঃসৃত রস শুষ্ক হইলেই ধূনা।

যূপতরু বেদী-পরিবেষ্টিত শুষ্কতরু। রাজা গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইবেন, এই সংবাদ প্রচার হওয়ায়,

আশ্রমের শান্তভাব অবিকৃত রয়,
এই হেতু পরিমিত প্রবিচর চয় ;
প্রভাবের অতিশয়ে কিন্তু অনুমান
সৈনা লক্ষে পরিবৃত হ'য়ে যেন যান। ৩৭।

সর্জ্জতরু নিশ্বাসের দিব্যবাস-যুত,
বনবাজি ধীরে ধীরে কম্পমানে যত,
পুষ্পরেণু পূর্ণকায় শীতল সমীর,
প্রীত করি তাঁহাদের জুড়ায় শরীর। ৩৮।

রথনেমি ধ্বনি ভাবি' হয় মেঘ-রব,
উচ্চশির করি' বৃক্ষে ময়ূর যে সব,
স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দ্বিধা "কে-কা",
"কে-কা", করে ;
শুনেন তাঁহারা সেই ষড়জের স্বরে। ৩৯।

হরিণী হরিণগণ কেমন নির্ভয়ে,
সমীপেই সারি সারি থাকি' থাক দিয়ে,
কৌতুকে রথের প্রতি নয়ন লাগায় ;
এ উহার আঁখি তায় দম্পতি মিলায়। ৪০।

সারসেরা সুখকর কলরব ছাড়ে,
শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে সবে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ;
স্তম্ভহীন তোরণের মালা মত সাজে ;
মুখ তুলি' তা'ও তাঁরা হেরে মাঝে মাঝে। ৪১।

পবন তাঁদের সনে সম-দিকে চলে,
কামনা সফল হ'বে এই যেন বলে ;
অধুনা, তুরঙ্গ তুলে যে ধূলি-পটল,
অলক-উষ্ণীষ তা'য় না করে সমল। ৪২।

তড়াগেতে তরঙ্গের মালা করে খেলা,
কুবলয়-পরিমল শীতলয় জলা ;
স্ব-নিশ্বাস অনুরূপ সেই যে সৌরভে
উভয়ে আমোদে কিবা হেথা সেথা লভে। ৪৩।

যে যে গ্রাম রাজা নিজে দিয়াছেন দানে,
যথাবিধি যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণের গণে ;
যূপতরু যাহাদের দেয় পরিচয়,
তথা তথা উপনীত সদা মহাশয় ;
লইছেন তাঁহাদের অর্ঘদান পূজা,
লভিছেন আশীর্ব্বাদ যায় ব্যর্থ না' যা'। ৪৪।

সদ্যজাত ঘৃত ল'য়ে ঘোষ বৃদ্ধ যত,
রাজ-দরশনে পথে আছে উপস্থিত ;
প্রীতিভবে সে সবারে শুধাইতেছেন,
বনতরুদের নাম কাছে যা' দেখেন। ৪৫।

পাশাপাশি দু'জনায় সমুজ্জ্বল বেশে,
চিত্রা-চন্দ্রমার চিত্র শিশিরের শেষে। ৪৬।

পথপার্শ্বে লোক সমাগম হইয়াছে। ব্রহ্মোত্তরভোগী ব্রাহ্মণেরা দূর্ব্বা-পুষ্পাদি রচিত অর্ঘদানদ্বারা রাজার শাস্ত্রোচিত সম্মান করিতেছেন ; এবং রাজা অর্ঘ গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

রিক্তহস্তে রাজার নিকট যাইলে তাহার সম্মান রক্ষা হয় না, মনুসংহিতায় (৩ অ ১১৯ শ্লোকে) রাজাকে মধুপর্কদানের নিয়ম রহিয়াছে। এই জন্য গোপগণ পূর্ব্বদিনের নবনীত হইতে সুগন্ধ ঘৃত প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। রাজা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না,

যা' প্রিয় দর্শন রাজা দর্শনে সু পান,
যত্ন করি প্রেয়সীরে অমনি দেখান।
এমনে, যদিও পথ ফুরাইয়া এল,
বুধ সম বোধশীল বুঝিতে নারিল। ৪৭।

বন্যপথ অতিক্রমে ক্লান্ত তুরঙ্গম,
অপরাহ্ণে উপনীত ঋষির আশ্রম। ৪৮।

দেখেন তপস্বিগণ বনান্তর হ'তে,
ফিরিছেন কুশ-ফল-হোমকাষ্ঠ হাতে।
অগ্নি গিয়া অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদেরে,
শিশুরা পিতায় যথা, আনে সঙ্গ ধরে।। ৪৯।

নীবার বণ্টন লাভে লব্ধ-পরিচয়,
পর্ণশালা-দ্বার যত অবরোধি রয়,
তপোবনে জাত বাল-কুরঙ্গ সকল;
যেন ঋষিপত্নীদের সন্তানের দল। ৫০।

যতনের তরুগণে মুনিকন্যাগণ,
জল ঢালি তখনিই করিছে গমন,
কেননা, নির্ভয়ে অই বিহঙ্গম যত
আলবালে মধুপানে হইবেক রত। ৫১।

কুটীর অঙ্গন-ভূমে রৌদ্র গেছে পড়ে,
তৃণধান্য একত্রিত; বসি পদ মুড়ে,
মৃগগণ করিতেছে চর্ব্বিত চর্ব্বণ,
দয়ে হ'সে রাজারাণী করেন দর্শন। ৫২।

হুতঘৃত-গন্ধযুত ধূম আনয়নে
তপোবন অভিমুখ আগন্তুকগণে
পবন আগেই কিবা করিছে পাবন
জানাইছে জ্বলে এবে হোম-হুতাশন। ৫৩।

তখন সারথি প্রতি আদেশ প্রদানে,
'অশ্বগণে গতশ্রম কর সযতনে,
রথ হ'তে মহীপতি পত্নীরে নামান,
অনন্তর আপনিও নামি' দোঁহে যান। ৫৪।

সস্ত্রীক সে সুরক্ষক নৃপবরে, যাঁর,
শাস্ত্র সহ সুসঙ্গত ব্যবস্থা বিচার,
ইন্দ্রিয় সংযমে সিদ্ধ সভ্য মুনিগণ,
সমাদরে সদাচারে করেন গ্রহণ। ৫৫ ॥

অনন্তর অন্ত শুনি সায়ন্তন বিধি,
চলিলেন সুখাসীন যথা তপোনিধি;
পার্শ্বে দেবী অরুন্ধতী আসনের তাঁর,
হুতাশন-পার্শ্বে দেবী স্বাহার আকার। ৫৬ ॥

চরণ গ্রহণে তাঁদে বন্দে রাজারাণী,
আশীর্ব্বাদ করে শুভ, গুরুর ঘরণী। ৫৭ ॥

কিন্তু পাছে তাহারা ক্ষুণ্ন হয় এই নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, কোনও একটী বনের বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, ওহে যোবজ, এই বৃক্ষটীর নাম কি?

পবিত্র ভাবে যথাসাধ্য একাগ্রচিত্তে উদকাদি দান করিলে পিতৃগণ সমাগত হইয়া সেই উদকাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা অতি সত্য কথা। এই রচনা কর্ত্তার পিতৃদেব (খৃষ্টীয় ১৯০৮) সন ১৩১৫ সালে আষাঢ়ী কৃষ্ণা দশমী তিথিতে স্বগ্রাম বালী গ্রামে দেহত্যাগ করেন। ঐ ঘটনার দুই মাস পরে পুত্র পিতৃ পক্ষের সেই তিথিতে বারাণসী ধামে দশাশ্বমেধতীর্থে জাহ্নবী জলে প্রাতে স্নাত

সৎকারে রথের শ্রম প্রাপ্ত-উপশম,
ভূমণ্ডলরাজ্য যাঁর বিপুল আশ্রম,—
হেন সে রাজর্ষিবরে, মহর্ষি তখন,
জিজ্ঞাসেন রাজ্যে তব কুশল কেমন ? ৫৮ ॥
বিত্তপতি বক্তৃবর বৈরিপুর-জয়ী,
দুরিত দমনে দক্ষ অথর্ব্ব-অধ্যায়ী
পুরোহিতে, আত্মহিত-কামনায় হেন,
সসার বচনবৃন্দ করে নিবেদন। ৫৯।
অনুকম্পা-বলে তব কভু কোন ঠাঁই,
ভগবন্ শুভাভাব সম্ভাবনা নাই।
দেব-নর যেবা হ'তে আসে যে ব্যসন,
নিজ হ'তে তুমি তাহা করহ দমন। ৬০।
সিদ্ধমন্ত্র তীব্র তব মন্ত্র সমুদয়,
পরোক্ষেই অনায়াসে করি' অবি-ক্ষয়,
করে যেন কর্ম্মহীন মম শরগণে ;
অক্ষি-পথে স্থিত লক্ষ্য মাত্র যা'বা হানে।৬১।
বিহিত বিধান-মতে তুমি ওহে হোত,
হুতাশনে নিবেদন কর সেই ঘৃত ;
হবি সেই বৃষ্টিরূপে বৃষ্টির অভাবে,
শোষ্যমান শস্যে বাখে অনিরূত ভাবে।৬২।

জীবে যে হে প্রজাগণ শত বর্ষ ধরি,
রোগ, শোক, অতিবর্ষা নাহি কিছু ডরি,
ব্রত-তপঃ ক্রিয়া তব, বেদ-অধ্যয়ন,
সে সকল সুখ-পুঞ্জে নিদান কারণ। ৬৩ ॥
বিদ্যমান গুরো তুমি ব্রহ্মার কুমার,
এ প্রকারে অনুধ্যান করিতে যাহার,
নিরাপদ সেই মম, সম্পদ অশেষ,
কেহ নাহি অবিরলে চলিবে বিশেষ ? ৬৪।
কিন্তু এ বধূতে তব, সন্তান-রতন
আত্ম-অনুরূপ নাহি করি দরশন ;-
বসুধাও তাই মোরে তুষিবারে নারে,
যদিও বিবিধ রত্ন প্রসব সে করে। ৬৫ ॥
আমার অবর্ত্তমানে পিণ্ডলোপ ভয়ে
পিতৃগণ শ্রাদ্ধে রত স্বধার সঞ্চয়ে ;
পরিতোষে নাহি আর করেন আহার,
এই হেতু অতি ক্লেশ হৃদয়ে আমার। ৬৬।
সুশীতল পয়োদানে করি যে তর্পণ
'দিলীপের প'রে আর কে দিবে এমন'
এ শঙ্কায় শোকাবেশে নিশ্বাস-পব'নে
উষ্ণ করি রত তাঁরা সে নীর সেবনে ' ৬৭।

ঘটিকার সময় দক্ষিণ মুখে বারত্রয় তর্পণ করিবার কালে প্রথম বারে বোধ করিলেন যেন পিতৃদেব শুভাগত হইয়াছেন। দ্বিতীয় বার সতিল গঙ্গোদক প্রদান কালে তিনি স্পষ্ট দেখিলেন যে পিতা বাষ্পময় দেহে অঞ্জলি বন্ধনে তর্পণোদক গ্রহণ করিলেন ; তৃতীয় বারেও প্রীত ভাবে ঐরূপ করিলেন। পুত্র বিস্মিত হইলেন ; তখন তিনি প্রণামান্তে একদৃষ্টে, দেখিতেছেন যে পিতৃদেব দক্ষিণ মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছেন। তাঁহার সেই হাস্যময় দেহের আয়তন উদক গ্রহণ কালে স্বাভাবিক আকারের ছিল ; প্রতিগমন কালে শরীর ক্রমশঃ দীর্ঘতর, কৃশতর,

শুদ্ধ আমি যাগ যজ্ঞে শোধি' দেব-ঋণ
বংশ লোপে পিতৃঋণে রয়েছি মলিন
এক অংশে সপ্রকাশ অন্যে অনুজ্জ্বল,
স্থিত আমি লোকালোক যেন সে অচল।৬৮।
সুকৃতি যা' তপোদানে সমুদ্ভূত হয়
লোকান্তরে সুখকর ইহ কিছু নয়;
সন্তান জনমি, কিন্তু উজলিলে কুল
ইহ পর উভ লোকে আনন্দের মূল। ৬৯॥
সে ফলে বঞ্চিত আমি ইহা দরশনে,
গুরো কি না হয় কোন ক্লেশ তব মনে?
আশ্রমে রোপেছ তরু, সেচ স্বীয় করে,
দুখ নাহি পাও তা'র বন্ধ্যা ভাব হেরে? ৭০
অন্তিম ঋণের জ্বালা সহ্য নাহি হয়,
সে যাতনা ঠিক যথা বন্য করী সয়,
নবধৃত হ'য়ে যবে নিগড়িত ভাবে
আলানে আবদ্ধ রয় ম্লান স্নানাভাবে। ৭১॥

ও যেন কিঞ্চিৎ শ্যামতর হইতে লাগিলে, এবং অবিলম্বে দশ বার হস্ত দূরে যাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীদয়ালচাঁদ সন্ন্যাসীকে এই বিষয়ে নিবেদন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে এরূপ দর্শন কাহারও ঘটিয়া থাকে।

অতএব সকলে শ্রদ্ধা সহকারে পরলোকগত পিতা মাতার শ্রাদ্ধ তর্পণ সমাপন করিবেন। নতুবা পুত্রোচিত কার্য্য হইবে না। ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

লোকালোক পর্ব্বত সৌর জগৎকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা আছে।

সেই পিতৃঋণ হ'তে মুক্তির উপায়
করিতে হইবে আজি তাত হে তোমায়,
ইক্ষ্বাকু-সন্তানগণ কঠিন যা'গণে,
হবে না সফল তা'রা তোমার অধীনে? ৭২
হেন নিবেদন রাজা করিল যখন,
ধ্যানে ঋষি তখনই হইয়া মগন,
ক্ষণতরে স্থির আঁখি হ'ল স্পন্দহীন,
নিশীথে নিবাত হ্রদ যথা সুপ্তমীন। ৭৩॥
সমাহিত, অতঃ চিত্ত-দর্পণে তাঁহার,
হেতু যাহা ভূপতির সন্তানে বাধার,
ফলিত হইল তাহা প্রতিবিম্বাকারে;
অনন্তর কহিলেন তিনি নৃপবরে। ৭৪॥
পুরা তুমি পুরন্দরে করিয়া সৎকার,
একদা আসিছ যবে দিকে বসুধার,
পথে কল্পতরু-তল করিয়া আশ্রয়
সুরভি, ভুবনে পূজ্য কামধেনু রয়। ৭৫॥
ঋতু অন্তে স্নাতা এই মহিষী সেদিন,
গৃহে নাহি পঁহুছিলে ধর্ম্ম হ'বে ক্ষীণ,
এই চিন্তা-বশে তুমি না কর তাহার
পূজা প্রদক্ষিণ, যাহা বিহিত আচার। ৭৬॥
যে হেতু চলিলে মোরে না করি' সম্মান,
সন্তান হ'বেনা তব, আমার সন্তান
যদবধি তুষ্ট নহি করহ সেবায়;
দিল এই অভিশাপ ধেনু সে তোমায়। ৭৭॥

সুর কল্লোলিনী তথা চলে কলকলে,
উন্মুক্ত দিগ্‌গজগণ খেলে পুনঃ জলে ;
সেই মহা কোলাহলে সে শাপ বচন,
না শুন, না শুনে তব সারথি, রাজন্। ৭৮ ॥
তাহার সে অসম্মানে তব মনোরথে
প্রতিবন্ধ নিপতিত হয় হাতে হাতে ;
পূজনীয়ে ব্যতিক্রম হইলে পূজার,
মঙ্গলে জঞ্জাল ঘটে যেন সবাকার। ৭৯ ॥
অধুনা বরুণ যজ্ঞ করেন পাতালে,
দ্বার তাঁর রোধি রয় ভূজঙ্গের দলে।
বহু বর্ষ গত তাঁর হ'বে সে ইজ্যায়,
গব্য যত দ্রব্য দেয় সুরভি তাহায়। ৮০ ॥

রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রত্যেকে যোজন পরিমিত ভূমি খনন করিতে করিতে যজ্ঞ দীক্ষিত পিতার অপহৃত যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে কপিল ঋষির আশ্রম পাতাল খণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী সেই বিবর প্রদেশ পরে রাজর্ষি ভগীরথ কর্ত্তৃক সমানীতা গঙ্গার সলিলে প্লাবিত হয়। অতএব গঙ্গার সাগর-সঙ্গম স্থানই পাতালের প্রবেশ পথ। বলি ভূমি; অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া জনপদ ভারতবর্ষের পক্ষে পাতাল বা রসাতল অর্থাৎ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ। বলিভিয়াতে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। ভারতবর্ষীয়েরা পোতযোগে সমুদ্রকূলে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে বহু দূরবর্ত্তী ভূভাগে গমন করিয়াছেন, এবং বলিভূমি শীতাতপে ভারতবর্ষের তুল্য বুঝিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বলিভূমির ইন্দ্র নামক রাজবংশ শশাঙ্কবংশ বলিয়া পরিচিত। এদেশে জল রাজ্যের অধিপতির আখ্যা বরুণ। পাতালে সর্পের কিঞ্চিৎ বাহুল্য আছে।

প্রতিনিধি কর তা'র তদীয় সুতায়
শুচি ভাবে পত্নী-সহ সেবা কর তায় ;
প্রীত হ'লে কামদুঘা সেবকে সে জেন
কামনা তোমার, সেই করিবে পূরণ। ৮১ ॥
এই কথা হ'তে হ'তে সুরভি-নন্দিনী,
নন্দিনী যাহার নাম অনিন্দ্য-রূপিণী,
আহিতাগ্নি মহর্ষির আহুতি-সাধন,
ধেনু আসে বন হ'তে করিয়া চরণ। ৮২ ॥
কিসলয়-সুচিকণ বরণ পাটল,
ললাটে বঙ্কিম কিবা রোমাঙ্ক ধবল ;
অলঙ্কৃতা যেন নব শশীর কলায়,
কায়াবতী সন্ধ্যা-দেবী আসি পঁহুছায়। ৮৩ ॥
হম্বা-পয়োধর হ'তে ক্ষীরের আকারে,
বৎস হেরি' বৎসলতা রস যেন ক্ষরে ;
যজ্ঞপূত স্নানবারি হইতে পাবন
সে কবোষ্ণ রসে ভূমি করিছে সিঞ্চন। ৮৪॥
খুরাঘাতে সমীপেই ধূলি তুলিতেছে,
ভূপালের কলেবর তাহা পরশিছে ;
তীর্থে অভিষেকে যেই শুদ্ধির সঞ্চার,
রেণুযোগে ধেনু তাহা সমাধে রাজার। ৮৫ ॥
সে পুণ্য-দর্শনা গাভী করি দরশন,
হেতুবোধে বিচক্ষণ বশিষ্ঠ তখন,
যজমানে পুনঃ হেন বলিছেন বাণী ;
মনোরথ সফল হইবে তা'র গণি। ৮৬ ॥

রাজন্ আপন সিদ্ধি সমাগত ভাব,
যেই নাম কল্যাণীর, সেই আবির্ভাব। ৮৭।
কন্দমূলাহারী হ'য়ে তুমি অহরহঃ
ইহার অনুগমন কার্য্যে রত রহ।
যাবৎ না অভ্যসনে বিদ্যাদেবী মত,
ভগবতী তব প্রতি হয় প্রীত-চিত। ৮৮
চলিবে চলিলে ধেনু, থামিবে থামিলে ;
বসিবে বসিলে, জল পিবে সে সেবিলে। ৮৯
শুদ্ধাচারে ভক্তিভরে আর বধূমাতা,
অলকে তিলকে তা'য় করি' অলঙ্কৃতা,
তপোবনাবধি পিছু চলিবেন প্রাতে ;
অপরাহ্নে গিয়া পুনঃ আনিবেন সাথে। ৯০
এ প্রকারে পরিচর্য্যা করিবে ইহারি,
বিঘ্নাভাব হ'ক তব আশীর্ব্বাদ করি।
শীর্ষে তুমি গণ্য হও পুত্রবান্‌গণে,
তব পিতা লভি' যথা তোমা-হেন ধনে। ৯১
অগ্নি-হোত্র অবসান, অগ্নি সন্নিধান,
হেন যোগে অব্যাহত জানি আর্য জ্ঞান,
প্রীতি-পূর্ণ নত ভাবে শিষ্য সে স-দার
গো-রক্ষণে গুরু-আজ্ঞা করিল স্বীকার।৯২।
তখন বিলম্ব আর অধিক না করি'
সদ্যো মাত্র সমাগত যদিও শর্ব্বরী,
বিজ্ঞ প্রিয়সত্য-ভাষী স্রষ্টার নন্দন,
শয়নে শ্রীদীপ্ত ভূপে করেন প্রেরণ। ৯৩
তপস্যায় সিদ্ধ ঋষি যোগবলে নানা
রাজোচিত ভোগ রাজে করিতে যোজনা
যদিও সুদক্ষ, শাস্ত্রে লক্ষ রাখি তাঁর
ব্রত হেতু দিল বন্য শয়নোপচার। ৯৪
কুলপতি তাঁয় যে পর্ণশালায়
নির্দ্দেশে, তাহায় শুচি,
স্বধর্ম্মিণী স্বায় করিয়া দ্বিতীয়,
কুশে শয়নীয় রচি,
থাকি' নিদ্রাবেশে রজনীর শেষে
জাগে বেদাভ্যাসে শুনি,
মুনির পোষিত শিষ্যের অযুত
তুলে যে প্রভূত ধ্বনি। ৯৫।

ইতি শ্রীকালীদাস-বিরচিত রঘুবংশ কাব্য দর্শনাৎ বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর
প্রবরভূত কুলোৎপন্ন শ্রীকিশোরীমোহন চৌবেসেন-কৃতে
বঙ্গ-রঘুবংশ কাব্যে বশিষ্ঠের তপোবন নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীসুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায়, বি, এ।

চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া সুরেশ একখানি সংবাদ পত্র পড়িতেছিল। ভৃত্য আসিয়া ডাক দিয়া গেল। পত্রগুলির মধ্যে সুরেশ দেখিল একখানি ইন্দুর পত্র।

অন্যান্য পত্রগুলির সহিত সংবাদ পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সর্ব্বাগ্রেই ইন্দুর পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। চায়ের পেয়ালায় একটী চুমুক দিয়া প্রথম কয়েকটী ছত্র পাঠ করিয়া সুরেশ একটু হাসিল।

হঠাৎ এক যায়গায় হাত কাঁপিয়া যাওয়ায় খানিকটা গরম চা চলকাইয়া গিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া গেল। একটু রাঙা হইয়া, একটু ঘামিয়া, একটু হাসিয়া এবং একটুখানি লজ্জার সহিত সুরেশ বলিয়া উঠিল, "ইন্দুটা আচ্ছা দুষ্টুতো! আসুক সে এবারে; তাকে একবার দেখে নেব।"

ইন্দু লিখিয়াছে,—

সুরেশদা,

হঠাৎ আজ এত দিন পরে তোমায় চিঠি লিখচি ব'লে, বোধ হয়, তুমি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। আমার মনে হয় তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য্য হবে এই চিঠি খানার গোড়ার কথা গুলো পড়ে।

আমি উপরি উপরি দু'তিন খানা চিঠি অশ্রুর কাছ থেকে পেয়েচি। সময়ের অভাবে একখানারও এখন জবাব দিয়ে উঠতে পারি নি। তার চিঠি প'ড়ে বুঝলুম সে এখন বেশ সেরে উঠেচে, গায়ে একটু বলও পেয়েচে।

সে লিখেচে মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়ী সে যায় এবং অনেকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে আসে। সত্যি ব'লচি সুরেশদা, তাকে দেখ্‌তে বড্ড ইচ্ছা করে। তার সেই অসুখের চেহারাটাই দেখেছিলুম। তখনই তাকে বেশ সুন্দর দেখিয়েছিল। না জানি এখন সেরে উঠে সে আরও কত ভাল দেখতে হ'য়েচে। তাকে ব'লো আমি তার চিঠির জবাব শিগ্‌গীর দেব। দেরী হ'চ্চে ব'লে যেন দুঃখ না করে।

হ্যাঁ একটা কথা, সে লিখেচে তুমি নাকি তাকে হারমনিয়ম বাজাতে শিখিয়েচ, অনেক ভাল ভাল গান শিখিয়েচ। কথাটা কি সত্যি?

তাহ'লে তো দেখছি তুমি তাকেও আমার মত ছাত্রী ক'রে তুলেচ। আমায় যে রকম রোজ সন্ধ্যাবেলায় গীতার দু'একটী শ্লোকের মানে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতে, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, সাধনা. সিদ্ধি, প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ের ওপোর বক্তৃতা ক'ত্তে, আমার বোধ হয়, অশ্রুর কাছেও সে রকম কর'। আমি যে রকম তোমার পাশে দাঁড়িয়ে একমনে শুনতুম, অশ্রুও বোধ হয় সেই রকম শোনে, না? ভগবান করুন তাকে যেন চিরকাল তোমার পাশেই দেখতে পাই সুরেশদা।"

এই খানেই সুরেশের কোলের উপর খানিকটা চা পড়িয়া গিয়া তাহাকে একটু অপ্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল।

সুরেশ পড়িয়া যাইতে লাগিল,—

"মনে ক'রেছিলুম, সুরেশদা," আমার বিষয়ে তোমায় কিছু লিখব'না; সেই একঘেয়ে পুরাণ কথা আর কতবার শুনবে? কিন্তু সে দিন ঠাকুরপোর মুখে শুনলুম সে নাকি আমার সম্বন্ধে তোমার কাছে অনেক কথাই ব'লেচে। তুমিও সেই সমস্ত শুনে অনেক চোখের জল ফেলেচ। আমার জন্যে তুমি কাঁদ কেন সুরেশদা'? আমি তো আজকাল তেমন কাঁদি না। আমি বুঝতে পেরেচি শুধু কাঁদলে কোন ফল হবে না। কান্নার চেয়ে আরও অনেক জিনিষ্ আছে যে গুলোকে সম্পন্ন করবার চেষ্টা ক'ল্লে, আমার বোধ হয়, আরও অনেক কাজ হবে। তাই কান্না টান্না আজকাল আমি প্রায় ভুলে গেছি।

এতদিনে বুঝতে পেরেছি, সুরেশদা' আমাদের ঘরের মেয়েরা কম বয়সেই আত্মহত্যা করে কেন। আত্মহত্যা না ক'রে তারা যে থাকতে পারে না। তাই তারা মরে গিয়ে সমস্ত দুঃখ কষ্টের বাইরে চ'লে যায়। অশান্তির অগ্নিশিখা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে শান্তির শীতল ছায়ায় আশ্রয় ন্যায়।

আমাদের দেশের মেয়েদের আপনার ব'লতে এক আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। দেহ বল, মন বল, প্রাণ বল, তাদের নিজস্ব কিছুই নয়। তারা হাসি মুখে সেগুলোকে তোমাদের পায়ের কাছে বলি দ্যায় সুরেশদা,' আর তোমরা সে গুলোর ওপোর দিয়ে নিষ্ঠুরের মত হেসে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে, চুরমার ক'রে চলে যাও। শুধু তাইতে ক্ষান্ত হওনা। তাদের আপনার বলতে যেটী সেই আত্মাটীকে পর্য্যন্ত তোমরা তাদের বুকের ভেতর থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও। কাজে কাজেই তারা যাঁর কাছ থেকে সেটী পেয়েছিল তাঁরই পায়ের কাছে সেটীকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়।

আমিও যে তা না ক'ত্তে চেষ্টা ক'রেছিলুম তা নয়—শিউরে উঠনা সুরেশদা, তোমার বোন কখন আত্মহত্যা ক'রবে না – কিন্তু অনেক ভেবে দেখলুম তাইবা ক'রবো কেন? ভগবান তো আত্মাটাকে হত্যা করবার জন্যে দ্যাননি। সেটীকে বেশ যত্ন করে রাখবার জন্যই দিয়েচেন। সেই জন্যই তিনি সেটাকে দেহ, মন, প্রাণ, সকলের তলায় বেশ শান্তিময় স্থানেই রেখেচেন।

আত্মহত্যা করে তারাই, যাদের মন বড্ড দুর্ব্বল। যেটীকে ভগবান যত্ন করে রাখবার জন্য আমাদের ওপোর বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন, সেটীকে যদি আমরা তিনি চাইবার আগে হত্যা ক'রে ফেলি তাহ'লে তাঁর কাছে আমাদের জবাব দিহি কর্ত্তে হ'বে না? কৈফিয়ত দিতে হবে না? যদি বলি তাঁর গচ্ছিত ধনটীকে রাখতে পাল্লুম না, কলুষিত হবার ভয়ে তাড়াতাড়ী তাঁর কাছে ফেরত দিলুম তাহ'লে তিনি আমাদের ওপোর সন্তুষ্ট তো হবেনই না, উপরন্তু রেগে গিয়ে আমাদের অপদার্থ ব'লে ঘৃণা ক'রবেন।

মা যেমন নিজের ছেলেটীকে সহস্র বিপদের মধ্যেও বুকের ভেতর চেপে রাখে, ছেলের গায়ে আঁচড়ও লাগতে দেয় না, আমিও সুরেশদা, তেমনি আমার আত্মাটীকে আঁকড়ে ধ'রে আছি, একটী আঁচড়ও লাগতে দিচ্চি না। মনে ক'রো না এটা আমি একলাই ক'ত্তে পাচ্চি, এ কাজেতে কর্ত্তব্য আমার সাহায্য ক'চ্চে, কর্ম্ম পথ দ্যাখাচ্চেন ত্যাগ সেই পথ আলোকিত ক'চ্চে আর বিবেক আমায় উৎসাহ দিচ্চে।

সেদিন আমি এই মহাসংগ্রাম থেকে জয়ী হ'তে পারবো; উদ্দেশ্য সাধন ক'ত্তে পার'বো, সেই দিনই বুঝবো এখানে থাকবার আর আমার কোন দরকার নেই। সেই দিনই হাসিমুখে আমার একমাত্র পাথেয় আত্মাটীকে নিয়ে ভগবানের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াব। তাঁর দেওয়া গচ্ছিত আত্মাটীকে তাঁর পায়ের তলায় রেখে ভক্তিভরে তাঁকে নমস্কার করবো।

সেই দিনই বুঝবো, সুরেশদা' আমি ধন্য, আমি সুখী, আমি যতটা নিজেকে অভাগী মনে করি, ততটা নই। পৃথিবীতেও যে কিছু না রেখে যাব তা নয়। আর আমার যা কিছু, দেহ বল, মন বল, প্রাণ বল, স্নেহ, মমতা, মায়া, যাই বলনা কেন সবই রেখে যাব।"

জলে সুরেশের চক্ষু ভরিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য লেখাগুলি অত্যন্ত ঝাপসা দ্যাখাইতেছিল। পেয়ালাটী ঠাণ্ডা চা শুদ্ধ টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চোখদু'টী বেশ করিয়া মুছিয়া জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া

সুরেশ আবার পত্রটী পাঠ করিতে লাগিল।

“সত্যি ব'লতে কি আমার আত্মহত্যা ক'র্ত্তে ইচ্ছে হ'য়েছিল সেই দিন যে দিন সেই ভূত গুলকে পাঁচিলের ওপোর অট্টহাস্য ক'র্ত্তে দেখে-ছিলুম। আমার এখন বিশ্বাস তারা ভূত। অন্ততঃ ভূতও যদি না হয় তাহ'লে নরকের কীট তো নিশ্চয়ই, কেন না ভগবানের এত আদরের পৃথিবীতে অত নীচ অত ঘৃণ্য জন্তু কখন থাকতে পারে না।

যাক, আত্মহত্যা করবার মত মনের ভাব আর আমার নেই। আশা করি, কখন সে ভাব আর আসবে না। যে পথ তুমি আমায় দেখিয়েচ সেই পথেই আমি চলচি এবং সেই পথেই চিরকাল চলব'। যে শিক্ষা তুমি আমায় দিয়েচ চিরকাল আমি তা পালন ক'রবো। যখন আমি হতাশ হ'য়ে পড়ি, নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ি তোমার কথাগুলো আমায় সজাগ ক'রে দ্যায়, মনে জোর এনে দ্যায়।

ব'লতে পার সুরেশদা; একমায়ের দু'ছেলে দু'রকম কেন হয়? সবাই কেন সমান হয় না?

তুমি যেমন আমার দাদা আমিও তেমনি একজনকার দিদি। তুমি যেমন আমার সমস্তটা জয় ক'রে ব'সে আছ, সেও তেমনি তার সবটুকু আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে, সে কে জান? সে আমার ছোট দেওর ধীরেন। সেই জন্যে ব'লছিলুম একই মায়ের দু'ছেলে সমান হয় না কেন?

যাই হোক, আমরা বোধ হয় তিনজনে কোন জন্মে আপনার ভাই বোন্ ছিলাম; তা না হ'লে আমাদের মধ্যে এত মায়া মমতা হ'ল কি ক'রে?

তোমায় যে রকম না ভেবে আমার একটী দিনও যায় না, ঠিক সেই রকম ধীরেনকেও না-ভেবে আমি এক দিনও থাকতে পারি না।

সে আবার এক বিষয়ে তোমার চেয়েও ওপরে যায়। আমি যেমন আমার ভবিষ্যতের জন্যে তোমার ওপোর নির্ভর ক'রে থাকি, সেও তেমনি নিজেকে সম্পূর্ণ আমার ওপোরেও ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়েচে। সে আরও আমার দাবীটা বাড়িয়ে দিয়েচে আরও আমায় মায়ায় জড়িয়ে রেখেচে।

সত্যি কথা ব'লতে কি, তুমি এবং ঠাকুরপো, এই দুজনেই এখন আমায় বাঁচিয়ে রেখেচ। নইলে বোধহয় এতদিন কেউ আমায় দেখতে পেত না। আমি বাবার কাছে চ'লে যেতুম। ছেলেবেলাকার মত তাঁর কোলের কাছে শুয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা ক'র্ত্তুম।

আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।

তুমি আমার প্রণাম জেনো। জ্যাঠাইমাকে দিও। আর অশ্রুকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি।

তোমার ছোট বোন্

ইন্দু।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। পত্রটী ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া সুরেশ ভাবিতে লাগিল, যতই কেন মানুষ ত্যাগ ত্যাগ করিয়া বক্তৃতা করুক না সব সময়ে সে সম্পূর্ণ ত্যাগী হইতে পারে না। সুরেশ ইন্দুর নিকট ত্যাগের সম্বন্ধে কত বক্তৃতা দিয়াছে কিন্তু সে নিজে কতখানি ত্যাগ করিতে পারিয়াছে?

আজ ইন্দু সেই দুর্ব্বল দেহে, শুক্‌নো মুখে, মলিন-বসন পরিয়া, অগাধ বিষাদ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আর সুরেশ—যাহার উপর তাহার আন্তরিক বিশ্বাস—যে তাহার আদর্শ—সে সুখে-স্বচ্ছন্দে বিলাসিতার ক্রোড়ে দিনযাপন করিতেছে! ইন্দু হয়তো আজ খাইতে পায় নাই, আজ হয়তো তাহাকে ঘরের বাহিরে উঠানেই রাত কাটাইতে হইবে; আর সুরেশ, বেশ চর্ব্ব্য-চোষ্য আহার করিয়া পালঙ্কে আসিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছে। কতশত ইন্দু চোখের জলে ভাসিতেছে, দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত হইতেছে, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, আবার অনেকে সুরেশের মত 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে।

সুরেশ আর ভাবিতে পারিল না; ধড়ফড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ছাদে পায়চারী করিতে করিতে মনে মনে বলিয়া উঠিল—"ইন্দু, তোর শিক্ষাদাতা, পথ-প্রদর্শক আমি নই। তুই আমায় আমার পথ চিনিয়ে দিয়েচিস্। আমি তোর দাদা নই, তুই আমার দিদি।

১৪

মেয়ের শ্বশুরালয়ে তত্ত্ব দিয়া ঝী ফিরিয়া আসিলে ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দুকে কেমন দেখে এলি ঝী?"

ঝী অমনি সেখানে ধড়াস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আর মা, দিদিমণি কি আর আছে? সে দিদিমণি আর নেই।"

ব্রজবালা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কেন ঝী? তার কি বড্ড অসুখ করেছে?"

ইন্দু কখন মাতাকে নিজের কষ্ট সম্বন্ধে কিছুই লিখিত না। যখনই পত্র লিখিত তাহাকে লিখিয়া দিত—তাহার কোন কষ্ট নাই, বেশ সুখেই আছে।

ঝী বলিল—"অসুখতো ছিল ভালো মা! দিদিমণিকে দেখলেই মনে হয়--কোন্ দিন পড়বে আর মরবে। আর ঐ শাশুড়ী মাগীটা তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। দিদিমণির শরীরে আর কিছু নেই মা কিছু নেই; শুধু ক'খানা হাড় লেগে আছে মাত্র। সে কটা কোন্ দিন খসে গেলেই হ'য়ে গেল।"

বাস্তবিক অনেকটা সে দেখিয়া আসিয়াছিল, আবার অনেকটা মনগড়া করিয়াই ব্রজবালার নিকট ইন্দুর দুর্দ্দশার কথা বলিল। শেষে এইটুকুও বলিয়া দিল—"আমরা ছোটলোক বটে মা, কিন্তু আমাদের ঘরেও বৌঝীদের এত কষ্ট হয় না।"

ব্রজবালা হাজার হোক্ মা। তাঁর জননীর প্রাণ কন্যার বিষাদ কাহিনীতে কাঁদিয়া উঠিল। বলিলেন, "ইন্দু কিছু ব'লে দিলে ঝী?"

"দিদিমণি শুধু ব'ল্লেন, 'মাকে' বলিস ঝী আমি বেশ ভালই আছি।" কিন্তু মা দিদিমণিকে দেখলেই মনে হয় বেশী দিন বোধ হয় আর বাঁচবে না। কোন দিন তোমার কাছে খবর আসবে সে আর নেই।"

কেবল মরার কথা শুনিয়া ব্রজবালার প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যে ইন্দুকে বাক্য যণা স্ত্র;স্তুদিতেনজ সে তো ইন্দুরই ভ ালর তিনি যে তাহাকে মার ধোর করিতেন সে তো তাহারই মঙ্গলের জন্য।

তিনি তো ইন্দুর শাশুড়ী নন, তিনি যে তাহার মা! তাঁহার দোষেই হউক কিংবা ইন্দুর কপালের দোষেই হউক, যখন বীরেনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে তখনতো বীরেনকে লইয়াই তাহাকে ঘর করিতে হইবে। কন্যার যাহাতে স্বামীর উপর মন বসে, যাহাতে সে সুখী হয়, সেই চেষ্টাইতো তিনি করিতেন। সেইজন্যই তাহাকে অত কটু কথা বলিতেন! মা হইয়াও তাঁহাকে সময়ে সময়ে অত কঠিন হইতে হইত।

পর দিন তিনি নিজেই ইন্দুর শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাকে দেখিয়াই ইন্দু সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হেমলতা শ্বশুরালয় চলিয়া গিয়াছিল।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী ব্রজবালাকে চিনিতেন, বলিলেন; "কি গো বেয়ান যে! কি মনে ক'রে? মেয়েকে দেখতে বুঝি?"

ব্রজবালা বলিলেন, "তোমাদের সব দেখতে এলুম বেয়ান, কে কেমন আছ।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন, "বুঝেচি গো বুঝেচি; তোমার মেয়েকে আমরা কষ্ট দি' কি না তাই দেখতে এসেচ। আমরা অত ছোট লোক নই বুঝলে।"

আজ ব্রজবালার মেজাজ অন্যরূপ ছিল। আজ তিনি অন্য বারের মত বেয়ানের সহিত ঝগড়া করিতে আসেন না। তিনি আসিয়াছিলেন জননীর প্রাণ লইয়া দুঃখিনী কন্যাকে দেখিতে।

অনেক ডাকাডাকির পর ইন্দু ব্রজবালার নিকট আসিল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইন্দুও মাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রজবালা কাঁদিল দুঃখে, ইন্দু কাঁদিল ভাবের প্রাণ অভিমানে।

শাশুড়ী কোন একটা কাজে সেখান হইতে উঠিয়া গেলে ইন্দু বলিল, "তুমি কেন এখানে এলে মা?"

ইন্দুর পরণে একটী ছোট ময়লা কাপড়। নোয়া কলী এবং শাখা ভিন্ন হাতে কিছুই নাই। মাথার চুল জটে ভরা। বোধ হইল কতদিন যেন সে মাথায় তেল দ্যায় নাই। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ইন্দুকে দেখিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "তোর শরীরে যে আর কিছু নেই ইন্দু। আমায় তো অসুখের কথা জানাস্‌নি।"

ইন্দু বলিল,—"জানালে তুমি শুধু ভাবতে। কোন উপায় ক'র্ত্তে পাত্তে না। তাই আর তোমায় জানিয়ে কষ্ট দি'নি।"

"আমার কষ্টটাই কি বেশী হ'ল ইন্দু! আমার সঙ্গে যাবি? চ' তোকে আজ নিয়ে যাই।"

"না মা, আমি যাব না। আমার এখন যাবার ত কোন দরকার নেই।"

"তোর যে বড্ড কষ্ট হ'চ্চে ইন্দু। দু'দিন আমার কাছে থেকে সেরে যাবি।"

"এখানে আমার কোন কষ্ট নেই মা। আমি খুব সুখেই আছি। কষ্টই বা কেন হবে? এত দেখে শুনে তবে অমন ঘরে দিয়েছিলে মা।"

ইন্দুর চক্ষুদ্বয় ছল ছল করিয়া উঠিল।

ব্রজবালা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা হ'লে যাবি নি ইন্দু?"

"না মা এখন যেতে পারবো না। আমার দেওরের সামনে পরীক্ষা, আমার ননদ এখন এখানে নেই শাশুড়ীর শরীর খারাপ। তাঁকে দেখতে শুনতে হয়। এ সময় কি ক'রে যাব মা?"

"তোর নিজের শরীরের দিকে কি একবারও চাইবি নি ইন্দু?" তোকে দেখলে যে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।"

ইন্দু কিছু বলিল না। চুপ করিয়া রহিল।

ব্রজবালা বিষাদের সহিত একটু আনন্দ লইয়া একেলাই বাটী ফিরিলেন। তিনি মনে

করিলেন তাঁহার কন্যা এতদিনে শ্বশুর ঘর করিতে শিখিয়াছে, এতদিনে শ্বশুরবাড়ীতে তাহার মন বসিয়াছে।

মাতা চলিযা যাইলে সে রাত্রে ইন্দু প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিল। সে কান্নার ভিতর সমস্তটাই প্রায় মায়ের উপর অভিমান এবং বাকীটুকু মায়ের নিকট হইতে এতকাল পরে একটু সহানুভূতি পাইয়াছে বলিয়া।

যাইবার সময়ে ইন্দু ব্রজবালাকে বলিয়া দিয়াছিল—"আমার জন্যে তুমি ভেব না মা। এ রকম শরীর বেশীদিন থাকবে না। শীঘ্রই সেরে উঠব। যদি আমি হঠাৎ মরেই যাই, এরা খবর দেবে তখন।"

ক্রমশঃ

শিবরাত্রি।

দ্বিতীয় প্রহর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ লিখিত।)

এ ভাবতে কোন কর্ম্মই উদ্দেশ্যবিহীন নহে। উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্মই থাকিতে পারে না। সে উদ্দেশ্য মনুষ্যসমাজ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, সেজন্য কর্ম্ম দায়ী নহে। কর্ম্ম বিবিধভাবে শাস্ত্রবিধি নিয়ম লোকাচারের ভিতর দিয়া কর্ম্মি-সমাজে প্রবর্ত্তিত, কিন্তু বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যের জন্য আবিল-হৃদয়ে কর্ম্মরাশির নির্ম্মল উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হইতেছে না। যে মুহূর্ত্তে কর্ম্মের উদ্দেশ্য ধরা পড়িবে, সেই মুহূর্ত্তে মানুষ 'মানুষ' হইবে। কারণ কর্ম্মই লোকাচার বিধি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের উপর প্রকৃতির নানা-বৈচিত্র্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। ছুটিয়াছে তরঙ্গিনীর খরস্রোত তর তর করে বায়ুক্ষুব্ধ বীচিহিল্লোলে চঞ্চল হইয়া কর্ম্মের আকর্ষণে। চলিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য সুনীলগগনে উদয়াস্তের মধ্য দিয়া জীবজগতের ক্ষণভঙ্গুরতার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া বিলাসাচ্ছন্নদৃষ্টি মানবের সম্মুখে সেই এক কর্ম্মের প্রেরণায়। ঝরিতেছে বৃক্ষের পেলবপল্লব শুকাইয়া, কর্ম্মের প্রবর্ত্তনায়। সরিতেছে, প্রকৃতির সুষমাসৌন্দর্য্য নিজের মিথ্যাত্ব বুঝাইয়া মানবীয়লীলানিকেতনে সেই কর্ম্মেরই আহ্বানে। সুতরাং কর্ম্মই এ জগতের

প্রাণ। প্রাণ না থাকিলে যেমন শরীর চলিতে পারে না—কর্ম্ম না থাকিলে এ জগৎও থাকিতে পারে না। জগতের অস্তিত্ব এই কর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছে। এই জন্য এ জগৎটা কর্ম্মময়। প্রলয়ের পরে সংস্কাররূপে কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সৃষ্টির সময় কর্ম্মই ভিন্নাকারে বিভক্ত হইয়া জাতিগত ধর্ম্মগত রূপগত রুচিগত স্থানগত পার্থক্য আপাদিত করে। যেমন সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম (field of Association) যথাপূর্ব্ব ক্ষেত্র পাইয়া ভিন্নভাবে পরিব্যক্ত হয়—

যেমন পূর্ব্বযুগে সৃষ্টি হইয়াছিল, এ যুগে ঠিক তদনুরূপই সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণরূপে একটা বৈদিক মন্ত্রও উল্লিখিত হইতে পারে। যথা—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

বিধাতা পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিকে যথানিয়মে সৃষ্টি করিয়া নিয়মিত করিয়াছেন ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় কর্ম্মের গতি ভীষণ। সংসারপথে জীবন রহস্যের মধ্যে কর্ম্ম বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যেহেতু সৃষ্টিপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মের মধ্যেই নিহিত। ঈশ্বর ও এই কর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র গিরি কন্দর প্রভৃতি সকলেই কি এক প্রেরণায় কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া নিত্য নিয়মিত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের মধ্যে বিরাজিত। এক নিয়ম কর্ম্মজগতের উপর এমন বিভিন্ন ভাবে শক্তিচালনা করিতেছে, যাহাতে জড়ও প্রতিস্পন্দনে স্পন্দিত। সে নিয়ম জড়ত্বের মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা জাগাইয়া তোলে, সে নিয়ম স্বপ্নের মহাকল্পনায় সুনির্ম্মিত দিব্যনগরীকে সত্যের অতল সলিলে ডুবাইয়া দেয়, সে নিয়ম সুপ্তির মধ্য হইতে নবচেতনা আনাইয়া প্রতিচ্ছন্দে জগৎকে নাচাইয়া তোলে। সে নিয়ম সকল স্থানে সমভাবে অন্তর্গুপ্ত অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। সে নিয়মের অধিকারে নাই, এরূপ লোক লোকান্তর বা কোনপ্রকার দৃশ্যমান অদৃশ্যমান স্থানই নাই, যাহা আমরা স্থূল দৃষ্টিতে এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিতে "কিছু" বলিয়া দেখিতেছি। সুতরাং নিয়ম বা ধারা বা নীতির বন্ধনে যে, এই কর্ম্মকোলাহল জগৎ আবদ্ধ ইহা চির সিদ্ধান্তিত। এইজন্য এই জগৎটার যেটুকু মিথ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি, সৃষ্টবস্তু এবং স্রষ্টা বা সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর সে সকলই কর্ম্মময়, অতএব এ সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর বা নশ্বর, বা বিনাশশীল অথবা "অন্তঃসত্য বহির্ম্মিথ্যা"। যেহেতু কর্ম্ম যাহাকে গড়িয়া তুলে, সে কথনই চিরন্তন হইতে পারে না, কর্ম্মের কৌশল্যে সুনির্ম্মিত সপ্ততল সুদৃশ্য প্রাসাদ

ভবনও স্বপ্ননির্ম্মিত গন্ধর্ব্বপুরীর মত চুরমার হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়।

কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তনায় হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা-লহরিকা প্রতিস্তরে নৃত্য করিয়া থাকে। কর্ম্মেরই সংস্কারছবি অন্তর্গগণে সুখদৃশ্য হইয়া মানবীয় অন্তঃকরণকে বিভিন্ন পথে অনুধাবিত করে। কর্ম্মই বিক্ষেপলয় কষায়রূপে চিত্তে অবস্থিত। কর্ম্মই মৈত্রীমুদিতা করুণা উপেক্ষাভাবে চতুর্ব্বিধচিত্তবৃত্তিরূপে নিয়মিত। আবার কর্ম্মই এক সময় ধ্যানধ্যাতাধ্যেয়ের ব্যবধান দূরীকরণে উন্মুক্ত। সুতরাং এ জগতে কর্ম্মের গতি সর্ব্বত্র। এইজন্য শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

জ্ঞানী বা অজ্ঞান ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যেহেতু রাগদ্বেষাদি প্রকৃতি সম্ভূত গুণসকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। কর্ম্মসন্ন্যাস হইলেও কর্ম্মত্যাগ হয় না, মাত্র কর্ম্মে অনাসক্তি উৎপন্ন হয়। কারণ সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ ধ্যাতাধ্যেয়ের ব্যবধান থাকা পর্য্যন্ত কথনই সম্ভব-পর নহে, পরন্তু অসাধ্য। যে পর্য্যন্ত চিন্তা প্ররোহ থাকিবে, যে পর্য্যন্ত কল্পনালহরিকা হৃদয়কে উদ্বেলিত করিবে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই, কর্ম্মের হস্ত হইতে আত্যন্তিক পরিত্রাণ "অখণ্ডচেতনে দেহাত্মবুদ্ধির বিলয়ের পর"। যখন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ হইয়া শান্তি অশান্তির অনুভবের বাহিরে কি এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় শাশ্বত সুখে বিরাজমান থাকে, জ্ঞাতাজ্ঞেয়বোধ পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই নির্ব্বেদ, তখনই কর্ম্মত্যাগ। তখনই এ ধারার এ নিয়মের এ আইন কানুনের বাহিরে বাধাবিপত্তির পরপারে অবস্থান করিবার সুযোগ ঘটে। নতুবা এ রাজ্যের মধ্যে কর্ম্মের গতি অব্যাহত।

এইজন্য শ্রীগীতায় ভগবানের অমৃতময়ী বাণী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।১৮।২।

বিদ্বদ্‌গণ যাবতীয় কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ফলের সহিত কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগই সন্ন্যাস ইহা তাহাদের অভিমত। পরন্তু ইহা প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ নহে। নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ফলের সহিত পরিত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত যথার্থত্যাগী হইতে পারে না, এবং তজ্জন্য আত্মার জীবদ্দশায় যাবতীয় বন্ধনের পরিমুক্তিও কদাপি সম্ভবপর নহে। এইজন্য বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বলিয়া

থাকেন যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলত্যাগই ত্যাগ-পদবাচ্য। যেহেতু কর্ম্মের ফল বা সংস্কার অথবা প্রতিচ্ছবিই জন্মমৃত্যুর ব্যবধানে লীলা-নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পথের পথিকগণকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। যাহার জন্য বিচারবিহীন মূঢ় পথিককে এই জন্ম-মৃত্যু-অবাসঙ্কুল পথে গতাগতি করিয়া বারম্বার জর্জ্জরিত হইতে হয়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ কেবল মুখের কথা নহে, ইহা বহু সাধনাসাপেক্ষ, এবং নিত্য ভ্রমসঙ্কুল। মানবীয় দেহাত্মবুদ্ধির তিরোধান কথনই সম্ভবপর নয়। এই দুইটাই আপেক্ষিক। যদি বাহিরে কেহ কর্ম্মত্যাগের ভান দেখাইয়া অন্তরে অনন্তকর্ম্মের চিন্তা পরিপোষণ করে, তিনি কর্ম্মত্যাগী নহেন। চিন্তাও মানসিক কর্ম্ম। চিন্তা জন্য ফল তাহাকে জোর করিয়া বাহিরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেই করিবে। সে কখনই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মনকে সংযত না করিয়া মাত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযমচ্ছলে ত্যাগী সাজিতে পারিবে না, তাহার মনের বিষয়সমূহ-চিন্তা শতধা উন্মুক্ত হইয়া বিপথে লইয়া যাইবে। এজন্য তিনি কপটী বলিয়া শাস্ত্রে আখ্যাত। শ্রীগীতায় ও ভগবদ্বাক্যে তাহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ভগবানের ধ্যানচ্ছলে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়-চেতা মনুষ্য কপটাচার অর্থাৎ দাম্ভিক বলিয়া আখ্যাত হয়।

সুতরাং, মানসিক কর্ম্ম (চিন্তা ও তজ্জন্য বিষয় স্মরণ) থাকা পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ নয়, ইহা নিশ্চিত। এইজন্য এই কর্ম্মের গতি ভীষণ। কর্ম্মকে ভয় করে না, এমন লোকই দৃষ্ট হয় না। এই কর্ম্মচিন্তাই বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের হেতু। এই কর্ম্মচিন্তাই সাময়িক নারদের সংসারজীবনের কারণ। এই কর্ম্মচিন্তাই ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ প্রজাপতি প্রভৃতির স্ব স্ব অধিকার লাভের নিয়ন্তা। এই কর্ম্মচিন্তাই সমগ্র জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সুস্থ আতুর ধনী দরিদ্র মূর্খ বিদ্বান্ স্ত্রী-পুরুষ তির্য্যক্ পশু পক্ষি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি নিয়মের মূল। এই কর্ম্মই প্রশান্ত সাগরে শান্ততার উপরে উত্তাল তরঙ্গ আনয়ন করে, এই কর্ম্মই সুপ্তির অবসানে পুনঃ জাগরণের সংস্কার জাগাইয়া তুলে, এই কর্ম্মই বীজরূপে অবস্থিত থাকিয়া 'বর্ষাসমাগমে নিশ্চিহ্ন স্থান হইতে লতা গুল্মাদি অথবা সৈকত পুলিন হইতে শৈবাল দলের উদ্গমের মত' সৃষ্টিকুশল

মায়ার সহায় হইয়া বিভিন্ন ভাবে জগৎকে পরিব্যক্ত করে। আবার এই কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে কেবলমাত্র ভগবৎ প্রীতির জন্য অনুশীলিত হইয়া চিত্তের নৈর্ম্মল্য সম্পাদন করে, যাহাতে 'বস্ত্র-পরিষ্কৃত নির্ম্মল দর্পণে সুন্দর মুখভাতির মত' অনাবিল চিত্ত দর্পণে স্বতঃসিদ্ধ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ স্ব স্বভাব ও স্বপ্রকাশমান ব্রহ্মবস্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত হয়। এবং ধ্যাতা ধ্যেয় জ্ঞাতা জ্ঞেয় প্রভৃতি ব্যবধানের দূরে অবস্থান করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় পরম সুখাস্বাদে নিজেকে ধন্য করিতে সমর্থ হয়। তখন জীবত্বের মধ্যে শিবত্ব খুঁজিয়া পায়, মৃতত্বের বিনিময়ে অমৃতত্বের অধিকারী হয়। অশান্তির মধ্যে শান্তির বিমল ছায়া অনুভব করে, কোলাহলের মধ্যে শান্তভাব উপলব্ধি হয়। নৈরাশ্য ও অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার উপভোগে অনির্ব্বচনীয় আনন্দধারায় পরিস্নাত হয়। এই জন্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, আবার অধিকারীনির্ব্বিশেষে মুক্তিরও সম্পাদক। কর্ম্ম করিয়াছ বহু বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছ, কর নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের সেবা কর, নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্মে ব্রহ্মার্পণ করিতে শিখ, তোমার জন্য শান্তির বিমল ছবি অচিরে প্রতিভাত হইবেই হইবে। নতুবা কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহাকে তুলিবার জন্য দ্বিতীয় কাঁটার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু অনবধানতায় কাঁটাটী ভাঙ্গিয়া তথায় ফুটিয়া যাইলে, তজ্জন্য যন্ত্রণা ভোগ কর, কে তাহার জন্য দায়ী হইবে? এইতো জগতে কর্ম্মরহস্য। এইজন্য অনুভূতির আবশ্যকতা। অনুভূতি কর্ম্ম জগতে প্রাণ। শ্রদ্ধা দয়া প্রীতি-ভক্তি অনুভূতির নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হইয়া মানবের হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দেয়। অনুভূতির দ্বারা কর্ম্মের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। এ জগৎপ্রাসাদ এক অনির্ব্বচনীয় ভ্রান্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছে, আর সেই প্রাসাদের সাজান গুছানর ভার ঐ কর্ম্মের হাতে। সুতরাং এজগৎও ভ্রম-সঙ্কুল, আর ঐ কর্ম্মও ভ্রম-প্রমাদ-সঙ্কুল। কর্ম্ম বিপথেও লইয়া যায়, আবার সুপথেও লইয়া যায়। অন্ধকার হইতে আলোক লাভও হয়, আবার আলোক হইতে অন্ধকার লাভও দুর্লঙ্ঘনীয়। সুতরাং কর্ম্ম করিবার সময় তাহার উদ্দেশ্যও তাহার মধ্যে সত্যতার উপলব্ধি করিয়া করিতে হয়। হিন্দুর কোন কর্ম্মই পরিত্যাজ্য নহে, নিত্য-নৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ এক এক বিরাট ভাবে পরিপূর্ণ। তুলসীবৃক্ষের পূজা, অশ্বত্থবৃক্ষের অর্চনা, শালগ্রাম শীলার পূজা প্রভৃতি সকলই এক ঈশ্বরকে ভিত্তি করিয়া এই ভারতীয় তীর্থ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। একটী লক্ষ্য-

স্থল—গন্তব্য-পথ বহু। প্রত্যেকেরই মধ্যে একটী বস্তু ধ্বনিত হইতেছে। এইজন্য বিভক্ত কর্ম্ম-রাশির অভ্যন্তরে এক একটী উদ্দেশ্য ধরিয়া লইবার জন্যই এই বিভিন্ন কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা। যেমন শিবরাত্রি; শিবরাত্রির পূজা, জাগরণ ও উপবাস প্রভৃতির মধ্যে এমন একটী গূঢ়ভাব অন্তর্নিহিত আছে, যে বাস্তবিকই তাহার স্মরণ হইলে যেন প্রাণে একটা কি ব্যঞ্জনা আবির্ভূত হয়। কি যেন শ্রদ্ধার আকর্ষণে হৃদয়কে অন্তর-রাজ্যের সংবাদ দিবার জন্য বল-পূর্ব্বক লইয়া যায়। সে আনন্দ, সে শ্রদ্ধা, সে ধ্বনির আভাস হিন্দু-সমাজের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াসেই এ শিবরাত্রি প্রবন্ধের অব-তারণা। এই শিবরাত্রি অনুষ্ঠান কেবল উপবাস পূজায় পর্য্যাপ্ত নহে, ইহার তত্ত্ব গূঢ়, ইহার অনুষ্ঠান প্রাণপ্রদ। ইহার পরিসেবনেই যথার্থ কর্ম্মের উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়া থাকে। ইহার অনু-ষ্ঠানেই "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এই মহামন্ত্রের যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়। এইজন্য এই শিবরাত্রিই যথার্থ শিবরাত্রি—ইহাই দীপ্তালোকপূর্ণ মঙ্গল-রাত্রি এবং অনন্ত বিশ্বেশ্বরের মহাপথে ইহাই শান্তি-নিকেতন।

ইহাই ধর্ম্মশালাবাসিগণের রাত্রিক্লেশ দূরী-করণের মহাসহায়। ক্রমশঃ

শুক্রনীতিসার।

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব কর্ত্তৃক অনূদিত)

পূর্ব্বকালে অসুরগণ নীতি-শিক্ষা-কল্পে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী, জগতের আধার-স্বরূপ জগদীশ্বরের পূজা ও প্রণাম করিয়া স্বীয় গুরুদেব শুক্রাচার্য্যকে যথারীতি বন্দনা পূজা ও স্তব করতঃ নীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥১॥ শুক্রাচার্য্য স্বকীয় শিষ্য অসুরগণকে যাহা সংক্ষেপ-নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই শুক্রনীতি-সার নামক নীতিগ্রন্থ নামে পরি-কীর্ত্তিত। শুক্রাচার্য্য অসুরগণকে বলিলেন যে, পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা জগতের হিতমানসে শত লক্ষ পরিমিত নীতিশ্লোক বলিয়াছিলেন॥২॥ তৎপরে বশিষ্ঠাদি আমরা সকলে অল্পজীবী রাজকুলের সহজে শিক্ষা হইবে বলিয়া সেই শতলক্ষ পরিমিত নীতি-শ্লোক হইতে যুক্তি তর্কাদি দ্বারা সংক্ষেপতঃ সার সংকলন করিয়া-ছিলাম। ॥৩॥ অন্যান্য শাস্ত্র সমূহ সর্ব্ব বিষয়ের

জ্ঞাপক নহে পরন্তু এই নীতি-শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণের জীবনোপযোগী, স্থিতিকর্ত্তা এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ-সাধক ॥৪।৫॥

অতএব রাজকুলাদি মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক এই নীতি-শাস্ত্র অভ্যাস করিবেন। যেহেতু এই নীতি সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে পারিলে রাজগণ শত্রুজয়ী, প্রজারঞ্জক ও সুনীতি-কুশলাদি প্রকৃত নৃপগুণে বিভূষিত হইবেন এবং সাধারণ মনুষ্যও নানা নীতি বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া পরম সুখভাগী হইতে পারিবেন ॥৬॥ ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে কি শব্দার্থের জ্ঞান হয় না? প্রাকৃত (স্বাভাবিক) শব্দ সমূহের জ্ঞান কি ন্যায়তর্ক অর্থাৎ নৈয়ায়িক মতে যুক্তিতর্কাদি ব্যতীত সম্ভব নহে? বিধি ক্রিয়া ও ব্যবস্থা সমূহের বিষয় কি মীমাংসা দর্শন-বিষয়ীভূত জ্ঞান ব্যতীত জন্মায় না? বেদান্ত শাস্ত্র জানা না থাকিলে কি দেহ পর্য্যন্ত তাবৎ বস্তুর নশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হয় না? এই ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সমূহ নিজের নিজের বিষয় সমূহ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান আছে ॥৭—১০॥ এই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের মতানুসারী পণ্ডিতগণ এই এই ব্যাকরণাদির বিষয়ই সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন কিন্তু ইঁহারা কি এই নীতি-শাস্ত্রান্তর্গত লৌকিক আচার-ব্যবহারজ্ঞ পণ্ডিতগণের এই বুদ্ধি কৌশল লাভে সমর্থ হইতে পারে? কখনই না। অর্থাৎ এই নীতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া কেবল মাত্র ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের সাহায্যে নীতি শিক্ষা সম্ভবপর নহে। প্রাণিগণ যেমন ভোজন না করিলে তাহাদের দেহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে লোক সমূহের আচার রক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না ॥১১॥ এই নীতিশাস্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই অভীষ্টপূরক ও সর্ব্ববাদিসম্মত। রাজগণ সকলের প্রভু বলিয়া তাঁহাদিগের এই শাস্ত্র অতি প্রয়োজনীয় ॥১২॥ কুপথ্য-ভোজী রোগীর রোগ যেমন ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ নীতি-জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের শত্রু-সমূহও ধ্বংসের কারণ হয়। আবার পথ্যাশী ব্যক্তির রোগ যেমন সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তেমনিই নিতিজ্ঞগণের শত্রুও থাকে না। ॥১৩॥ প্রজাপালন এবং নিত্যই দুষ্ট-নিগ্রহ, রাজার ইহা পরম ধর্ম্ম; এই উভয় বিষয়ই নীতিজ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর নহে ॥১৪॥ রাজগণ যদি নীতি-শাস্ত্রানুসারী না হয়েন তাহা হইলে তাঁহার ছিদ্র অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় অতএব নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা রাজকুলের ভয়াবহ, শত্রু-বৃদ্ধিকর এবং অতিশয় শক্তিনাশ-কারী ॥১৫॥।

যে ব্যক্তি নীতিসমূহ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, সে দুঃখভাগীই হইয়া থাকে। সুতীক্ষ্ণ অসির ধার অবলেহনকারী ব্যক্তির জিহ্বা যেমন সদ্যই ছিন্ন হইয়া তাহার জীবন-নাশের হেতু হয়, তদ্রূপ উক্ত স্বেচ্ছাচারী অনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সেবকগণ শীঘ্রই নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১৬॥ নীতিজ্ঞ রাজার সেবা সুখকর, অনীতিজ্ঞ রাজার সেবা বহু দুঃখেতেও সম্পন্ন হয় না। যে রাজা নীতিজ্ঞ এবং বলবান্ তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্ব্বতোমুখিনী হইয়া থাকে ॥১৭॥ যাহাতে জনপদ সমূহ নীতিশিক্ষার বশবর্ত্তী না হইয়াও সুখভাগী হয়, রাজার সেইরূপ আত্মহিতার্থ নীতি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ রাজাকে নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপভাবে রাষ্ট্র শাসন করিতে হইবে, যাহাতে প্রজাগণ উপদেশ ব্যতীতও সদাচারপরায়ণ হইতে পারে ॥১৮॥ যে রাজার নীতিজ্ঞান না থাকাতে সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে অনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, তাহার রাষ্ট্র বিচলিত, সৈন্য সমূহও চঞ্চল এবং পরিষদ্‌বর্গও বিদ্রোহী হইয়া থাকে অর্থাৎ সে অচিরেই রাষ্ট্র-ভ্রষ্ট হয় ॥১৯॥।

রাজা স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী তপোবলের দ্বারা এবং ঐহিক নীতিপর্য্যালোচনারূপ তপস্যা হইতে বিশাল জনপদকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপ ঐহিক ও আমুষ্মিক তপঃশক্তি প্রভাবে রাজা অন্যের দুর্দ্ধর্ষ, প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, লোকরক্ষক ও প্রকৃতিরঞ্জক হইয়া থাকেন ॥২০॥ বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম ঋতুর এবং জ্যোতিষ্ক গণের গতি, রূপ ও স্বভাবের ন্যায় ইষ্টানিষ্ট ন্যূনাধিক ব্যবহার সমূহের দ্বারা রাজা কালকে ভেদ করিবেন ॥২১॥ রাজা সদাচারের নিয়ামক। এই সদাচারই সত্যত্রেতাদি যুগচতুষ্টয়ের হেতু। কালই যদি আচার-প্রবর্ত্তক হইত, তাহা হইলে রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই থাকিত না ॥২২॥ প্রজাগণ রাজার দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম নিরত সেই ব্যক্তিই এ জগতে যশস্বী হইয়া থাকে ॥২৩॥ স্বধর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ সম্ভবপর নহে ; স্বধর্ম্মই পরম তপস্যা ; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজধর্ম্ম পালনরূপ তপস্যাকে বর্দ্ধিত করে, দেবগণ তাহার কিঙ্কর হইয়া থাকে মনুষ্যেরতো কথাই নাই। অতএব রাজা অভিষিক্ত হউন বা নাই হউন বুদ্ধি বল অথবা শৌর্য্য যাহার দ্বারাই হউক যখন নৃপত্ব লাভ করিবেন, তখনই স্বধর্ম্ম-নিরত, নির্দ্দোষ এবং দণ্ডধর হইয়া প্রজা সমূহকে নীতি দ্বারা পালন করিবেন এবং অতি কঠোর শোভন দণ্ড বিধান করিয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মপালনে তৎপর করিবেন নচেৎ রাজার প্রতাপহানি হইয়া থাকে অর্থাৎ যে রাজার প্রজাগণ সুশাসনবর্ত্তী না হয়, তাঁহার আর তেজ কোথায় ? ॥২৪—২৭॥

ক্রমশঃ

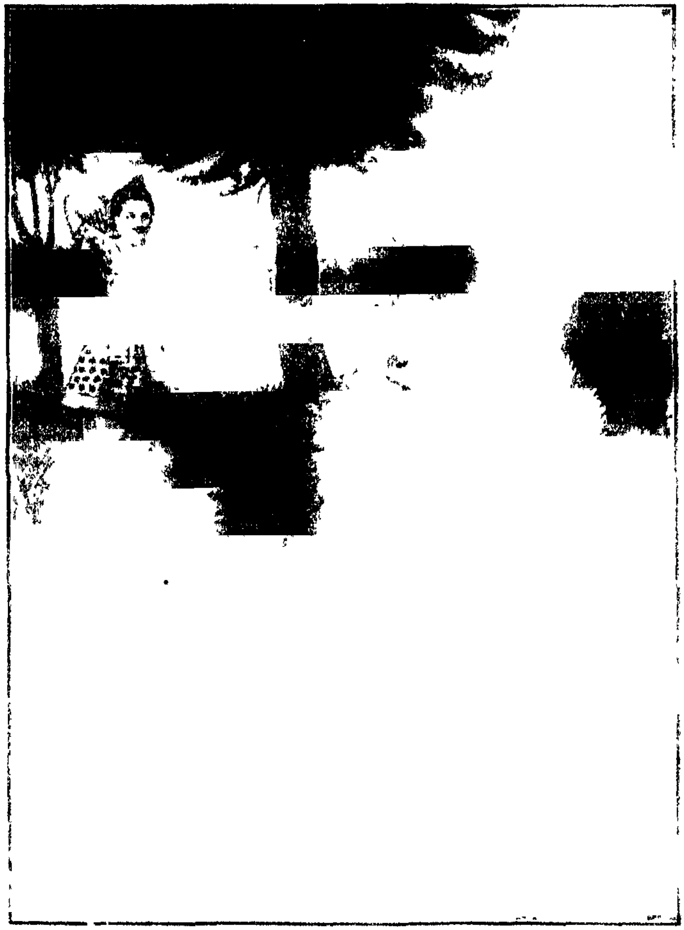

রাজা দিলীপের গো-চারণ (৮-২৬ ২৭-২৮-৩১ শ্লোক)।

ধর্ম্ম আমার স্বদেশ আমার।

[শ্রীযুক্ত জয়কুমার বর্দ্ধন রায় বিরচিত।]

ধর্ম্ম আমার স্বদেশ আমার,
তুমি মা আমার তীর্থ সার।
সার্থক তাহার জীবন-ধারণ,
তোমার গর্ভেতে জনম যার ॥

আর কেন তোর বিরস বদন,
আর কেন তোর দীন বেশ।
মা-মা রবে ডাকে কোটী পুত্র,
চেয়ে দেখ্-মা ঐ জেগেছে দেশ ॥

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী,
সহায় সম্পদ বল হীন।
তিলক-শিষ্য গান্ধী যার পুত্র ;
তাঁর কি থাকিবে এ দুর্দ্দিন ॥

বিশ্বব্যাপী যার জ্ঞান প্রতিভা,
স্তম্ভিত করিল বিজ্ঞ সমাজ।
তোর তরে মা ত্যজিয়া সর্ব্বস্ব,
ধরেছে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী সাজ ॥

দূর আফ্রিকায় দুঃস্থ ভ্রাতৃগণে,
উদ্ধারিল সহি বিবিধ ক্লেশ।
এক মাত্র ধ্যান শয়নে স্বপনে,
যাঁহার কেবল "স্বদেশ স্বদেশ" ॥

(কোরস)

(আর) কেন তোর বিরস বদন ইত্যাদি।

চিত্ত যাঁর প্রতিভা আলোকে,
উজ্জল হইল দেশ।
মহাব্রত করিতে সাধন,
ধরেছে গো আজি যোগীর বেশ ॥

তোর কাজে মা হাসিতে হাসিতে,
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা করিল দান।
ঘুচাইতে তোর দুঃখ দৈন্য
স্ত্রী পুত্র সহ বিকায়েছে প্রাণ ॥

(কোরস)

"আর কেন তোর" ইত্যাদি।

লাজপত যাঁর মাতৃগানে
ঝঙ্কৃত হইল পঞ্চনদ।
তুই তো মা গো তাদের জননী,
থাকিবে কি তোর দুঃখ বিপদ॥

(কোরস)
"আর কেন তোর ইত্যাদি।

বরপুত্র তোর মতিলাল,
দেশ প্রেম যাঁর প্রতি শিরায়।
দূরে ঠেলে শত ভয় ভীতি,
অমর কীর্ত্তি রাখিল ধরায়॥

(কোরস)
"আর কেন তোর ইত্যাদি।"

বিস্ময়ে সবে দেখিল চেয়ে,
কর্ম্মবীর আলী ভ্রাতৃদ্বয়।
দেখিল আদর্শ মাতৃ-সেবায়,
পদে দলি শত দুঃখ ভয়॥

(কোরস)
"আর কেন তোর ইত্যাদি।

স্বরাজ রবি উদিবে এবার,
ভাতিয়া মা তোমার আন্ধার মুখ।
পূজিবে মা তোর রাতুল চরণ,
উৎসাহে পূরিবে দীর্ণ বুক॥

এবার তোর পবিত্র আলোকে,
দূরে যাবে দুঃখ আন্ধার।
আমরা হব মা তোর সুপুত্র,
অতীত গৌরব লভিব আবার॥

(কোরস)
আর কেন তোর বিরস বদন,
আর কেন তোর দীন বেশ।
মা-মা রবে ডাকে কোটী পুত্র,
চেয়ে দেখ মা ঐ জেগেছে দেশ॥

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।)

১৫।

রাত্রের সেই ঘটনাটীর পর হইতেই বীরেন যেন মনে শান্তি পাইতেছিল না। প্রবৃত্তির দোষে এবং অভ্যাস বশতঃ যখন সে মদ্য পান করিত কিম্বা ইয়ার বন্ধুগণের সহিত অন্যত্র রাত্রি কাটাইয়া আসিত, তখন একরকম ভাল থাকিত;

কিন্তু একেলা হইলেই, মদের নেশা কাটিয়া গেলেই সে কেবলই সেই রাত্রের ঘটনাটী ভাবিত।

ইন্দু সে রাত্রে অজ্ঞানই বা হইয়া গেল কেন? এবং সেই বন্ধুটী ইন্দুর অঙ্গস্পর্শ করিলে তাহার মনে একটু রাগই বা হইয়াছিল কেন? এ কথাই বা তাহার মনে কেন উদয় হইয়াছিল যে, ইন্দু তাহার। সে যা খুসি ইন্দুকে করিতে পারে কিন্তু অপরে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবে কেন?

কিন্তু আঙ্গুর, বেদানা, মানদা, ইহাদের তো সকলেই সকলের সম্মুখে অঙ্গস্পর্শ করে, হাত ধরাধরি করিয়া নাচে, গায়ের উপর ঢলিয়া পড়ে, তখন তো কিছু মনে হয় না।

তবে কি ইন্দু——যাহা বীরেনের এতদিন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহা নহে? তাই বা কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে? যদি তা না হইবে তাহা হইলে সুরেশের সহিত অত হাসিয়া কথা কহে কেন? বাপের বাড়ী যাইলেই সমস্তদিন সুরেশের কাছেই বা থাকে কেন?

যদি ইন্দু সত্য সত্যই বীরেনকে ভাল না বাসিবে, দেখিতে না পারিবে, আন্তরিক যদি ঘৃণাই করিবে তাহা হইলে সমস্ত রাত কেন তাহার জন্য সে খাবার আগলাইয়া বসিয়া থাকে? এক একদিন সে তো রাত্রে আসেই না। ভোরে আসিয়া দ্যাখে ইন্দু রান্নাঘরে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সে ইন্দুকে এত মারিত, এত কষ্ট দিত কিন্তু একদিনের জন্যও তো ইন্দু তাহাকে সেই নিমিত্ত কিছু বলে নাই। বেদানাকে একদিন বীরেন রাগের মাথায় মারিয়াছিল বলিয়া সে দ্বারবান দিয়া তাহাকে সে রাত্রে তাড়াইয়া দিয়াছিল! কিন্তু ইন্দুতো একদিনও একটা কথাও বলে নাই। উপরন্তু নিয়মমতই তাহার সেবা সুশ্রূষা করিত।

মানদাকে একদিন পা টিপিয়া দিতে বলিয়াছিল, মানদা হাসিয়াই খুন। আবার বলিয়াছিল, "আমি কি তোমার ঘরের মাগ, যে টিপে দেব? বরং তুমিই আমার পা টিপে দেবে।" ইন্দুতো কোন দিন সে কথা বলে নাই।

একদিন যখন সে মাতাল হইয়া আঙ্গুরের বাড়ী মারামারি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, খবর পাইয়া ধীরেনের সহিত যাইয়া বেশ্যার বাড়ী হইতে ইন্দুই তো তাহাকে তুলিয়া লইয়া আসে।

যদি সে বীরেনকে ভালই না বাসিবে তাহা হইলে কেন সে বেশ্যার বাড়ী হইতে তাহাকে

তুলিয়া লইয়া আসিল? সে তো না যাইলেই পারিত।

সেবার যখন সে জ্বরে পড়ে, কেন ইন্দু দিবা-রাত্র অনাহারে অনিদ্রায় তাহাকে সেবা সুশ্রূষা করিয়া ভাল করিল? সে যদি বীরেনকে ঘৃণাই করিবে তাহা হইলে তো সে মরিলেই ইন্দুর পক্ষে ভাল ছিল! কেন সে তাহাকে ভাল করিল! তাহাতে তাহার লাভ কি?

সুরেশই যদি ইন্দুর হৃদয়সর্ব্বস্ব হইবে, যদি তাহাকেই সে বীরেন অপেক্ষা বেশী ভালবাসিবে তাহা হইলে ইন্দু বাপের বাড়ী যাইতে চাহে না কেন? বীরেন যদি তাহাকে পিত্রালয়ে যাইবার কথা বলিত উত্তরে ইন্দু বলিত, "আমার সবই এখানে বাপের বাড়ী গিয়ে কি কর'বো? আমি যাব না।" বীরেন অবাক হইয়া যাইত। এ আবার কি কথা। সুরেশই তো ইন্দুর সব। তবে সে বাপের বাড়ী যাইতে চাহে না কেন?

সারা সকালটা এইসব এলোমেলো চিন্তা বীরেনের মাথা গোলমাল করিয়া দিল। আর অধিক সে ভাবিত পারিল না। বলিয়া উঠিল, "দুর হোক্‌গে ছাই; যত সব বাজে ভাবনা।" পাশেই মদের বোতল ছিল। কিছু গলাধঃ-করণ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

ইন্দুও বীরেনের এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু শরৎ কালের আকাশে বিশ্বাস নাই। ভাবিয়া সে বেশী কিছু আশা করে নাই। সে শুধু ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল, "এমনি ক'রেই যেন আস্তে আস্তে মানুষ ক'রে তুলতে পারি। কেবল মাত্র এইটুকুই আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

আহার শেষ করিয়া পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় ধীরেন আসিয়া ইন্দুকে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর বৌদি" যেন পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'তে পারি।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়ই তুমি ফার্ষ্ট হবে ঠাকুরপো। তোমার বৌদি'র কথা কখন মিথ্যা হবে না।"

ধীরেন বলিয়া উঠিল, "ওকি বৌদি"! তুমি খালি গায়ে রয়েচ কেন? তোমার কাসিটা ক'দিন থেকে বেড়েচে না? ডাক্তার বলেচে সদা সর্ব্বদা একটা জামা প'রে থাকতে। আর তুমি খালি গায়ে র'য়েচ!"

"পরীক্ষা দিতে যাবার সময় ওসব ভেবনা ঠাকুরপো। তোমার সদাই ভয়, পাছে আমি মরে যাই। সামান্য কাসিতে লোকে মরে না, ভয় নেই।

"সামান্য কাশি বৈকি? কাশ্‌তে কাশ্‌তে তোমার দম আটকে যায়! কাল আবার একটু

রক্তও পড়েছিল ব'লছিলে! অমন ক'রে নিজেকে অগ্রাহ্য ক'রো না বৌদি'. তোমার পায়ে পড়ি।" "দশটা বেজে গেল যে ঠাকুরপো। শিগ্‌গীর যাও। এসব ভেবে যেন পরীক্ষাটা খারাপ ক'রে দিয়ে এস না।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দুর পদধূলি লইয়া বীরেন পরীক্ষা দিতে চলিয়া গেল। যতক্ষণ না সে একটী মোড় ফিরিল, ইন্দু এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বন্ধু-মহলে একবার ঘুরিয়া আসিয়া, দু'এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করিয়া বীরেনের মাথা অনেকটা পরীষ্কার হইয়া গেল। সকালে যে সব ভাবনা তাহাকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, সে সব একে একে অপসৃত হওয়ায় নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইতে পারিল।

বেলা একটা আন্দাজের সময় বীরেন বাটী ফিরিল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল ইন্দু তখনও খায় নাই। তাহার ভাত আগলাইয়া রান্নাঘরে বসিয়া আছে। জননী আহারাদি করিয়া পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন।

ইন্দু তাহার জন্য তেল, গামছা, কাপড়, জল প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। একটী কথাও না বলিয়া বীরেন তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আহারে বসিয়া গেল।

খাইতে খাইতে, হঠাৎ কি মনে হওয়ায়, ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখনও খাও নি?"

ইন্দু বলিল,—"মা এই মাত্র খেয়ে গেলেন। তোমার খাওয়া হোক্। বাসনগুলো মেজে, রান্নাঘর মুক্ত ক'রে তবে তো খাব।"

ডালমাখা ভাত খানিকটা মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বীরেন বলিল,—"তাহ'লে তিনটে বেজে যাবে যে?"

একটু হাসিয়া মনে মনে ইন্দু বলিল,—"কবে না তিনটে বাজে?" প্রকাশ্যে বলিল,—"তা বাজুক। খেয়ে উঠে তুমি আবার এক্ষুণি বেরুবে নাকি?"

"বেরুতে হবে বৈকী। আমাদের যে আলিবাবার বিহার্স্যাল হ'চ্চে। আমি হোসেনের পার্ঠ নিয়েচি। অতুল মর্জ্জিনা সাজবে। না গেলে আমার চলবে না। যেতেই হবে।" ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

বীরেনের আহার হইয়া গেলে এক গ্লাস জল, এক ডিবা পান ও জর্দ্দার কৌটাটী বীরেনের কাছে দিয়া আসিয়া ইন্দু ভাবিল, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, চাট্টি ভাত খাইয়া পরে বাসন মাজিবে এবং রান্নাঘর মুক্ত করিবে।

এক গ্রাস ভাত মুখে দিতেই বীরেন ঘরের ভিতর হইতে ইন্দুকে ডাকিল। ইন্দু হাত

ধুইয়া উঠিয়া গেল। বীরেন এখন যায় নাই দেখিয়া বলিল,—"এখনও যাওনি? এবেলা যাবে না বুঝি?"

"নিশ্চয়ই যাব। একটু ঘুমিয়েই যাব। আমার পা'টা একটু টিপে দাওতো। উঃ কি গরম! খানিকটা হাওয়াই না হয় কর।"

বীরেনের পাশে বসিয়া ইন্দু তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

খানিক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে বীরেন বলিল,—"কটা বেজেছে?"

"আড়াইটা বেজে গেছে।"

"তাহ'লে পা দুটো একটু শিগ্‌গীর ক'রে টিপে দাও। পাখা রাখ। এক্ষুনি বেরুতে হ'বে।"

আবার খানিক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গিতে বীরেন ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"চারটে বেজে গেছে?" ইন্দু বাতাস করিতেছিল, বলিল,—অনেকক্ষণ। এইবার আমায় ছেড়ে দাও। ওবেলার বাসনগুলো মেজে ফেলিগে যাই। রান্নাঘরটা মুক্তো ক'রতে হবে। আবার এবেলার জন্যেও তো এখন থেকে রান্না চাপাতে হবে। নইলে ওদিকে যে বড্ড রাত হ'য়ে যাবে।"

বীরেন বলিল,—"তুমি খেয়েচ তো?"

ইন্দু আর কি বলিবে? অগত্যা বলিল,—"হাঁ।"

"যাও শিগ্‌গীর ওগুলো সব মুক্তো ক'রে ফ্যালগে। আমি একটু বেড়িয়ে আসি। রিহার্স্যালে তো যাওয়া হ'লই না দেখচি।"

বীরেন ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু দেখিল বেলা পড়িয়া গিয়াছে। রান্না ঘরের ভিতর যাইয়া দেখিল তাহার বাড়া ভাতগুলি বিড়ালে সব খাইয়া গিয়াছে। সে দিন আর তাহার খাওয়া হইল না।

তাহাতে ইন্দু দুঃখ বোধ করিল না। বীরেন যে তাহাকে তাহার খাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এই ইন্দুর পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতেই সে খাবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। একবেলা অনাহার তাহার পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু বীরেনের এ প্রশ্ন তাহার নিকট বড়ই নূতন। এইটুকুতেই সে গলিয়া গিয়াছিল। ইহাও সে কখন পাইবার আশা করে নাই।

পাড়া বেড়াইয়া এখনই শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বাড়ী ফিরিবেন। এখন কিছু পরিষ্কার হয় নাই দেখিয়া তিনি অত্যন্তই চটিয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া ইন্দু তাড়াতাড়ি বাসনগুলি লইয়া পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

পথেই ধীরেনের সহিত দ্যাখা। ধীরেন বলিয়া উঠিল,—এক্ষুণি খেয়ে উঠলে নাকি বৌদি? এত বেলায়!"

"না ঠাকুরপো আমি অনেকক্ষণ খেয়েচি। ওবাড়ীর ননী ঠাকুর্ঝী এসেছিল কি না তাই দেরী হ'য়ে গেল। বাড়ী গিয়ে মুখ হাতপা ধোওগে যাও; আমি গিয়েই তোমায় খাবার দেব।"

ধীরেন ইন্দুর কথায় বিশ্বাস করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পর ভ্রমণান্তে বাটী ফিরিয়া ধীরেন বলিল,—"এই নাও বৌদি; তোমার জন্য একটা জামা কিনে এনেছি। এই ঔষধটাও রেখে দাও। ডাক্তার বাবু ব'লে দিলেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে।"

মাছের কড়াটা নামাইয়া ইন্দু বলিল,—"আমার জামার কি দরকার ছিল ঠাকুরপো? এত দামী জামা তুমি কি ক'রে আন্‌লে? টাকা কোথা পেলে?"

"সে যেখান থেকেই পাই না।"

"এ ওষুধই বা রোজ রোজ কেন নিয়ে এস ঠাকুরপো? তোমার জ্বালায় দেখচি বাঁচা দায় হ'য়ে উঠল'। জলপানির যে টাকা কটা পাও আর টিওশনি ক'রে যা পাও সবই কি আমারই জন্যে খরচ ক'রবে। না ভাই এরকম ক'ল্লে কিন্তু চলবে না, ভাল হবে না ব'লে দিচ্চি। তুমি ছেলে মানুষ, তোমার কত সখ আছে, কত জিনিষ কিন্‌তে ইচ্ছে করে সবই যদি আমার জন্যই খরচ করবে তাহ'লে নিজের জন্য কি রাখবে ঠাকুরপো?

"আমি হ'লুম ছেলে মানুষ, আর তুমি বড্ড বুড়ো না? আমার সখ থাকতে পারে, আর তোমার থাক্‌তে পারে না! তুমি যদি এ জামা না পর বৌদি, আমার কিন্তু তাহ'লে বড্ড কষ্ট হ'বে বলে দিচ্চি।'

"প'রবো বৈকী ঠাকুরপো। আমার ঘরে রেখে দাও গে যাও, আজই পরবো।"

"শুধু জামা প'ল্লে হবে না, ওষুধও খেতে হবে।"

"সেটা আর কবে না খাইয়ে ছাড়চ? ওষুধ যে আমায় খেতেই হ'বে ঠাকুরপো। এত শিগ্‌গীর মল্লে তো চলিবে না। কি বল?"

"আঃ কেবল তোমার মরবার কথা। তা ছাড়া অন্য কথাকি জান না?"

ঝোলটা সাঁৎলাইয়া লইয়া একটু হাসিয়া ইন্দু বলিল, "মরার কথা শুনে তোমার অত দুঃখু হয় কেন ঠাকুরপো? আমি মলেই বা তাতে কার কি? তোমার বেশ আর একটা বৌদি' আসবে। তাকে আমার চেয়েও বেশী ভাল বাসবে, না ঠাকুরপো?"

"থাক তোমায় আর বুড়োমি কত্তে হবে না। কি যে বল তার ঠিক নেই।"

ধীরেন সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষে জল আসিয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া ইন্দুও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই।

আজ বীরেন একটু সকাল সকালই খাইয়া লইল। ঘরের ভিতর আসিয়া ইন্দু বীরেনকে বলিল, "আজ রাতে আর নাই বেরুলে। মাথাটা ধ'রে ছিল ব'লেছিলে; একটু শোওনা টিপে দি।"

বীরেন বলিল, "নাঃ। দুপুর বেলা রিহার্স্যাল দিতে পারিনি, এখনও দেবনা, তাকি হয়?"

"কাল দিলেও তো চ'লবে? একদিন না দিলে আর কি ক্ষতি হবে।"

"না গো না। তোমার খাওয়ার জন্যে ব'লছিলে তো? তা আজ তো আর দেরী হবে না। আমি তো খেয়েই বেরুচ্চি।"

তীব্র কাশি আসিয়া ইন্দুকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমার খাওয়ার জন্যে ব'লিনি। পাছে তোমার মাথাধরাটা আরও বেড়ে যায় সেই জন্যেই ব'লছিলুম।"

আবার কাশিতে লাগিল। কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যাইবার মত হইল। সমস্ত মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল।

বীরেন বলিল "কি খাস্বাজি কাশি বাবা! চোদ্দপুরুষে কখন এরকম কাশি শুনিনি। এ কাশি কোত্থেকে বাগালে? সুরেশের কাছ থেকে বুঝি? এত পীরিত সইবে কেন বাপ্।"

সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ইন্দু বীরেনের মুখের দিকে তীব্র ভাবে চাহিল, যেন সে দৃষ্টি বলিয়া উঠিল, "কি ক'রে তুমি একথা মুখে উচ্চারণ ক'ত্তে পা'ল্লে। তোমার যে নরকেও স্থান হবে না। ছিঃ ছিঃ আর যেন কখন একথা ব'লো না।"

বীরেন হাসিয়া বলিল, "হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছ কি? জুতোর ফিতেটা পরিয়ে দাও না।"

ইন্দু নতজানু হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিল, "আজ কিন্তু তুমি না গেলেই ভাল ক'ত্তে।"

"তুমি জাগে না আমার আঙ্গুর বেদানা আগে? তারা আমাকে আজ অনেক ক'রে যেতে ব'লেচে। আমাকে যেতেই হবে।"

ইন্দু কোন উত্তর করিল না। জুতার ফিতা পরাইয়া আঁচল দিয়া জুতার ধূলা পরিষ্কার করিয়া দিবার সময় নিজের তপ্ত অশ্রুর গোটা কতক ফোঁটাও ইন্দু মুছিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

সংসার-ধর্ম্ম।

(শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।)

প্রাতঃকাল। সনাতন স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবৎ-পূজায় নিযুক্ত হইতে যাইবেন,—এমন সময় তাঁহার পত্নী মহামায়া আসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ-গা, দিনরাত ত পূজা-র্চ্চনা নিয়েই ব্যস্ত আছ;—এদিকের কিছু খপর রাখ ?"

সনাতন বিরক্ত-স্বরে বলিলেন—"দরকার করে না।"

মহামায়া বলিলেন—"তোমার ত কিছুরই দরকার করে না—যত দরকার করে আমার ?—আমি মানুষের দোরে-দোরে গিয়ে মেগে এনে দিব—ঘরে ব'সে ব'সে খাবে! তোমার আর দরকার করে কি ? আজ ঘরে ত কিছুই নেই—ছেলে-পিলেরা খাবে কি ? পাড়ার কেহই আর ধার-কর্জ্জ দেয় না—আজ উপায় হ'বে কি ?"

সনাতন—"সে চিন্তা আমার নয়, যিনি ক্ষুধায় সকল প্রাণীকে আহার, পিপাসায় জল, আঁধারে আলো দিচ্ছেন;—যাঁহার কৃপা ব্যতি-রেকে আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি নে,—যাঁহার কৃপায়, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃ-স্তন্যের পীযুষ-ধারা পান করে বাঁচে, যাঁহার করুণায় তপ্ত মরু-প্রান্তরে পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ পথিকের তৃষ্ণা নিবারণার্থে স্নিগ্ধ বারিধারা প্রবাহিত হয়; সেই দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ, বিপন্নের ভয়ত্রাতা ভূতভাবন ভগবানই নিরুপায়ে উপায় ক'রে দিবেন—আমার শক্তি কি ?"

মহামায়া—"ভগবান দিবেন সত্য;—কিন্তু এদিক্ ওদিক্ গিয়ে চেষ্টা ক'রে না আন্‌লে, তিনি ত আর ঘরে তুলে দিয়ে যাবেন না ?—কথায় বলে—

"ভগবান দয়া করে,
মানুষ যদি নড়ে চড়ে।"

তা' তুমি রাতদিন ঘরে বসে পূজো নিয়েই অস্থির আছ;—নড়-চড়-ত আর না। 'বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার টুটে';—তোমাদের এই অতুল ধন-সম্পত্তি ছিল, সমস্তই ত তুমি ব'সে ব'সে খেয়েছ।"

সনাতন—"বেশ করেছি;—তুচ্ছ ধনসম্পত্তি দিয়ে কি হ'বে—উহা কি আমার সঙ্গে যাবে ? ধনাসক্ত মানব কখনও ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না।

অর্থই যত অনর্থের মূল, অর্থই ধর্ম্মপথের প্রধান কণ্টক!”

মহামায়া—“কে বল্লে? “অর্থই” ধর্ম্ম-সাধনার প্রধান সহায়;—“অর্থই” সর্ব্বধর্ম্ম সার! বল্‌তে কি, এই অর্থ ভিন্ন কোন ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। অর্থ দ্বারা পূজা, অর্চ্চনা, অতিথি-সৎকার ও তীর্থপর্য্যটন করিয়া গৃহস্থগণ পরলোকে স্বর্গসুখ উপভোগ ক’রে থাকে। অর্থোপার্জ্জন না কর্‌লে সমস্ত ভাবী পুণ্য-সঞ্চয়ের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। তুমি ভেবে দেখ দেখি,—অর্থ না থাক্‌লে গৃহীর কিসে ধর্ম্মলাভ হয়?—ভগবান তোমার হাতে আমাদের ভরণ-পোষণের ভার দিয়াছেন,—তুমি যদি আমা-দিগকে খেতে পরতে দিতে না পার;—তবে কি তোমার অধর্ম্ম হ’বে না?”

সনাতন—কেন হবে? শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই ব’লে গিয়েছেন—

“কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥”

স্ত্রী-পুত্র কে কাহার?—অবোধ মানব বুঝে না তাই প্রতিনিয়ত “আমার স্ত্রী” “আমার পুত্র” সমস্ত আমার আমার বলিয়া ব্যস্ত! ভ্রান্ত মানব অনিত্য সংসারে অনিত্য দেহ লইয়া নিত্যবস্তু পরমার্থ ভুলিয়া কেবল নিরন্তর অমিত্র লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। হায় রে সংসারে কে কাহার?

মহামায়া—“এত যদি বিষয়-বিরাগী, মায়া-ত্যাগী, ঈশ্বরানুরাগী মহাযোগী তুমি;—তবে বিয়ে করেছিলে কেন? যৌবনে যোগী সেজে গৃহত্যাগী হ’লেই পারতে। এ মায়ামোহময়, পাপপ্রলোভনভরা সংসারে কেন? সন্ন্যাসী ঠাকুর! এখনও সময় আছে—যাও;—বিজন-বনে গিয়ে ধর্ম্ম অর্জ্জন করগে!”

সনাতন—তোমার জ্বালায় বোধ হয়, শীঘ্রই আমার সেই পথই অবলম্বন করতে হ’বে বটে।

মহামায়া—স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভাত কাপড় দিতে না পার্‌লে, মিন্সেদের এমন বুদ্ধিই জোটে।

“যাও,—আমায় পূজায় বস্‌তে দাও এখন।” বলিয়া সনাতন পূজায় নিযুক্ত হইলেন। মহামায়া রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

(২)

এইরূপ অনিবার্য্য ও বৈচিত্র্যহীন দুঃখ-দৈন্য-রাশির মাঝে একে একে আরও ছয়টী মাস কাটিয়া গেল। সনাতন এখন আর তেমন নিশ্চিন্ত মনে স্থিরচিত্তে ভগবৎ-পূজা করিতে পারিতেছেন না। দারুণ অভাব-রাক্ষসী তাঁহার

গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই পুত্র-কলত্রের "দেহি দেহি" রব তাঁহার শ্রব-- বিবরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং তিনি নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে ঈশ্বরোপাসনা নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে কাহাকে কিছু না বলিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহার গৃহে ক্রন্দ--রোল উঠিল--ব্রাহ্মণী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাদিতে লাগিলেন। স্বামীর নিরুদ্দেশে কোন্ হিন্দু ললনা স্থির থাকিতে পারে? আকস্মিক এই বিপৎপাতে অভাগিনীর শিরে যেন অনন্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেবলি স্বামীর মুখ চাহিয়া দরিদ্রের শত অভাব দুশ্চিন্তা মর্ম্মন্তুদ যাতনা হেলায় সহ্য করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার গৃহত্যাগে সাধ্বীর হৃদয় দারুণ আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। প্রিয়তম স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সতী ভীতা—আতঙ্কিতা হইয়া উঠিল। জননীকে কাঁদিতে দেখিয়া অপগণ্ড শিশু সন্তানগুলিও আকুল-ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিল।

অবশেষে সতী অপগণ্ড শিশু সন্তানগুলির মুখ চাহিয়া প্রাণের আগুন প্রাণে চাপিয়া স্বামী-শোকাবেগাশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বাছাদের মুখে আজ কি তুলিয়া দিবেন? তাহার হাতে-ত কিছুই নাই। অঙ্গের আয়তির চিহ্ন শাঁখা-লোহা ব্যতীত যাহা কিছু যৎসামান্য অলঙ্কার পত্র,—গৃহের যাহা কিছু পাতর-তৈজস-পত্র ছিল, তাহা-ত একে একে মহাজন পসারীকে ধারয়া দিয়াছেন। অবশেষে আজ দুই দিন যাবৎ তিনি একবারে কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন।—এক কণা তণ্ডুল মাত্র আজ তাহার হাতে নাই—বাছাদের মুখে কি তুলিয়া দিবেন? এতদিন সন্তানগুলিকে একবেলা আধ-পেটা খাওয়াইয়া রাখিয়াছেন,—কিন্তু আজ দুইদিন—তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে অনশনক্লিষ্ট সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় আকুল ব্যাকুল ভাবে কান্নাকাটি করিয়া আহার্য্য যাচ্ঞা করিতেছে। গৃহে-ত কিছুই নাই—যদ্দ্বারা জননী ক্ষুধার্ত্ত সন্তান গুলির ক্ষুন্নিবারণ করেন। এ অবস্থায় স্বামীশোকসন্তপ্ত সতীর স্বতঃ স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-হৃদয় শিশু সন্তানগুলির জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তিনি স্বামীশোক ভুলিয়া সন্তান-গুলিকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু "ক্ষুধার পেট কি কথায় ভরে?"

বড় ছেলেটী কাতরস্বরে বলিল—"উঃ! মাগো বড় ক্ষিধে,—পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

জননী বলিলেন—"বাবা! তুমি সবাইকে দেখ রাখ, আমি ভিক্ষায় যাই;—শীঘ্রই ফিরব এখন!"

বড় ছেলে—"না মা! আমি আর থাকতে পার্চ্ছিনে; আমায় চাট্টি দিয়ে যাও!"

"আমায়ও চাট্টি দেও মা!"—বলিয়া ছোট ছেলেটী জননীর মুখপানে চাহিল।

জননীর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল; (হায় রে মাতৃ-হৃদয়!) আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—"কি খেতে দিব বাবা? ঘরে যে কিছুই নাই?"

ছোট ছেলে—"কেন, মা! কাল কচু সিদ্ধ ক'রেছিলে, তার কি কিছুই নাই?

জননী—"না বাবা! কিছুই নাই;—তোমরা একটু থাক, আমি শীঘ্রই ফি'রে আস্‌ব।"—বলিয়া ব্রাহ্মণী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেলেন।

বিষ্ণুপাদপদ্ম-নিঃসৃতা পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরে—বটবৃক্ষমূলে পরমহংস যোগানন্দ স্বামী সমাসীন। তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সনাতন শিষ্যবৎ দণ্ডায়মান।

স্বামী সস্নেহে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! তুমি নবীন যুবক—এ বয়সে কি তোমার জটা-বল্কল সাজে?"

সনাতন—প্রভো! এ জীবন-যৌবন সকলই অনিত্য—এই অনিত্য দেহ নিয়ে, আর কতকাল সংসার-মায়ায় ভুলে র'ব। অনেক দিন ধ'রে কাম্যবস্তু ভোগ ক'রে দেখলাম,—তৃপ্তির শেষ নাই,—শান্তি ও সুখ মেলে না। তাই ভোগ-লালসা-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়ে, শান্তি-লাভাশায় আপনার পদসেবা কর্ত্তে এসেছি। প্রভো! আমায় চরণে স্থান দিন।"

সন্ন্যাসী—বৎস! তুমি যুবতী স্ত্রী রেখে' অপগণ্ড শিশু সন্তানগুলিকে অসহায় করে, পবিত্র সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর শিষ্য হতে এসেছ। তোমার অসহায় স্ত্রী পুত্রগণ তোমার পথের পানে চেয়ে আছে। তুমি অভাবে কে তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করবে?

সনাতন—স্ত্রী-পুত্র স্বার্থের দাস;—স্বার্থ হানি হ'লে তারা ভক্তি-প্রেম, স্নেহ-প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়ে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে তাই প্রভো! পুত্র-কলত্র আর ভাল লাগে না। এখন নিবৃত্তির সেবায় প্রাণ আকৃষ্ট হ'য়েছে। সংসার-ধর্ম্ম-পালনে বিতৃষ্ণা জন্মেছে—সংসার আর ভাল লাগে না।

স্বামী—বৎস! গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম মনুষ্য-জীবনের সারধর্ম্ম।

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বাণপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।"

অর্থাৎ—কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বাণপ্রস্থাশ্রম নাই। গার্হস্থ ও ভৈক্ষুক এই দু'টী আশ্রম আছে। পরিণীতা পত্নীসহ গার্হস্থ-ধর্ম্ম পালন করাই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সন্তানোৎপাদন, সন্তান লালন-পালন, সন্তানের সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান মনুষ্যের ধর্ম্ম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম! তুমি সেই মহান্ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ ক'রে, আপনার মুক্তি কামনায় —আপনার উদ্ধার মানসে সন্ন্যাসাশ্রমে এসেছ; ইহাতে কি তোমার ধর্ম্ম লাভ হইবে? জেনো বৎস! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বৃদ্ধ পিতামাতা ও পোষ্যবর্গ পরিবৃত হ'য়ে সংসার-ধর্ম্ম পালন করাই গৃহীর কর্ত্তব্য ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম! শাস্ত্রে আছে—

"সর্ব্বেষাং আশ্রমানাংহি গার্হস্থং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

সনাতন—প্রভো! সংসারে পরিজনবর্গ মায়ার-বাঁধন সুতরাং কিছুই ভাল লাগে না।

স্বামী—বৎস! আপনার স্ত্রী-পুত্র ও পরিজনবর্গকে ভালবাসতে পার্‌লে না—ভগবান্‌কে ভালবাসবে কি করে? ক্ষুদ্র সংসার কর্ত্তব্য পালনে ভয় পাইলে, বিশ্বেশ্বরের মহাকর্ত্তব্য পালন কর্‌বে কেমনে?

সনাতন—নীরব।

স্বামী—দেখ বৎস! স্ত্রী-পুত্র-পালনে বিমুখ হ'য়ে কেবল নিজে সন্ন্যাসী সেজে, গা'য়ে ছাই-ভস্ম মেখে, অরণ্য-প্রান্তে জীবন কাটালেই ধর্ম্মলাভ হয় না - বরং অধর্ম্ম হয়। তুমি অভাবে তোমার স্ত্রীপুত্রগণকে কে পালন কর্‌বে?—তোমার অবর্ত্তমানে উহাদের যত কিছু দোষ—সে পাপ তোমাতেই বর্ত্তিবে। জানত, পোষ্যবর্গের অপ্রতিপালনে মহাপাতক হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥"

অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতামাতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান শত অকার্য্য করিয়াও ইহাদিগকে প্রতিপালন কর্‌বে।

যাও, বৎস গৃহে ফিরে যাও;—সংসার পরিচালনোপযোগী অর্থাদি, যথাশক্তি দান ও দীনে দয়া ক'রে স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করগে। জানিও বৎস! সংসারে এই কর্ত্তব্য-সাধনই সার্ব্বজনীন সত্য ধর্ম্ম!

সনাতন—সংসারে থেকে কি ধর্ম্ম-সাধন হয় প্রভো?

স্বামী—কেন হবে না?—সংসার-ত ভগবানের। তুমি সংসারের সং ছেড়ে সার গ্রহণ কর!

সনাতন—এই সহস্র প্রলোভনময় সুখদুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে থেকে কি তাহা হয়?

স্বামী—"কেন?—সংসারে থেকে, ফলাফল ভগবানে সমর্পণ করতঃ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রে যাও! পুত্র কলত্র, ঘরবাড়ী, বিষয়-বৈভব সমস্তই ভগবানের,—কিছুই আমার নহে; যেমন ভৃত্য প্রভুর সংসারে থেকে, সকল কর্ম্ম করে কিন্তু তাহার ফল তাহার নহে—তাহার প্রভুর। তদ্রূপ "আমিও ভগবানের ভৃত্য—কর্ত্তব্য বোধে তাঁহারই কার্য্য করিতেছি; ইহাতে আমার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ কি আছে?"—মনে মনে এইরূপ ভাব্‌বে—সাধকাগ্রগণ্য তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"তুলসী, য়্যাসা ধেয়ান্ ধর, য্যাসা বিয়ান্ কা গাই;
মুমে তৃণ চানা টুটে, চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

"তুলসী,—এই প্রকার ধ্যান ধর, যেমন বিয়ানো গাই। নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ-ছোলা প্রভৃতি ভক্ষণ করে: কিন্তু চিত্ত বাছুরের উপর ফেলে রাখে। তেমনি সংসারে অবস্থান পূর্ব্বক পার্থিব বিষয় ভোগ ক'রে যাও—তৎপ্রতি আসক্ত হইও না; চিত্ত ভগবানে অর্পণ ক'রে রাখ।

যাও, বৎস! সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করে নির্লিপ্ত ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করগে। কর্ম্মের ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করো।—তবেই তোমার পরমাত্ম-সংমিলন ঘটিবে।—ঐ শোন ভগবানের অভয়-বাণী—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শিবরাত্রি।

তৃতীয় প্রহর।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(পণ্ডিত শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ লিখিত।)

সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত পথ। কোন দিকই বিশেষ লক্ষ্য হয় না। সত্যের উপর মিথ্যার রাজত্ব। সুতরাং ভ্রান্তির প্রকোপে উদ্ভ্রান্তচিত্ত মানব অদূরে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণমন্দির দেখিতে পাইতেছে না। তাঁহার পবিত্র রত্নবেদী তো দূরের কথা? যে বেদীর উপর বিশ্বনাথের দিব্য

সিংহাসন চিরপ্রতিষ্ঠিত। যাহা স্পর্শ করিলেই এই জ্বালাজটিল সংসার প্রতিকৃতির মোহিনী-শক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। যাহা একমাত্র লক্ষ্য, যাহা একমাত্র গম্য, যাহাকে লাভ করিবার জন্যই এই মায়াবিনীর ইন্দ্রজাল-লীলার মধ্যে ইচ্ছা করিয়া আসা হইয়াছে। যাহার উদ্দেশে এ রাজ্যের বিবিধ ধারা প্রবর্ত্তিত। যাহার স্পর্শ হইলে এধারার বিবিধ কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয়। কোন কর্ত্তব্যশৃঙ্খল আর অবরুদ্ধ করিতে পারে না। রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন হইলে, অথবা প্রিয়পাত্রের মত পার্শ্বচর হইতে পারিলে সাধ্য কি অনুচরবর্গ প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের শাসনপদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ করে? বুড়ী ছুঁইতে পারিলে তো আর চোর হইতে হয় না। সুতরাং বুড়ী ছুঁইতে পারিলেই কর্ত্তব্যের পর্য্যবসান ইহা চিরনিশ্চিত। এইজন্য এখানে বহু পথ। কোন পথ দিয়া যাইলে সহজে ও সত্বরেই বুড়ীকে স্পর্শ করা যায়, কোন পথ দিয়া যাইলে কষ্টে ও বিলম্বে বুড়ীকে স্পর্শ করিতেপারা যায়; আবার কোন পথ দিয়া যাইলে অচিরেই চোরের কবলে পতিত হইয়া চোর সাজিতে হয়। কেবল চোর হওয়া নহে তাহার সহিত চেষ্টা, প্রচেষ্টা হইতে থাকে, কাহাকে আবার চোর করি। যেহেতু মানুষ মাত্রেরই ইচ্ছা যে অপরকে নিজের মতানুবর্ত্তী করা। সুতরাং এ খেলা কেবল চোরেরই। অতএব চোরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সহজ সরল ও ভয়শূন্য পথ অবলম্বন করিতেই হইবে, নতুবা হৃতসর্ব্বস্বের প্রতিফল হাহাকার! তাই বিশ্বেশ্বরের স্তুতিপ্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্
নৃণামেকোগম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

হে পরমাত্মন্! যেমন সমস্ত নদীর একমাত্র লক্ষ্যস্থল 'সমুদ্র' সেইরূপ রুচির বিচিত্রতা হেতু সরল বক্র প্রভৃতি বিভিন্ন পথানুবর্ত্তি মানবগণের তুমিই একমাত্র প্রাপ্য।

হউক হিন্দুর বিভিন্নরুচি, বিবিধ কর্ম্মপ্রণালী, মতবৈষম্য, ভিন্ন ভাব আর ভিন্ন ব্যবস্থা, কিন্তু সকলেরই ভিতরে সেই একমাত্র বস্তু ধ্বনিত হইতেছে। এমন স্থান নাই, এমন কর্ম্ম নাই, যাহাতে তাঁহার উপলব্ধি হয় না। তিনি যে সর্ব্বত্র, এবং তাঁহাতেই যে সকল। প্রতি কর্ম্মের অভ্যন্তরে, প্রতি ভাবের, প্রতি কর্ত্তব্যের অন্তরালে, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের অস্তিত্বে, তিনি যে প্রকট। এইজন্য হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন বা নিত্য সত্য উদাসীন। যেহেতু বিরাটভাবে পরিপূর্ণ, এইজন্য ইহা সর্ব্বধর্ম্মের

আস্বক্ষণা। এমন সাম্য সামঞ্জস্য তার আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। যে ভাবেই ধর্ম্মগ্রহণ করুক, যেভাবেই তাহার ব্যবহার করুক, যে পথই অবলম্বন করুক, আর যেমন করেই যাঁহার অর্চ্চনা করুক এবং যাগ যজ্ঞাদি ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম অনুশীলন করুক, অথবা নিষ্কাম কর্ম্ম বা কেবলমাত্র ভগবৎপ্রীতয়ে কর্ম্মেরই আচরণ করুক, একমাত্র পরব্রহ্মের শিবের বা চেতনের পূজাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেহেতু এক চেতনই নিখিল জগতের অভ্যন্তরে ওত-প্রোত ভাবে বিরাজিত। পূজা করিবার সময় অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে পুষ্পও চেতন, পুষ্পের সৌরভও চেতন, গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপও চেতন আর পূজকও চেতন। ধ্যান করিবার সময় যিনি ধ্যান করিতেছেন, তিনিও চেতন, আর যাঁহার ধ্যান হইতেছে তিনিও চেতন। সুতরাং গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। এ ছাড়া আর কিছুই নাই ইহাই পারমার্থিক ভাব। এ ভাবে হৃদয় যে পর্য্যন্ত না অধিকৃত হইতেছে তাবৎ কখনই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা পরম নির্ব্বেদ অথবা নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হইতে পারে না, "নাল্পে সুখমস্তি" অল্পে সুখ নাই, "যত্র সুখং সভূমা" যেখানে সুখ তাঁহার নাম ভূমা অতএব ভূমাকে লাভ করিতে না পারিলে কখনই এই ব্যবহার দশা (Phenomenal) অবগত হইবে না। অগত্যা তাহার মধ্যে যাবতীয় বিধি, নিষেধ, আচার পদ্ধতি, কর্ত্তব্য প্রতিপালন প্রভৃতি মহাপুরুষ-প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তী হইতেই হইবে। নতুবা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত বস্তু লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। হিন্দুধর্ম্মের ঋষি-প্রদর্শিত এতটকু বিধি নিষেধও কখন ভ্রমপ্রমাদ-যুক্ত বলিয়া পরিত্যজ্য নহে। যিনি একটকু নিয়ম পরিত্যাগ করেন, তিনি কখনও মহানিয়মের অধিকারী হইতে পারেন না; বা তাহার হৃদয়ে মহাভাব কখনও উদ্দীপ্ত হইতে পারে না। যে হেতু এক মহানিয়মের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুসঙ্গিক বহু নিয়ম বহু প্রথা বা বিবিধ ধারা প্রতিষ্ঠিত। নিয়মের কোন অংশ লঙ্ঘন করিলে বড় নিয়মকে অধিকার করা যায় না। ছোট ছোট নিয়মের মধ্য দিয়াই লক্ষ্য স্থির করিয়া যাইতে পারিলে অচিরেই যাবতীয় নিয়ম অতিক্রম করিতে পারা যায়। এবং বিধি নিয়মের পরপারে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া গতাগতি বা জন্মমৃত্যুর অধিকারচ্যুত হইয়া যথার্থ শান্তিলাভে জীবন ও জন্ম ধন্য করা যাইতে পারে।

সুতরাং বৈধকর্ম্মের প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন করিতে করিতে যাবতীয় কর্ম্মের

মধ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া গমন করিতেই হইবে। লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কিছুই হইবে না। এবং প্রাণহীন অনুষ্ঠান করিলেও চলিবে না। প্রাণও থাকা চাই, লক্ষ্যও থাকা চাই। সে প্রাণ আবেগ উচ্ছ্বাস সদুদ্যম ও গূঢ়দৃষ্টিপূর্ণ হওয়া চাই, এবং সে লক্ষ্যও অনন্যদৃষ্টি ও দৃঢ়চিত্ততায় পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সেই লক্ষ্যই ঐ পরম-ব্রহ্মের বা শিবের রত্ন-সিংহাসন। তাঁহার পবিত্র বেদী। মনোনিবৃত্তিরূপ নির্ব্বেদস্থানে অবস্থিত সেই পূর্ণত্বের দিব্য পীঠ। যে নিবৃত্তিরূপ নির্ম্মল পীঠে সমাধিমগ্ন নিগুর্ণ পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ অদ্বৈতমূর্ত্তি শান্ত-মহেশ্বর চির-বিরাজমান। তিনিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাকে লাভ করাই একমাত্র জীবের জন্মপরিগ্রহের উদ্দেশ্য। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়াই এবম্বিধ জন্মমৃত্যুর নিয়মে আবদ্ধ হইতেছে। সুতরাং আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যুও অপরিহার্য্য। যোগবাশিষ্ঠ এ বিষয়ে বলিতেছেন—জীব আত্মবিস্মৃত, সে নিজেকে নিজে জানে না।

হেতুর্বিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ।
উৎপত্তি প্রকরণ, ৯৫।৮।

'জীবগণ যে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি।' এই জন্মান্তরপরিগ্রহের মধ্যেই তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। সেইখানেই শেষ। অতএব আত্মজ্ঞানই জীবের একমাত্র লক্ষ্য, আত্মজ্ঞানই জীবের প্রধানতম উদ্দেশ্য। নিজের স্বরূপাবগতিই জীবের যথার্থ কর্ত্তব্য। আত্মার অপরোক্ষানুভূতিই মানবজীবনে অনন্যলক্ষ্য স্থল। এই আত্মাই পরমাত্মা, ইনিই নিগুর্ণব্রহ্ম, ইঁহাকেই উপনিষদ্ শান্ত শিব বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। ইনি জন্ম মৃত্যুর অধীনে নহেন, জন্ম মৃত্যু ইঁহার অধীনে। ইনি সৃষ্টি প্রভৃতি মায়িক কর্ম্মের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, মায়া ইঁহার অধীনে। ইঁহার নাম নাই, রূপ নাই, হ্রস্বস্থৌল্য নাই, ইনি নিত্য একরূপ।

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্। বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। কঠ, ৩।১৫।
তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তর মবাহ্যম্।
বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯।

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, নাম নাই।' 'ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে, অন্য কিছুই নাই।'

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপাণিপাদম্। মুণ্ডক, ১।১।৬

'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই তাঁহাকেই শান্ত শিব অদ্বৈত বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন—

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য
মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

মাণ্ডুক্য, ৭।

যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত নির্দ্দেশের অতীত, আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত, (নিরুপাধি) সেই তুরীয় ব্রহ্মই 'শান্ত শিব অদ্বৈত' বলিয়া আখ্যাত। অতএব, পরম ব্রহ্মই শিব, এবং ইনিই মহেশ্বর, আর মায়া ইহাঁর ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিকেই প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। শ্বেতাশ্বতর। ৪।১০। মহেশ্বর যখন 'মায়ী', তখন মায়া মহেশ্বর হইতে বিশ্লিষ্ট নহে। কেবল পূর্ণ শান্ত নিরুদ্বেল ভাবে অবস্থান। তখনই ইনি শিব। এই শিব হইতে যখন ইকার (প্রকৃতি) বিশ্লিষ্ট হন, তখনই ইনি অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে মাত্র অবস্থিত থাকেন, তাই ইহাঁকে 'শবরূপ মহাদেব' বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহাঁর বিশাল বক্ষে লোলরসনা প্রকৃতি প্রতিপদ ভঙ্গে সৃষ্টির অভিনয় করেন। প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্যে চৈতন্যের স্পন্দন হইতে থাকে—তাই কোটি কোটি জগৎ সৃষ্ট হয়। সেই সৃষ্টি অবস্থাই ব্রহ্মের 'শব, শিবা' ভাব। নতুবা অদ্বৈত শিব। এখানে আর কিছু নাই। কেবল মাত্র নিরুদ্বেল শান্ত মহাসাগর যেন সত্তামাত্রে অবস্থিত। যখন সৃষ্টি ইচ্ছা হয়, তখন ইচ্ছা শক্তি মায়া সমুদ্ভূত হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই শিবের ত্রিনয়নের মধ্য দিয়া গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়, ঐ গুণত্রয় মিশ্রিত ইচ্ছাশক্তিমায়াকেই ত্রিগুণময়ী পরা প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে। আর ঐ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা চৈতন্য উপহিত হইয়া সগুণব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। তখনই নামরূপ ক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা। তখনই জগৎ। তখনই এ রঙ্গক্ষেত্র নির্ম্মাণ। যখন তাঁহার সৃষ্টি ইচ্ছা হয়, তখন তিনি দেখেন এই দেখাকেই উপনিষদ্ 'ঈক্ষণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "স ঈক্ষাঞ্চকার লোকান্নুসৃজা ইতি।" বেদান্তেও যেখানে প্রকৃতির (অচেতনের) জগৎকর্ত্তৃত্ব ব্যুদাস করিতেছেন, যে অচেতন প্রকৃতি কখনই জগতের স্রষ্ট্রী হইতে পারে না, যেহেতু তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অতএব এই ঈক্ষণ কখনই প্রকৃতির হইতে পারে

না। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্।" ব্রহ্মসূত্র ১।৩। সুতরাং এ লক্ষণই ঐ শান্ত শিবের। তাঁহার চক্ষুত্রয়ের দৃষ্টিতে ত্রিগুণ ও ত্রিভুবন উৎপন্ন এবং ত্রিভাব ঐ চক্ষে সর্ব্বদা বিরাজিত। রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের মধ্যে বাম চক্ষু হইতে রজঃ গুণ ও তাহাতেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, এই জন্য এই বাম চক্ষুর দৃষ্টিতে সৃষ্টি হয় বলিয়া এই চক্ষুঃই ব্রহ্মার স্থান। দক্ষিণ চক্ষুঃ হইতে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব, এই জন্য ঐ চক্ষুঃ বিষ্ণুর স্থান। উহা দ্বারাই এ জগৎ স্থিতিলাভ করিতেছে, ইহাকেই সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ কহে, ইহাই বিষ্ণুর কার্য্য। বিষ্ণু সৃষ্টিদশায় সর্ব্বদা ঐ দক্ষিণ চক্ষে আবিভূর্ত থাকেন। ঊর্দ্ধচক্ষুঃ রুদ্রমূর্ত্তি শিবের স্থান, ঐ চক্ষুঃই তমোগুণের আধার। তমোগুণ হইতেই প্রলয় হইয়া থাকে, এই জন্য ঐ চক্ষুঃর নামও রৌদ্রচক্ষুঃ। ঐ চক্ষুঃই কামকে ভস্মীভূত করিয়া জগৎকে নিশ্চিন্ত করিয়া দেয়। থাকে মাত্র বিভূতি অবশেষ! যাহা অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপ মহাদেবের গাত্রে শুদ্ধ-কামবীজ বা ভস্মরূপে অবস্থিত থাকে। সুতরাং সঙ্কল্পরূপী কামকে ভস্মীভূত করিতে ঐ তৃতীয় চক্ষুঃ কারণ, এই জন্য ঐ তৃতীয় চক্ষুতে রুদ্ররূপী কাল সংহার মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজিত। তিনি যখন ঐ তৃতীয় চক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করেন, তখন কাম ভস্মীভূত হন। এবং জগৎসৃষ্টি দূরে পলায়ন করে। তখন প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়। এই জন্য ঐ চক্ষুঃ তমোগুণের স্থান। এবং উহাই রুদ্রের সংহার অবস্থার ভিত্তিভূমি। তাই শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়—"অর্ক-জ্যোতিরহং ব্রহ্মা বিষ্ণুর্জ্যোতিরহং শিবঃ। শিব জ্যোতিরহং বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্জ্যোতিরহং শিবঃ॥"

মহেশ্বর বলিতেছেন, আমিই সূর্য্য-জ্যোতিঃ আমিই ব্রহ্মজ্যোতিঃ আমিই বিষ্ণুজ্যোতিঃ,আমিই শিবজ্যোতিঃ আবার আমিই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম শিব। তাই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ব্যতীত একজন তুরীয় (চতুর্থ) শিব আছেন, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, বা "পরম শিব।" এই পরম শিবকে সমস্ত উপনিষদই পরম ব্রহ্ম বা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, আর কিছু বলিতে পারেন না। বলিয়াছেন—

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"।

যেখান হইতে বাক্য সকল তাঁহার সীমা না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসেন। এই জন্য তিনি "অবাঙ্‌মনসোঽগোচরম্" তিনি বিকল্প-রহিত, দ্বন্দরহিত। ইহাই হইল নির্গুণব্রহ্মের বা পর শিবের সামান্য ভাব। এখানে সৃষ্টি নাই, প্রলয়ও নাই, নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। কিন্তু যখন সৃষ্টি

হয়, মহাদেবের বক্ষঃ বিদারণ করিয়া যখন মা আনন্দময়ী পরা প্রকৃতি তাথৈ নৃত্যে চিৎ সমুদ্রের উপর সৃষ্টি লহরিকা ভাসাইয়া তুলেন, তখন সেই সৃষ্টিকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুর আবশ্যক হয়, তখন তিনি দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা ঈক্ষণ করেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু সমুদ্ভূত হইয়া সৃষ্টি রক্ষায় যত্নবান্ হয়েন। কিন্তু বিষ্ণু সৃষ্টদেব। এই জন্য বিষ্ণু ও ব্রহ্মা মৃত্যুর অধীন। সুতরাং সৃষ্টিকে প্রলয়ের হাত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করিবার শক্তি বিষ্ণুর নাই। এই জন্য সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে হইলে 'হলাহলকে প্রলয়কে, মৃত্যুকে, সংযত নিয়মিত করিতেই হইবে। কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু যদি মৃত্যুর অধীন হয়, তাহা হইলে সেই সর্ব্বহর মৃত্যুকে আবার কে নিয়মিত করিবে? মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ মোক্ষস্বরূপ কেবল একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়। অতএব, মৃত্যুকে, হলাহলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে একমাত্র 'মৃত্যুঞ্জয়ই' সমর্থ। সুতরাং যখন মৃত্যুভয়ে, ভীত সকল দেবতাগণ, এমন কি বিষ্ণু পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন, তখন মৃত্যুভয়হারী একমাত্র শিবই হলাহল গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হলাহলকে গ্রহণ করিয়া রাখেন কোথায়! যেখানে রাখিবেন, যাহাতে রাখিবেন, তাহারই নাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং নিজের মধ্যে রাখা ব্যতীত আর উপায় নাই। কিন্তু নিজের মধ্যেই বা রাখেন কিরূপে? নিজেও ত অমৃতের অনন্ত সাগর, তাঁহার মধ্যেই যে সুধাসিন্ধু নিরুদ্বেল শান্তভাবে চিরবিরাজিত, তাহাতে যাহা প্রকাশ করিবে, তাহাইত অমৃত হইয়া যাইবে। আর তাহা হইলে এই ব্যবহারিক সৃষ্টিও ত থাকিবে না; কারণ সৃষ্টি ও প্রলয় দুইটী আপেক্ষিক! যেমন কেবল মাত্র পুং (Positive) কিংবা কেবল মাত্র স্ত্রী (Negative) তড়িতের উদ্ভব অসম্ভব, সেইরূপ প্রলয়বর্জ্জিত সৃষ্টি বা উৎপত্তি একবারেই অসম্ভব।

হলাহলকে মৃত্যুকে বাহিরে রাখিলে, বিশ্বে রাখিলে কালানল প্রজ্বলিত হইয়া বিশ্বকে ভস্মীভূত করিবে, আবার যদি শিবের, অমৃতের, মোক্ষের ভিতরে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে 'হলাহল, মৃত্যু, অমৃতে পরিণত হইবে এবং তাহা হইলেও ব্যবহারিক সৃষ্টি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকিবে না। লীলার অভাব হইবে। সুতরাং এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? ভিতরেও নয়, বাহিরেও নয়, মোক্ষেও নয়, সংসারেও নয়, ব্রহ্মেও নয়, বৈশ্বানর হিরণ্যগর্ভেও নয়, বিষ্ণুতেও নয়, তুরীয়ে (পর শিবে) নয়, জাগ্রতে নয়, স্বপ্নেও নয়, অগত্যা এতদুভয়ের সন্ধিতে সুষুপ্তিতে, বা ঈশে চতুষ্পাদ ব্রহ্মে, কণ্ঠদেশে হলাহল রক্ষিত হইল।

তখন গরলের প্রভাবে শিবের তুষারধবল কণ্ঠ নীলাভ হইল, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শিব সুষুপ্তিতে অবস্থান করিলেন। জগৎ তমসাচ্ছন্ন, অন্ধকারময় হইল। এইজন্য আমাদের শিব 'নীলকণ্ঠ'। এরূপ নীলকণ্ঠ, বেদান্তবেদ্য-স্বরূপ মহাদেব আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দয়ার সাগর, তিনি অমৃতের খনি, জগৎপাবনী কলতরঙ্গা জাহ্নবীকে জটা-মণ্ডিত করিয়া বিশ্বরূপের পরিচয় দিতেছেন। এইজন্য তাঁহার অপর একটী নাম 'লিঙ্গ।' লিঙ্গ অর্থে—লং+ই+গম+ড=লিঙ্গ। লং অর্থে পৃথিবীর বীজ, যাহা এই পরিদৃশ্যমান সংসার ঘটনার কারণ, অর্থাৎ কর্ম্মফল বা সংস্কার। সেই কর্ম্মফল, সংস্কারের সহিত যখন প্রকৃতি অনির্ব্বচনীয়া শক্তি সংশ্লিষ্ট হন তখনই এই ব্যবহারিক দৃশ্যমান জগৎ ভাসিয়া উঠে. তাই 'লিং' আর সেই লিং যাহাতে অধিষ্ঠিত বা লিং এ যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি লিঙ্গ, বা বিশ্বরূপ বা বিশ্বেশ্বর। অথবা যিনি ওতপ্রোত ভাবে সমগ্রজগতের অভ্যন্তরে বা সমগ্র জগৎ যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত তিনিই লিঙ্গ। তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত মস্তকে গঙ্গা ধারণ। যাঁহার উপরে মা কলনাদিনী জাহ্নবী অবস্থান করিয়া তরঙ্গ হস্তে ত্রিতাপদগ্ধ মানবগণের গাত্র স্নিগ্ধশীতল করিতেছেন, এই জনমনঃপাবনী বীচিকল্লোলহস্তা বিশাল-প্রসারিণী মা ভাগীরথী যাঁহার উপরে নিত্য নৃত্য করিতেছেন, না জানি তিনি কত বিশাল, তিনি কেমন বিশ্বরূপ!

এ বিশ্বরূপ দর্শন আর কয়জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে? আমার বিশ্বাস; ঘটিয়াছিল, একজনের। যিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর, শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্রজগৎকে এক অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন সেই আচার্য্যদেব শঙ্করের—যিনি ঐরূপ দেখিয়া উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মমমতিবাস্তাং তব পদকমলে।

সুতরাং যাঁহার মস্তকে এই ত্রিতাপনাশিনী বিশাল গঙ্গা বিরাজিত, তিনি যে বিশ্বমূর্ত্তি ইহাতে আর সন্দেহ কি? শুধু তাই নহে, তিনি ললাটে চন্দ্র ধারণ করিয়া অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জনহৃদয়ে আলোক প্রদান করেন, নিখিল জীব সে আলোকে আলোকিত হইয়া এই সূচীভেদ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বপথে স্বীয় গন্তব্যের দিকে যাইতে থাকে। সে চাঁদের আলোককে মেঘ কখনই আবৃত করিতে পারে না, সে চাঁদের

আলোকই বরং ঘনীভূত মেঘরাশিকে দূরে সরাইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। সেখানে পাপগ্রহের অধিকার নাই। কেবল নির্ম্মলতাই চির বিরাজমান। একে তুষারধবল গাত্র, তাহে ভালে শশাঙ্ক, সুতরাং সে অনুপম দিব্যজ্যোতির আর দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। শিরে অসংখ্য জটা কোটি কোটি রুদ্রমূর্ত্তির দ্যোতক। তাঁহার প্রতি কেশগুচ্ছে রুদ্রগণ প্রচ্ছন্ন শক্তিতে বিরাজমান থাকিয়া সময়ে সময়ে হুঙ্কার করিয়া উঠে, তখনই প্রশান্ত সমুদ্রের উপর প্রলয়ের বাত্যা বহিয়া যায়, জগৎ কম্পিত, দেবগণ ত্রস্ত হইয়া দেবদেবের শরণাপন্ন হয়; তখন মহেশ্বর পুনর্ব্বার ঈক্ষণ করেন, আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শান্তভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব নিয়মের প্রাকার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া নিয়ন্তার আদেশ প্রতিপালন করেন। আর একটী তাহার নাম ভুজঙ্গভূষণ। সর্ব্বদা ভুজঙ্গ তাঁহার কণ্ঠে অবস্থিত, কিন্তু কখনও ঐ সর্প শিবকণ্ঠে লম্বমান হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করে, আর কখনও বা উন্নতফণ হইয়া শিবকণ্ঠে লক্ লক্ করিতে থাকে। যখন লম্বমান হইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করে, তখন সৃষ্টি নাই নিষ্ক্রিয় নির্গুণব্রহ্মের সাম্যভাব, আর যখন উন্নতফণ হইয়া লক্ লক্ করিতে থাকে; তখন সক্রিয় সগুণব্রহ্মের বৈষম্যভাব, একই ব্রহ্ম যে সগুণ নির্গুণ হইতে পারেন, ইহারই স্মারক ঐ ভুজঙ্গধারণ। তিনি যাহা ভীতিকর, প্রাণনাশক, সেই কালকূট সর্প ধারণ করিয়া জগৎকে দেখাইতেছেন যে, এক ব্রহ্মই দ্বৈবিধ্য ভাব, সাম্য বৈষম্য ভাব ধারণ করিতে পারে; আমি কিন্তু স্থাণু নিশ্চল, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, ও উদাসীন। এই দেখ আমার উপরে সকলে ক্রিয়া করিতেছে, আমি কিন্তু নিষ্ক্রিয়। এই দেখ—আমার উপরে সকলে চলিয়া বেড়াইতেছে, আমি নিশ্চল। আবার আমার উপরে সকলে কর্ম্মাকর্ম্মে লিপ্ত, আমি কিন্তু নিত্য নির্লিপ্ত—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।"

আবার দেখ আমার উপরেই সকলে ত্রিগুণ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জন্মস্থিতি ভঙ্গুরতার বশবর্ত্তী হইতেছে; আমি কিন্তু ত্রিগুণাতীত। আমি ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া, জন্মস্থিতিমৃত্যুরূপ পুরত্রয়কে পরাভূত করিয়া অসুরবিজয়ী বা ত্রিগুণ বিজয়ী নামে আখ্যাত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার চক্ষুত্রয়ের ঈক্ষণে গুণত্রয় এবং সেই গুণত্রয়ের অধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সমুদ্ভূত হইয়া, আমার উপরে, (অখণ্ড চেতনে) নিত্য এক অভিনব জন্মস্থিতি-ভঙ্গুরতার প্রতিচ্ছবি দেখাইতেছেন; আমি কিন্তু নিত্য নির্গুণ।

এই দেখ তমোগুণের আশ্রয় রুদ্ররূপী কাল ত্রিশূল ধারণ করিয়া সংহার মূর্ত্তিতে অবস্থিত। এইজন্য তাঁহার নাম ত্রিশূলী। ঐ ত্রিশূলই ত্রিতাপের নিদর্শন। মানব কর্ম্মের দ্বারাই জন্মলাভ করে, আবার কর্ম্মের দ্বারাই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। আর মৃত্যুর কারণ যে কর্ম্ম বা কর্ম্মফল তাহা প্রায়ই ত্রিতাপবিশিষ্ট। আত্মজ্ঞান, ভগবল্লাভ, বা ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম্ম ব্যতীত সকল কর্ম্মই গুণত্রয়ের মধ্যে। অতএব গুণত্রয়ের মধ্যে যতক্ষণ থাকিতে হইবে, ততক্ষণ শরীরধারণ বা জন্মপবিগ্রহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। সুতরাং জন্মবান্ হইলেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পাপও অনিবার্য্য। সাধ্য নাই দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে এই ত্রিতাপজ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাত হয়।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

"নহি কর্ম্ম ক্ষীয়তে, ভোগমন্তরেণ কর্ম্মক্ষয়াভাবাৎ।"

যেহেতু কৃতকর্ম্মের ফল শুভ হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই তাহা ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্ম কখনও ক্ষয় হয় না, ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় নাই। এইজন্য যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে তাহাই এ ভোগভূমিতে ভোগ করিতেছে, ইহার জন্য আমি কখনই দায়ী নহি। এই দেখ রজোগুণের আশ্রয় ব্রহ্মা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া কৃতকর্ম্মের অনুরূপ জীবসৃষ্টির জন্য জলপ্রদান করিতেছেন। এই দেখ সত্ত্বগুণের আশ্রয় বিষ্ণু সুদর্শন চক্র, সৌম্য চক্র, মনোহর আবর্ত্তন ধারণ করিয়া কৃতকর্ম্মের প্রতিরূপ এই মনোহর সংসার আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত করিতেছেন। আবার এই দেখ তমোগুণের আশ্রয় বহুরূপী কাল ত্রিশূল ধারণ করিয়া ত্রিতাপের মধ্য দিয়া জীবজগৎকে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর কবলে পাতিত করিতেছেন।

"য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যোর্মৃত্যুং প্রাপ্নোতি।"

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

যে এখানে বহুদর্শন করে বা এক ব্যতীত বহুত্ব জ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, সে মৃত্যু হইতেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যেহেতু এখানে নানা বস্তু কিছু নাই।

অতএব সমস্ত ভাব সকল নীতি এক নির্ব্বিকল্প পরশিবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কিন্তু নিশ্চলভাবে একরূপে অনাদিকাল অবস্থিত। উদ্বেল নাই, চাঞ্চল্য নাই, নিত্যতৃপ্ত নিত্য উদাসীন।

কিন্তু কখনও তিনি এই জাগ্রদ্দশায় বা সংসার দশায় গোরূপ জগতে শক্তির সহিত অধিষ্ঠিত হইয়া শক্তি ও শক্তিমান্ এই দ্বৈধীভাবের ব্যঞ্জনা প্রকটিত করেন, তখন জগৎ হয় ক্রিয়াশীল,

তখন শক্তি ও শক্তিমান্ যেন পৃথক্। এইজন্য এক গোরূপ জগতের উপর উভয়েই যুগপৎ অধিষ্ঠিত থাকেন, তাই তিনি বৃষভবাহন বলিয়া ব্যবহারিক বিশ্বে প্রখ্যাত। আবার কখনও শ্মশান প্রান্তরে যথায় স্থূল শরীর বা জড়জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট হয়, সেই-খানে মৃত্যুত্রাতা মৃত্যুঞ্জয় নৃত্য করিতে করিতে ডমরু বাজাইয়া আর গালবাদ্য করিয়া "ব্যোম্" "ব্যোম্" "শূন্য, শূন্য" কিছু নাই, কিছু নাই বলিয়া চীৎকার করেন। সারা বিশ্বে সাড়া পড়িয়া যায়, সব চেতনা উদ্দীপিত হয়, সমগ্র জগৎ নিস্পন্দ নীরব সচকিতভাবে ত্রাহি ত্রাহি স্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠে—কিন্তু সে তাণ্ডব-নৃত্য থামায় কাহার সাধ্য। তখন জগতের ত্রাহি ত্রাহি প্রতিধ্বনিতে প্রকৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বশরীরে তথায় উপস্থিত হয়, এবং সেই তাণ্ডব-নৃত্যের অনুসরণ করিয়া মা আনন্দময়ীও তাথৈ তাথৈ স্বরে নৃত্য করিতে থাকেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ক্ষেপাক্ষেপীর নৃত্যে জগৎ স্তব্ধ হইয়া যায়। উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান থাকে না, একদিকে "ব্যোম্ ব্যোম্" আবার তাহার প্রতিধ্বনি অপরদিকে ঐ "তাথৈ তাথৈ" আবার "ব্যোম্ ব্যোম্" আবার তাথৈ তাথৈ। এই নাস্তি অস্তির ভীষণ সংগ্রামে তখন ত্রিভুবন আলোড়িত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ তাথৈ নৃত্য প্রবল ভাব ধারণ করে ব্যোম্ শব্দ তাথৈ শব্দে মিশ্রিত হইতে থাকে শিবের চমক্ ভাঙ্গিতে থাকে। শিব বামচক্ষুতে ঈক্ষণ করেন, প্রকৃতি সলজ্জ হইয়া অবনত হয়, এবং উভয়ে তখন আলিঙ্গন করেন তখন আর নৃত্য থাকে না, জগতে সাম্যভাব পুনরাবির্ভূত হয়, যথানিয়মে সৃষ্টি ক্রিয়ায় প্রকৃতি ত্বরান্বিতা হন, আর মহাদেব শান্তভাবে আবার নিশ্চল স্থাণু মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। ইহাই হইল পুরুষ-প্রকৃতির বিচিত্র মিলন।

তাই কোন সাধক এই শ্মশানের মহিমা বুঝিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

"হৃদয় আমার হউক শ্মশান
নিয়ত তাহাতে নাচুক শ্যামা॥"

হায়! উদ্ভ্রান্তচিত্ত জীব! কোথায় এ গভীর ভাব! আর কোথায় আমরা। আজ অন্তশ্চক্ষু-বিহীন হইয়া কিনা বুদ্ধির অপলাপ করিতেছি। আমরা অশান্তি অশান্তি বলিয়া চীৎকার করি, কিন্তু এ অশান্তি কি এ রাজ্যে মন থাকিলে যাইবার হয় এখানকার হাবভাবের ভিতরে থাকিলে কি অশান্তি-দূরীকরণ হয়। অশান্তি ধনীর উচ্চ প্রাসাদে অবস্থিত। অশান্তি ভোগীর ভোগলিপ্সায় বিরাজিত। অশান্তি বিলাসীর

সুকোমল শয্যায় চিরশয়ান। অশান্তি রোগীর, আর্ত্তের মুখে চিহ্নরূপে নিত্য লিপ্ত। অশান্তির অধিকার সর্ব্বত্র। কেবল নিবৃত্তির উপর আধিপত্য নাই তাহার পবিত্র আসনের সমীপেও যাইতে পারে না। যেখানে পরম শান্তি নিত্য একরূপে বিরাজিত। যেখানে মনের নিবৃত্তি অথবা নিজের স্বরূপ বোধ, সেইখানেই যথার্থ শান্তি। সেখানেই জ্ঞান গঙ্গা অনুকূলগামিনী হইয়া নিত্য প্রবাহিতা। যাঁহারই অপর নাম কাশী, যে কাশীতে বিশ্বনাথ চির অধিষ্ঠিত। তাহারই নাম শান্তি। তাহারই নাম শান্তি।

ভগবান্ আচার্য্যদেব শঙ্কর বলিয়াছেন—

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা।

মনের নিবৃত্তিই পরম শান্তি এবং সেই নিবৃত্তিরূপা পরম শান্তিই তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা। যে মণিকর্ণিকায় জ্ঞানপ্রবাহিণী নির্ম্মল আদিগঙ্গা নিত্যপ্রবাহিতা। আমিই সেই নিজবোধরূপ কাশীক্ষেত্র।

আবার বলিয়াছেন—

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥

নিত্য চৈতন্য ও সুখরূপ পরমাত্মভাবসম্পন্ন এবং স্বস্বরূপ আমিই কাশী। আমাতেই এই ইন্দ্রজাল কল্পিত হইয়াছে, তাই সঙ্কল্পের আলয় এই চরাচর পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

পরিশেষে বলিয়াছেন,—

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী
ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তিঃ শ্রদ্ধাগয়েয়ং নিজগুরুচরণ ধ্যান-
যোগঃ প্রয়াগঃ॥
বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ
সাক্ষীভূতোহন্তরাত্মা।
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থ-
মন্যৎ কিমস্তি॥

এই শরীরই কাশীক্ষেত্র. ইহাতে ত্রিভুবন-পাবনী মাতৃরূপা জ্ঞানগঙ্গা চির প্রবাহিত। ভক্তি ও শ্রদ্ধা গয়া, শ্রীগুরুচরণ ধ্যানই প্রয়াগ এবং এই কাশীক্ষেত্রে সকল মানবের অন্তঃকরণের সাক্ষি-স্বরূপ তুরীয় পরমব্রহ্মই কাশীনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং দেহেই যখন সমস্ত রহিয়াছে তাহা হইলে আর অন্য তীর্থের আবশ্যক কি? অতএব এবম্বিধ কাশীতে যদি কাশীনাথ দর্শন না হয়, তাহা হইলে কাশীনাথের দর্শনে জীবন মন

আর পবিত্র হইল কৈ? এবং কর্ত্তব্যেরই বা অবসান হইল কৈ?

এইজন্য নিজবোধরূপ, বা স্বস্বরূপ কাশীতে অবস্থিত তুরীয় পরমব্রহ্মের কাশী বিশ্বনাথের দর্শনই যথার্থ জীবনে কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়। এই কাশীনাথের নামই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি, তুরীয় ব্রহ্ম, পরম দেবতা, বা পরশিব। ইনি জ্ঞানঘন, আনন্দঘন ও চিদ্‌ঘন। তাই জ্ঞানানন্দময়, তাই ইনি চিন্ময়। ইহার মহিমা কীর্ত্তন শ্রুতিরও অসাধ্য। অন্য শাস্ত্রের বা জৈবহৃদয়ের কা কথা।

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
মহিম্নঃস্তোত্রং। ২।

সুতরাং পরাৎপর বিশ্বেশ্বর শিবের মহিমা-কীর্ত্তন আমার পক্ষেও ধৃষ্টতা। তবে ইহা বিশ্বাস এবং প্রাণে প্রাণে খুব সাহস ও অনুভূতি আছে যে, 'তিনি সকলই' ভাষা তিনি, ভাব তিনি, শব্দ তিনি, ধ্বনি তিনি, যন্ত্রী তিনি, যন্ত্র তিনি ঝঙ্কার তিনি, সুরগ্রাম তিনি, সুতরাং যে ভাবেই যে ভাষাতেই, যে সুরেই, যে ধ্বনিতেই তিনি ভাসিয়া, বাজিয়া উঠুন না কেন, ঝঙ্কার ও লয়ের স্থান এক। সকলই গিয়া তাহাতে মিশিবে, অথবা তিনিই সকলে ভাসিয়া বাজিয়া উঠিবেন।

রাজা দিলীপের গো-চারণ। *

(কিশোরীমোহন চৌবে সেন।)

অথ প্রজানাথ যে জন মনে
ধনের প্রধান যশেরে গণে,
বৎসে পীত করি বান্ধিয়া তা'র
ঋষি ধেনু ল'য়ে বিপিনে যায়।
শোভিছে জায়ার হাতেতে ডালা,
তাহাতে চন্দন ফুলের মালা। ১

* ইহা মহাকবি কালিদাস বিরচিত রঘুবংশ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ দর্শনে রচিত। অতএব ইহা বঙ্গ-রঘুবংশ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডের নাম বশিষ্ঠের তপোবন; তাহা আলোচনার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

১। রাজা দিলীপ যশোধন ছিলেন। রাণী তপোবনের শেষ পর্য্যন্ত সমভিব্যাহারে যাইয়া কামদুঘা গাভী নন্দিনীকে চন্দনের তিলক ও পুষ্পমালা পরাইয়া দিবেন।

গাভীর পদের পরশ পায়
ধূলি কি পবিত্র হ'তেছে তা'য় ;
অ-ধূলি ধূসরা গণের মণি,
হেন পথে পিছু রাজ-রমণী ;
শ্রুতির নিদেশ যেরূপ স্মৃতি
স্মরণে রাখিয়া করয়ে গতি। ২

নিবারি দারায়, ধরার পাতা
সুযশে সুরভি, সুরভিসুতা
যতনে রক্ষণ করিতে রত,
গাভীরূপ-ধরা ধরার মত ;
চৌদিকে যে চারি সাগর রয়,
পয়োধরীভূত তাহারা হয়। ৩

অনুচর রাজা ধেনুর এবে,
শেষ রক্ষী নিজ ফিরায় সবে ;
না ভাবে রক্ষিবে শরীর কেবা,
স্ব-রক্ষী মনুর সন্ততি যেবা। ৪

বাছিয়া দিতেছে রুচির ঘাস,
ঘর্ষণ করিছে, বারিছে ডাঁশ,
বাধা না বিতরে যেদিকে চরে ;
এরূপে সম্রাট সেবিছে তারে। ৫

স্থিরা হ'লে স্থির চলিলে চ'লে,
আসীন হইয়া আসীনা হ'লে,
সলিল পীয়িলে পীয়িয়া নীরে,
ছায়াকারে তা'র ভূপতি ফিরে। ৬

না আছে যদিও চামর ছত্র,
তেজের বিশেষে দীপিত গাত্র ;
অনুমিত হেন রাজশ্রী ধরি,
শোভেন নরেশ যেমন করী—
মদ যা'র নাহি বাহিরে ছুটে,
অন্তরে কেবল এসেছে জুটে। ৭

উন্নত করিয়া কেশের পাশ,
লাগায়ে তাহাতে লতার ফাঁস ;
ধনুতে আরোপ করিয়া ছিলা,
ধেনুর রক্ষণ ধরি' অছিলা ;
শাসিতে শ্বাপদ পশুর গণে
রাজা যেন এবে ভ্রমেন বনে। ৮

পার্শ্বসাথী জন বিহীন তাঁয়,
হেরি পাশধারী বরুণ-প্রায়,
পার্শ্বে শাখী গণ পাখীর স্বরে
"জয় জয় রাজ" কূজন করে। ৯

মরুত-প্রেরিতা বালিকা লতা,
দেখিতে মরুত-সুহৃদ্ যথা,
সমীপে আগত অবনী পালে
আচ্ছন্ন করিছে কুসুম জালে ;

৭। কোনও কোনও বলবান্ হস্তীর গণ্ডদেশ হইতে এক এক সময় এক প্রকার সুগন্ধ রস নির্গত হয়। সেই রসের আঘ্রাণে হস্তীর মত্তভাব আইসে। এই নিমিত্ত ঐ রসকে মদ কহে।

৯। বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ।

পুরে প্রবেশিতে তাঁহারে পূজে
নগর-বালারা যেমন লাজে। ১০

যদিও ধনুক রয়েছে ধরা,
মু'খানি কি মরি দয়ায় ভরা;
এ হেতু মনেতে না পেয়ে ভয়,
বনেতে যে সব হরিণী রয়,
অবাধে রাজার সুদেহ দেখি,
সফল করিছে বিপুল আঁখি। ১১

নত বেণুবংশে রচিত কুঞ্জে,
বনদেবতারা সুশান্তি ভুঞ্জে;
শুনে মহীপতি তাঁহারা ধরে,
তাঁহারি সুযশ গানের স্বরে।
বেণুবংশ বায়ু-পূরিত কায়,
বংশী ধ্বনি কিবা যোগায় তায়। ১২

নির্ঝরে নির্ঝরে শীকর ল'য়ে,
তরুতে প্রসূন মৃদু কাঁপায়ে,
তাহার সৌরভে সুরভি বায়,
আতপত্র-হীন তাপিত তাঁয়,
যতনে কেমন করিছে সেবা;
সদাচারী জনে না তোষে কেবা? ১৩

নিবে দাবানল না হ'য়ে বৃষ্টি
প্রাপ্তবৃদ্ধি ফল-ফুলের সৃষ্টি;
সবল দুর্ব্বল জীবে না নাশে,
কি মহাপুরুষ বনেতে পশে! ১৪

সঞ্চারে দিগন্ত করিয়া পূত,
দিনান্তে নিলয়ে গমনে রত,
পল্লব সদৃশ তাহার আভা,
মুনি ধেনু আর ভানুর প্রভা। ১৫

দেব-পিতৃ-লোকে, অতিথি দলে,
সেবে গুরুদেব যে ধন-বলে,
পশ্চে চলে তা'র সুরাগে অতি,
সুজন-সম্মত ভূলোক-পতি;
কায়াবতী শ্রদ্ধা আকারা ধেনু,
রাজা সদাচার যেন তদনু। ১৬

অগভীর জল-আশয় হ'তে
আসিছে উতরি বরাহ যূথে;
ময়ুর উড়িয়া চ'লেছে ঝাঁকে
আপন আবাস তরুর দিকে;
হ'য়েছে যথায় নবীন তৃণ
জুটিছে তথায় হরিণগণ;

১০। মরুত-সুহৃদ্‌—অগ্নিদেব; লাজ—খৈ।

১২। শূন্য-গর্ভ বেণুবংশের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে তাহা শব্দায়মান হয়।

১৫। এই শ্লোকের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের উক্তিগুলি বশিষ্ঠের পাটলবর্ণা ধেনু, এবং অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রভা এই উভয়েরই প্রতি ব্যবহৃত। নিলয় শব্দের অর্থ আশ্রয় বলিয়া উহাতে গৃহ ও অস্তাচল উভয়ই বুঝাইতেছে।

১৬। তদনু=তৎপশ্চাৎ।

চলেন নৃপতি জ্ঞ-আঁখি-লোভা
দেখি দিন-শেষে বনের শোভা ;
ভানু পুনঃ তেজ হারায় যত,
বনে শ্যাম ভাব আসিছে তত। ১৭

জমিয়াছে পয়ঃ তাবত দিন,
হইয়াছে স্ফীত অতি আপীন।
চরণ তাহাতে ব্যাহত হয়,
গমন প্রযত্ন-জড়িত রয়।
রাজার বিপুল বপু ও গুরু ;
এমতে উভয়ে চলনে চারু,
কেমন করিছে সুষমা-যুত,
তপোবনে ফিরি' আসিতে পথ। ১৮

দিনোদয় হ'তে আরম্ভ করি',
অরণ্যে ধেনুর পশ্চাতে ফিরি',
বনান্ত হইতে আসিলে কান্ত,
পক্ষ্ম-পাঁতি করি' নিমেষ ভ্রান্ত,
উপবাসী দু'টী নয়নে তাঁয়,
বনিতা তৃষায় পীয়িতে যায়। ১৯

পুরে রাণী, পশ্চে ধরণী-পতি,
শরণীতে মাঝে যখন স্থিতি,
শোভিল পাটলী প্রদোষ যথা—
বিভাবরী-দিবা উভয়ে যুতা। ২০

করেতে করিয়া বরণ-ডালা
সুদক্ষিণা, সেই সুরভি-বালা
প্রদক্ষিণ ক'রে, প্রণমে তাঁয়,
ভালেতে তিলক ভালো লাগায়।
বিশাল ললাট সেই পূজিছে,
সিদ্ধির কবাট ধীরে খুলিছে। ২১

ডাকিছে বাছুর দিতেছে সাড়া,
অচঞ্চলে তবু রহিয়া খাড়া.
পয়স্বিনী সেই লইছে পূজা,
নিরখি প্রফুল্ল রাণী ও রাজা।
ভক্তিযুক্ত পূজা পাইয়া যদি,
তদ্বিধ মহাত্মা প্রসন্ন হৃদি
হইয়া, প্রকাশে প্রীতির ভাব,
তা' হ'লে অদূরে ফলের লাভ। ২২

সদার গুরুর চরণ বন্দি',
উপাসনা যোগে যাপিয়া সন্ধি,
রিপু উন্মূলিত যাঁহারি ভুজে,
পুনরপি ধেনু দিলীপ ভজে ;
দোহন যখন হইলে অন্ত,
বসি' করে সেই শ্রমোপশান্ত। ২৩

সমীপে সেবার সামগ্রীগুলি
ধরি, ধূপ দীপ ধূণাদি জ্বালি',

১৮। আপীন—গোরুর পালান
২০। শরণী—পথ।
২৩। সন্ধি—দিন ও রাত্রির সন্ধি; অর্থাৎ সন্ধ্যা-কাল।

পশ্চাতে বসিয়া গৃহিণী সনে,
ভূপ রত গোর দেহ মর্দ্দনে।
গাভীর নিদ্রার সঞ্চার হ'লে,
তবে সে দম্পতী নয়ন মিলে।
নিদ্রাশেষে গাভী উঠিলে প্রাতে ;
দম্পতীও উঠে তাহারি সাথে। ২৪

প্রচুর কীর্ত্তিত সুযশধারী,
দীনের দীনতা উদ্ধারকারী,
নৃপ বিংশদিন অধিক একে,
এ হেন প্রকারে নিরত থাকে,
মহিষী সহিত গো-সেবা ব্রতে,
কুলের তিলক লভিতে সুতে। ২৫

অনুচর স্বীয় কি ভাব ধরে,
মুনি-ধেনু তাহা বিচার তরে,
অপর বাসরে, কোমল ঘাসে
পূর্ণ গিরিরাজ-গুহায় পশে ;
গঙ্গার পতন প্রদেশে যাহা,
কণা জলে সদা সেবিত কায়া। ২৬

জানি, অপারগ শ্বাপদ প্রাণী
মনেও তাহার করিতে হানি,
হিম-মহীধরে মোহন শোভা,
হেরিয়া মজেন মহীপ যেবা,
কোথা হ'তে এক মৃগেন্দ্র আসে,
গাভী আক্রমণ করিয়া বসে। ২৭

উঠে আর্ত্তনাদ কাতরা তা'র,
গিরির কন্দরে পুনঃ আবার,
সে ধ্বনি ধ্বনিত সুঘন বাজে ;
আর্ত্তভয়-হারী তখনি রাজে,
চমকি', নয়ন তাঁহার আনে,
নগেশ হইতে নন্দিনী পানে।

রশ্মিযোগে যেন সে কার্য্য হয়,
ভিন্ন পথে যবে ধাবিত হয়। ২৮
ত্বরায় ধনুক ধরি' সে করে,
লোহিত ধেনুতে কেশরী হেরে ;
গৈরিকে রঞ্জিত গিরির পিঠে,
লোধ্র তরু যেন ফুলেতে ফুটে। ২৯

তখন মৃগেন্দ্র, মৃগেন্দ্রগামী,
শরণে আগত জীবের স্বামী,
বলে উন্মূলিত-অরাতি কুল,
গর্ব্ব খর্ব্বে রোষে অতি আকুল,
নরপতি শর তূণীর হ'তে,
তুলিতে উদ্যত, হত করিতে। ৩০

প্রহারকারীর প্রধান করে,—
নখের প্রভায় ভাসিত ক'রে
কঙ্ক পত্রগুলি,—অঙ্গুলিচয়,
সায়ক মূলেতে লাগিয়া রয় ;

২৮। দ্বিতীয় হয় শব্দের অর্থ ঘোটক।

শর-নিষ্কাসনে যতন তত্র,
চিত্রপটে যেন অঙ্কিত মাত্র। ৩১
বুঝিয়া বাহুর স্তম্ভন দোষ,
তখন নৃপতি বিবৃদ্ধ রোষ,
ওষধি মন্ত্রেতে ব্যাহত-বীর্য্য
ফণীর মতন, সেই অকার্য্য
সাধনকারীরে স্পর্শিতে নারে,
নিজ তেজে দহে নিজ অন্তরে। ৩২
কুলশীলযুত জনের পক্ষ,
মনুবংশে কেতু সমান লক্ষ্য,
স্ববৃত্তে বিস্মিত বিক্রমে সিংহ,
দিলীপে ধেনুর পীড়ক সিংহ,
বলিছে মনুষ্য-বচন ধরি',
এমতে অধিক বিস্মিত করি'। ৩৩
মহীপাল! নাহি করহ ক্লেশ;
ফলিবে না ফল কিছু বিশেষ,
হানিলেও বাণ আমার প্রতি;
তরু-উৎপাটনে যা'র শকতি,
প্রভঞ্জন সেই কভু না ভঞ্জে,
বেগের প্রভাবে ভূধর পুঞ্জে। ৩৪

কৈলাস-বিশদ বৃষভ-'পরি,
আরোহণ-কালে ত্রিপুর অরি,
এ কিঙ্করে পৃষ্ঠে চরণ দানে,
কলেবর মম রত পাবনে;
নাম কুম্ভোদর তাঁহারি আখ্যা,
পার্ব্বতী-বাহন নিকুম্ভ সখা। ৩৫
দেবদারু অই হের কি পুরে?
পুত্ররূপে শিব দেখেন তা'রে;
কৃত্তিকারা যার কার্ত্তিকে পালে,
কার্ত্তিক জননী উহাতে ঢালে,
কনক-কলস স্বরূপ তাঁ'র,
পয়োধর হ'তে ক্ষীরের ধার। ৩৬
একদা আরণ্য বারণ আসি',
কণ্ডূতি নাশিতে কপোল ঘসি',
বল্কল তাহার করিল ভেদ;
পার্ব্বতী তখন ধরিল খেদ;
ধরেন যেমতি নেহারি গুহ,
অসুর-সমরে আহত দেহ। ৩৭

৩১। কঙ্কপত্র—কঙ্ক নামক পক্ষীর পালক; উহা গোড়ায় নিবিষ্ট বাণের মূলে সংলগ্ন করা রীতি ছিল। সায়ক—বাণ।

৩৪। প্রভঞ্জন—প্রবল বায়ু।

৩৬। কার্ত্তিক জননীর স্তন্যপান করেন নাই। ছয় কৃত্তিকা তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছিল। তাঁহাদের সকলেই তাঁহাকে স্তন্যপান করাইতে ইচ্ছা করায় তিনি ছয় মুখ বাহির করিয়া সমকালে সকলেরই স্তন্য পান করিয়াছিলেন এই নিমিত্তই তিনি ষড়ানন ও ষণ্মাতুর।

৩৭। কণ্ডূতি—চুলকানি। গুহ—কার্ত্তিক।

সে দিবস হ'তে ত্রিশূলধারী,
আমার সিংহত্ব বিধান করি',
বন্যকরী দুরী-করণ তরে,
এ গিরি-কন্দরে থুইল মোরে;
সমীপে আসিয়া যে পশু জুটে,
তাহারি শরীরে বুভুক্ষা মিটে। ৩৮

ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই,
অন্তরে প্রভুবে স্মরেছি যেই,
আশুতোষ আহা বুঝিয়া কাল,
শোণিত-পারণা প্রেরিলা ভাল;
হ'বে এ প্রচুর সুপেয়তম
সুরারির শশি-পীযূষ সম। ৩৯

অতএব তুমি সরম ছাড়,
হেথা হ'তে, রায়! ফিরিয়া পড়;
গুরুতে শিষ্যের উচিত ভক্তি,
দেখায়েছ তুমি যেমন শক্তি;
যাহার রক্ষণ উচিত বটে,
শস্ত্রে রক্ষা তা'র না যদি ঘটে,
শস্ত্রধারী জন যে যশ ধরে,
তাহাকে উহা না মলিন করে। ৪০

প্রগল্‌ভতা যুত এ হেন বাণী,
নরাধিপ মৃগাধিপের শুনি',
মহেশ-প্রভাবে প্রস্তিত্ব হান,
বুঝি' শিথিলিল স্ব-অবজ্ঞান।৪১

যথা ত্রিনয়নে নয়ন যোগে,
ক্রুদ্ধ ইন্দ্র পূর্ব্বে জড়ত্ব ভুগে;
হস্ত হ'তে বজ্র ছুঁড়িতে হাতে;
সেরূপ বিফল বাণ মোচিতে,
হ'য়ে এ প্রথম তাঁর জীবনে,
নরেন্দ্র মৃগেন্দ্র এমতে ভণে।৪২

উদ্যমে ব্যাঘাত পতিত যা'র,
বচন হেন সে এই জনার,
যা' আমি বলিতে যা'ব হে হরি!
তাহে উপহাস পাইতে পারি;
কিন্তু হে সতত শিবেরে সেব,
ধরে প্রাণী গণ মনে যা' ভাব,
তাহাত সকলি বুঝহ তুমি,
এ হেতু ফুটিতে সাহসী আমি। ৪৩

জড়জীবী যত আছে, সবারি,
সৃজন-রক্ষণ নিধন-কারী,
দেবাদিদেবের শাসন যেবা,
বলিলে, লঙ্ঘিতে পারে তা' কেবা;
তথাপি সাগ্নিক গুরুর ধন,
এই যে এখনি লভে নিধন,

৩৯। সুরারি—অসুর রাহু। শশি-পীযূষ—চন্দ্রের সুধা।

৪২। মহেশ্বর একদা বজ্রহস্ত ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকে জড়ীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। এ কথা মহাভারতে আছে।

আঁখি আগে আমি থাকিয়া তা'রি,
কেমনে উপেক্ষা করিয়া ফিরি। ৪৪
অতএব তুমি করুণা ধর ;
মম দেহ যোগে পারণা সার।
মুনি ধেনু ছাড় ; আহা সে কত,
দিন অবসান হ'তেছে যত
বাল বৎস তা'র মাতার তরে,
অন্তর উৎসুক কাতর করে। ৪৫
এ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসি,
গুহাগত যত তিমির রাশি,
দশন-বিভায় করিয়া নাশ,
বলে পুনঃ ভূত-পতির দাস। ৪৬
বিপুল ভূলোকে একক পতি,
নবীন বয়স, সুঠাম অতি ,
অল্প হেতু হেন বহুর বলি,—
বিচারে তরল তোমায় বলি। ৪৭
যদি জীবে এত কৃপাই আসে,
বাঁচে একা গাভী তোমার নাশে :
পরন্তু তুমি হে জীবিয়া কত,
প্রজানাথ! প্রজা পিতার মত,
অশেষ ব্যসনে করিয়া ত্রাণ,
জগতে কল্যাণ করিবে দান। ৪৮

ধেনু-অবক্ষণ পাইয়া দোষে,
এক ধেনুমান্ গুরু যে রোষে
অনল-আকার ধরিতে পারে ;
মন তব যদি এ ভয় করে,
ভূরি পয়োবতী গো কোটি দানে,
পাব কোপ তাঁ'র উপশমনে। ৪৯
অতএব এত শুভের খনি,
তেজযুত নিজ শরীর খানি,
নরবর নাহি নিপাত কর ;
স্বর্গের লালসা কি আর ধর ;
রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পদ সুখে,
ভুঞ্জ ইন্দ্রপদ এ মহীলোকে।
ভূমির সহিত প্রভেদ রহে,
তাই স্বর্গ তা'রে সবে না কহে। ৫০
এতাবত বলি' বিরত যেই,
মৃগরাজ, পুন, বচন সেই,
গিরিরাজ ধরি' গুহার মুখে,
দ্রুত হ'য়ে ভূপে কহিতে থাকে। ৫১
উচ্চে হেন যদি পড়িল সাড়া,
নন্দিনী নয়ন করিয়া খাড়া,
কাতরে রাজার বয়ানে চায়,
নৃ-দেব দয়ায় গলিয়া যায়।

৪৭। ঠাম—দেহের গঠন ভঙ্গি। তরল—অপরিপক্ব।

৫১। সিংহের কথা হিমালয় পর্ব্বতের সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল ;—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

পুনঃ তিনি তদা দেবানুচরে,
এহেন বচন-প্রয়োগ করে। ৫২
ক্ষৎ (হিংসা) হ'তে তারিবে ব'লে,
ক্ষিতিতে ক্ষত্রিয় যাহারে বলে,
বিপরীত যদি ব্যাপার তার,
রাজ্য-ভোগে মনে কি সুখ ছার ;
নিন্দা রটে, মান মলিন হয়,
প্রাণেতে মমতা কি আর রয়। ৫৩
অন্য পয়স্বিনী গণের দানে
ঋষিবরে বা হে তুষি কেমনে ?
সুরভি হইতে নহে এ ন্যূনা,
রুদ্র-তেজ শুধু পেড়েছে এনা। ৫৪
স্ব-দেহ অর্পণ নিষ্ক্রয় দিয়া,
উচিত ইহার মোচন ক্রিয়া ;
ইথে পারণাও তোমার হ'বে,
মুনির ক্রিয়াও অটুট র'বে। ৫৫
যে হেতু তুমিও পরের বশে,
যা' বলি বুঝিবে বিনা আয়াসে ;
ধেনু প্রতি যত যতন মম,
দেবদারু প্রতি তোমার সম ;
রক্ষণীয় ধনে বিনাশে দিয়া,
আপনি বহিয়া অক্ষত কায়া,

প্রভুর সমক্ষে করিতে স্থিতি,
কভুনা কাহারো হয় শকতি। ৫৬
আমারে হিংসন উচিত নয়,—
এ যদি তোমার ধারণা হয়,
মম যশোময় শরীর প্রতি
কৃপাদৃষ্টি রাখ, এই মিনতি।
নশ্বর ভৌতিক শরীরে তাঁরা
আস্থাবান্ ন'ন, মাদৃশ যাঁরা। ৫৭
সখ্যতা আলাপে আপনি আসে ;
জ্ঞান বুধগণ একথা ভাষে।
তোমায় আমায় উভয়ে এবে
বনান্তে মিলনে সুহৃদ্ ভে'বে,
ওহে শম্ভুদাস। সখা যে আমি,
আমার প্রার্থনা না টুট তুমি। ৫৮
'তবে তা'ই হক'—বচন যেই,
বলিল কেশরী, অমনি সেই,
বাহুর বিভ্রাট ঘুচিয়া যায় ;
নিরস্ত্রে দিলীপ স্বকীয় কায়,
আমিষ কবল সমান ধরে,
অম্লানে সে পশু—রাজের তরে। ৫৯
অধোমুখে যেই প্রজার নাথ,
গণয়ে সিংহের প্রচণ্ড পাত,
বিদ্যাধরগণ তাঁহার শিরে,
কোমল কুসুম মোচন করে! ৬০

৫৫। নিষ্ক্রয় – মূল্য।

'উঠ বৎস'—ইতি অমৃতময়
তখন বচন উত্থিত হয় ;
নৃপতি শ্রবণ করিয়া তাহা,
উঠিয়া দর্শন করেন, আহা,
গাভী যেন তাঁর জননী মত,
রয় বর্ত্তমান ; স্নেহেতে কত,
পয়োধরে ঝরে ক্ষীরের ধার,
সিংহের অস্তিত্ব নাহিক আর। ৬১
রাজারে বিস্ময়ে মগন দেখি,
ধেনু বলে সাধো ! মায়ায় ফাঁকী,
করি' কৈনু তব পরীক্ষা আমি,
ঋষির প্রভাবে, জানিও তুমি,
অন্তক আমারে ধরিতে নারে,
অপর ঘাতক কেমনে মারে। ৬২
শ্রদ্ধা যা' হেরিনু গুরুতে তব,
আমাতে অতুল কৃপার ভাব,
তৃপ্তি তাহে পাই ; সুত হে তুমি,
বর মাগ দিব এখনি আমি।
প্রীতা করি মোরে শুধু না ক্ষীরে,
যে যাহা বাঞ্ছে দুহিতে পারে। ৬৩
অভ্যাস যাঁহারি যাচকে দান,
একবীর বলি যাঁহারি মান,
বসুধাপতি সে দীনতা ধরি,
করেতে করের মিলন করি,
বংশের প্রধান তনয় চায়,
কীর্ত্তিতে অতুল, সুদক্ষিণায়। ৬৪
সন্তান-কাঙ্গালে রাজায় ধেনু,
বলে 'অই বর তোমায় দিনু ;
পত্র-পুট এক করিয়া লও,
তাহে পয়ঃ মম দুহিয়া খাও'। ৬৫
বৎসের ভোজন হউক আগে,
থাকুক হোমাদি তরে যা'লাগে ;
পরে যা' জাননি ! রহিবে শেষ,
দিবেন যখন ঋষি আদেশ,
ক্ষীর তব সেবা করিব তথা,
ভূ রক্ষি, উৎপন্নে প্রাপ্যাংশ যথা। ৬৬
হেন বিজ্ঞাপনে রাজার প্রতি,
গাভী প্রীততরা পুনশ্চ অতি ;
হিমগিরি হ'তে উভয়ে সুখে
চলিল তখন আশ্রম মুখে। ৬৭
অনুগ্রহ ধেনু করিল যাহা,
গিয়া নৃপ-গুরু গুরুরে তাহা,
নিবেদন করি, প্রিয়ারে বলে ;
পুনরুক্তি কিন্তু সে উক্তি ফলে ;

৬৬। রক্ষা হেতু, লাভের ষষ্ঠ ভাগ প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব স্বরূপে ভূপতির প্রাপ্য হয়। ইহাই মনুর ব্যবস্থা মত।

প্রসন্ন বদনে চাঁদের হাসি
ফুটিবার আগে, ফুটে তা' আসি। ৬৮
অনুজ্ঞা লভিয়া বশিষ্ঠ হ'তে,
অনিন্দিতশীল-শালী, সে সতে
বৎসল. বৎসের হোমের শেষে,
নন্দিনীর পয়ো-ধরের রসে.
পিপাসায় অতি করিছে পান.
শুভ্র মূর্ত্তিমান্ যশঃ সমান। ৬৯
উল্লিখিত হেন, প্রভাত কালে
ব্রতের পারণা সমাধা হ'লে,
প্রস্থান কালীন স্বস্তির বাণী,
বিনিবেশে বশী বশিষ্ঠ মুনি,
রাজ-দম্পতিরে তা'দের পুরে,
তপোবন হ'তে প্রেরণ করে। ৭০
তখন হোমান্তে হোমাগ্নি প্রীত,
গুরু, গুরুজায়া, বৎসেতে যুত
ধেনু, প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা,
ফিরে শুভাচারে বিবৃদ্ধ তেজা। ৭১
চলে রথ করে মধুর ঘোষ,
বাধার বিহনে বিতরে তোষ;
ধর্ম্মপত্নী সহ সহনে ধীর,
যাহায় সুদৃঢ় বিরাজে বীর,
তাহা কি সামান্য লৌকিক রথ?
সাফল্যে প্রফুল্ল সে মনোরথ! ৭২

অদর্শনে জাত ঔৎসুক্য বশে,
দর্শন করিতে প্রজারা আসে।
প্রজার্থে ব্রতেতে কর্শিত কায়,
নবোদয় নিশানাথের প্রায়,
যতই তাঁহায় নয়নে হেরে,
আঁখির পিপাসা না যায় দূরে। ৭৩
পুরীখানি একে অমরাবতী,
পত পত উড়ে পতাকা তথি;
পুরন্দর সম প্রবেশে তা'য়;
পৌরগণ প্রেমে পূজিছে তাঁয়,
ভুজঙ্গ পতির সমান সার,
ভুজে পুনঃ ধরে ভূমির ভার। ৭৪
অত্রির যেমতি আঁখি-জাত জ্যোতি
দিগঙ্গনাগণ ধরে,
সঁপিলে অনল হর-বীর্য্যানল
গঙ্গা যথা দেহে করে,

৭২। ঘোষ—শব্দ।

৭৩। প্রজা শব্দের অর্থ সন্তান ও জন। সেই নিমিত্ত প্রজার্থ ব্রত শব্দের অর্থ সন্তানার্থ ব্রত। পুনশ্চ, প্রজার্থ ব্রতেতে কর্শিত-কায় পদটী নিশানাথেরও বিশেষণ; সে পক্ষে প্রজার্থ ব্রতের অর্থ জগতের কল্যাণকারী দেবতাদিগকে কলারূপ ভোজন দানে রক্ষণ রূপ সর্ব্বজন হিতকর কার্য্য। কৃষ্ণপক্ষে ঐ প্রকার কলা-দানে শরীরের ক্ষয় হেতু চন্দ্রের কৃশতা জন্মে। (কলাক্ষয়ের এইরূপ বর্ণনা সাধারণ মানবের জন্য পুরাণাদিতে আছে বলিয়া কবিরাও কাব্যে তাহার ব্যবহার করেন।)

দিলীপের কুল বিস্তারের মূল
সুদক্ষিণা গর্ভ বহে,
লোকপালগণে শ্রেষ্ঠ যে যে গুণে
সে সব সংযোগে তাহে। ৭৫

ইতি শ্রীকালিদাস-বিরচিত রঘুবংশ কাব্য
দর্শনাৎ বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর প্রবরভূত
কুলোৎপন্ন শ্রীকিশোরী মোহন
চৌবেসেন কৃতে বঙ্গ রঘু-
বংশ কাব্যে রাজা দিলীপের
গো-চরণ নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

আদ্য কালের বৈদ্য বুড়া।

(কিশোরীমোহন চৌবে সেন।)

চতুর্ব্বেদের—উৎপত্তি ১-১।

শিশুরা অঙ্গুলীর ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব স্পর্শ করিতে করিতে সংখ্যা গণনার প্রারম্ভ কালে শিক্ষা পায়,—একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ,—ইত্যাদি। সকলে মহাভারত কর্ত্তা বেদ-ব্যাস ঋষির নাম অবগত আছেন। চারে বেদ, এই বচনটী তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে ছিল না। তিনি সংখ্যা গণনা শিক্ষা কালে ও পরে বেদাভ্যাস কালে বেদ এক বলিয়াই জানিতেন। মানবের আয়ুঃ ও মানসিক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে বুঝিয়া তিনিই দ্বাপর যুগে আর্য্যদিগের যাবতীয় জ্ঞানের মূলাধার বিশাল কলেবর ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধন বেদকে সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী কলেবরে হ্রস্ব করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে চারি অংশে উহার ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছেন। সেই প্রসিদ্ধ কার্য্যের নিমিত্ত

৭৫। হরিবংশে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ অত্রি ঋষির নয়ন হইতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া বারি নিঃসৃত হয়। দিগ্দেবীগণ গর্ভবিধি অনুসারে তাহা ধারণ করেন। সহসা তাঁহাদের সেই গর্ভ পতিত হইয়া চন্দ্রের বিকাশ হইয়াছিল।

হর বীর্য্য রক্ষা করিতে পার্ব্বতীকে অশক্তা দেখিয়া দেবতাগণ অগ্নির সাহায্যে তাহা গঙ্গাতে সংক্রামিত করেন।

গর্ভাশয়ে অবস্থিতিকালে ভাবী রাজার শরীর ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য যম, কুবের প্রভৃতি অষ্ট লোকপালের বিভূতি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়।

মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বাদরায়ণ নাম অপেক্ষা বেদব্যাস নামেই অধিক বিখ্যাত।

বেদ-বিভাগ দ্বাপর যুগে হয় বলিয়া বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয় অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত আছে। তথায় ব্যাসের পিতা পরাশর মৈত্রেয় ঋষিকে বলিতেছেন—

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্
কোহন্যোহি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারত কৃদ্ভবেৎ॥
তেন ব্যস্তা যদা বেদা মৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
দ্বাপরে, হ্যত্র মৈত্রেয় তন্মে শৃণু যথার্থতঃ॥

বেদ প্রথমে এক ছিল বলিয়া ভাগবত পুরাণেও উক্ত আছে। যখন শৈশব কাল হইতেই বেদশব্দ শ্রবণ করিতে হয়, তখন এক বেদ হইতে চতুর্ব্বেদ কি প্রকারে হইল, তাহার অজ্ঞতা প্রশংসনীয় নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত কিঞ্চিৎ সংস্রব থাকায় চতুর্ব্বেদের উৎপত্তি এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ব্রহ্মার একটী নাম সুর-জ্যেষ্ঠ; অর্থাৎ তিনি দেবগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন। ব্রহ্মা সমস্ত বেদমন্ত্র তপস্যা বলে লাভ করেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্ব ঋষি সমস্ত বেদ-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কথা মুণ্ডকোপনিষদে আছে। যথা ঃ—

স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্।
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥

অথর্ব্ব ঋষি বেদগুরু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিধানগত হইয়াও রহিয়াছেন। যেমন অথর্ব্ব ঋষি ব্রহ্মার স্থলে, সেইরূপ অপর ঋষিরা অথর্ব্ব ঋষির স্থলে বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন অধ্যয়নাদি কালে ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুকে স্মরণ ও বন্দনা করা শ্রেয়স্কর বলিয়া অথর্ব্ব ঋষির শিষ্যগণ সমস্ত বেদকে অথর্ব্ব বেদ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সমস্ত বেদের এই নামই প্রথম হইতে বেদব্যাসের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

দ্বাপর যুগ আসিলে চতুর্ভাগে বিভক্ত মূল জ্ঞানশাস্ত্র বেদকে ধন্বন্তরি সত্যযুগে অথর্ব্ব বেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ধন্বন্তরির ঐ উক্তি পরস্থত্রে উদ্ধৃত আছে।

বেদের মন্ত্র কতকগুলি সঙ্গীতের ভাষায়, কতকগুলি পদ্যের ভাষায়, এবং অপর কতকগুলি গদ্যের ভাষায় বর্ত্তমান। পুনশ্চ বেদে (১) নিত্য অনুষ্ঠেয়; (২) দশবিধ সংস্কার কালে অনুষ্ঠেয়; (৩) স্বর্গাদি প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠেয়; এই যে ত্রিবিধ কর্ম্মের উপদেশ আছে সেইগুলিই জনসাধারণ শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিতেন। অপর কতকগুলি বেদ-

মন্ত্র রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ বহিঃ শত্রুদিগের উচাটন, বশীকরণ ও মারণের নিমিত্ত ব্যবহার্য্য। সেইগুলির নাম অভিচার মন্ত্র। স্বদেশের অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত রাজ্যরক্ষক ক্ষত্রিয়দিগকে সমাজের বা ভগবানের ভৃত্য স্বরূপে যুদ্ধ কার্য্যের পূর্ব্বে বা সমকালে পুরোহিতের সাহায্যে অভিচার কর্ম্ম সংসাধন করিতে হইত। ধর্ম্মভীরু রাজর্ষিগণ এই চতুর্থ প্রকারের অনুষ্ঠানগুলিও পালন করিয়াছেন। কিন্তু রাজারা সাত্ত্বিক কর্ম্মের সহিত এই যে পাষণ্ড-দলনরূপ কর্ম্মও সম্পন্ন করিতেন, তাহা তাঁহারা অধ্যাত্ম জ্ঞানে পরিপক্ক হইয়াই অর্থাৎ স্বয়ং নির্লোভ ও নিরভিমান থাকিয়া জনহিতার্থ করণীয় বিবেচনা করিয়াই করিতে পারিতেন। পরম জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম বিষয়ক উপদেশ দিয়াই সুধার্ম্মিক অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। বেদে যে পরম পবিত্র ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ আছে, তাহা পঞ্চম স্থানীয়।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় বিষয়ক মন্ত্র সকলের মধ্যে যেগুলি গীতিময় দেখিলেন সেগুলি সামবেদ সংহিতায়, যেগুলি পদ্যময় দেখিলেন সেগুলি ঋগ্বেদ সংহিতায়, এবং যেগুলি গদ্যময় দেখিলেন সেগুলি যজুর্ব্বেদ সংহিতায় নিবদ্ধ করিলেন। সাধারণ কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ক সমস্ত মন্ত্রগুলি এই প্রকারে রচনানুসারে তিন বিভিন্ন বেদে পরিণত হইয়া গেল। তখন যে চতুর্থ ও পঞ্চম বিষয়ক বেদ বচনগুলি অবশিষ্ট রহিল, তাহাদিগের সংগ্রহ সেই প্রাচীন নামেই, অর্থাৎ অথর্ব্ব ঋষির নাম যুক্ত অথর্ব্ব বেদ নামেই পরিচিত হইতে থাকিল। এই প্রকারে চতুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়া গেল।

রোগ হরণ করিয়া অথর্ব্বাদি প্রাচীন ঋষিদিগের দ্রব্যাদির লাভ ৮-২।

বেদ জ্ঞানের আকর। যখন অথর্ব্ব ঋষি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বর্ণিত এবং যখন বেদের নামের সহিত একমাত্র তাঁহার নাম আদ্যকাল হইতে একযোগে উচ্চারিত, তখন অথর্ব্ব ঋষিই যে ঋষিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইহা সিদ্ধ হইল। অথর্ব্ব ঋষির সর্ব্ব প্রাচীনত্বের আরও একটী প্রমাণ আছে। অগ্নি প্রথমে তাঁহার হস্তেই শমী খণ্ডদ্বয়ের মন্থনে সমুৎপাদিত হয়। ইহা ভরদ্বাজ ঋষির মুখনিঃসৃত বেদ-বচন। যথা—

ত্বামগ্নে অথর্ব্ব নিরমন্থত।

ঋগ্বেদ ৬ম—১৬ সূ।

অথর্ব্ব ঋষি বহ্নিযোগে পুরোডাশ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণকে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইতেন। এইরূপে তিনি অগ্নির

উপকারিত্ব ও প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শন করিলে, দিক্‌পালগণ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জনসাধারণকে অগ্নির ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। অতএব অথর্ব্ব ঋষি জ্ঞান ও সভ্যতা এই উভয়েরই প্রথম উপদেশক।

পুনশ্চ, সেই জ্ঞান ও সভ্যতার অঙ্গভূত রোগ হরণ ব্যাপারেও সেই অথর্ব্ব ঋষি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ধন্বন্তরির আয়ুর্ব্বেদে অথর্ব্ব ঋষির নামোল্লেখ আছে। যথা—

"ইহ খলু আয়ুর্ব্বেদো নাম,
যদুপাঙ্গ মথর্ব্ব বেদস্য।"

অতএব অথর্ব্ব ঋষি ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী। অথর্ব্ব ঋষি একশত সাত প্রকার রোগ বিনাশক বনৌষধির বার্ত্তা অবগত হয়েন; তন্মুখ নিঃসৃত এই সংবাদ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সপ্তনবতিতম সূক্তে উক্ত আছে। যথা—

যা ওষধীঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্য স্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈন্নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ॥

(বভ্রু = পিঙ্গলবর্ণ।)

ভাবার্থ।—ইতি পূর্ব্বে (সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর) এই তিন যুগে (সোম অগ্নি প্রভৃতি) দেবতাদিগের অংশে যে সকল ওষধি সঞ্জাত হইয়াছে, সেই সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ উদ্ভিদবর্গের পৃথক্ পৃথক্ একশত সাত প্রকার ধাম অর্থাৎ শ্রেণী বিভাগ আছে বলিয়া আমার মনের ধারণা।

অথর্ব্ব ঋষি একশত সাত প্রকার বনৌষধি লইয়া চিকিৎসা করিতেন।

যেমন সাধক রামপ্রসাদ সেনের গীত মধ্যে "দ্বিজ রাম প্রসাদ বলে" এইরূপ ভণিতা আছে, সেইরূপ কথিত সূক্তের বচনগুলির শিরোদেশে অথর্ব্ব ঋষি, "ভিষক্ আথর্ব্বণ ঋষি," এই ভণিতা-যোগে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ ভণিতা সর্ব্ব সমক্ষে চিরকাল বিজ্ঞাপিত করিয়া আসিতেছে যে সেই জ্ঞান ও সভ্যতার জনকভূত সর্ব্বজন-পূজনীয় ব্রহ্মবৎ বন্দনীয় অতি প্রাচীন অথর্ব্ব ঋষি ভিষক্ অর্থাৎ বৈদ্য ছিলেন। সেই অতি প্রাচীন বুড়া অথর্ব্বই আদ্যকালের বৈদ্য বুড়া। রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য ও চিকিৎসক, এইগুলি অমরকোষ অভিধানে ধৃত সমানার্থক শব্দ।

ধন্বন্তরি ঋষির পূর্ব্ববর্ত্তী অথর্ব্ব ঋষিকেই আদ্যকালের বৈদ্য বুড়া বুঝিবার অপর অপর কারণও মূলশাস্ত্র বেদে দৃষ্ট হইতেছে। ভিষক্ বা বৈদ্য শব্দ পুরোহিত শব্দের ন্যায় বৃত্তি-বাচক; এবং উহা ব্রাহ্মণেরই এক গৌরবজনক বৃত্তির অভিব্যঞ্জক। এই বিষয় উপরি উক্ত সূক্তে নিবদ্ধ কয়েকটী বচন হইতেও বোধগম্য হইতেছে। বচন অর্থাৎ ঋক্‌গুলি নিতান্ত কঠিন নহে। ক্রমশঃ—

ইন্দ্র বৃত্রের যুদ্ধ।

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।

স্থাপিত ১৯০৮।

৪নং তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া।

ফোন নং '১৯১ হাওড়া'।

সুন্দর ছাপার কাজ যদি অল্প সময়ে ও সুবিধা দরে করিতে চান, তবে আমাদের ছাপাখানায় অর্ডার দিন।

বৈদ্যুতিক মোটর চালিত।

ভাল ভাল মেসিন ও ট্রেডেলে আনকোরা নূতন অক্ষরে ঝর ঝরে ছাপা! বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ও মনোজ্ঞ প্রীতি-উপহার, লেটার-হেডিং, বিল, ইনভয়েস, ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্যাস্‌মেমো, লেজার ও নানাপ্রকার ফরম এবং উচ্চশ্রেণীর জবের কাজ করাই আমাদের বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী ও বাঙ্গালা সকল প্রকার পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকাদি ছাপার বন্দোবস্ত আছে। পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র অতি অল্প সময়ে নির্ভুলরূপে ছাপিয়া দেওয়া হয়। একবার মাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের ছাপাখানার সংশ্লিষ্ট একটি পুস্তক-বাঁধাই-বিভাগ খোলা হইয়াছে। এখানে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ দপ্তরীর দ্বারা কাটিং, পারফোরেটিং, নম্বরিং, রুলিং, আইলেটিং, পাঞ্চিং প্রভৃতির সাহায্যে উত্তম চামড়া, মনোজ্ঞ কাপড় ও কাগজের বিচিত্র বাঁধাই হইয়া থাকে। সদাগরী অফিসের মোটা ও মজবুত লেজার ও ক্যাস-বুক ইত্যাদি ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট মলাটের পুস্তকাদি সুচারুরূপে বাঁধাই করা হয়। সকল প্রকার একাউণ্ট-বুক ইত্যাদি ও একসারসাইজ-বুক সুলভ মূল্যে বাঁধাই ও বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত আমরা অল্প সময়ের ভিতর সুবিধাদরে সুন্দর কাজ করিয়া দিই।

কাগজের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা এখানে ছাপাখানার ও সাধারণের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার কাগজ আমদানী করিয়াছি। মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ; পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

হিলিংবাম

মেহ প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

এক মাত্রায় উপকার। ২৪ ঘণ্টায় জ্বালা নিবারণ।

সপ্তাহে রোগমুক্তি।

"হিলিংবাম" সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে সর্ব্বদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ব্যবহার্য্য। গণোকোকাই নামক এক প্রকার কীটাণু, মেহ প্রমেহ রোগের মূল কারণ। কেবলমাত্র "হিলিংবাম" দ্বারাই এই সকল কীটাণু সমূলে বিনষ্ট হয় বলিয়া, "হিলিংবাম" মেহ প্রমেহাদি রোগের একমাত্র মহৌষধ। ২৫ বৎসর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিলিংবাম সেবনে

প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা সপূঁজ ও সূত্র-তার ন্যায় বিকৃত ধাতুপাত, প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে শুক্রপাত, কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণ দাগ লাগা, মূত্রনালীর টনটনানি, প্রস্রাবের পথে ক্ষত, স্ফূর্ত্তিহীনতা, হাত পা জ্বালা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা ও কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্ব্বদা আলস্য, কার্য্যে অনুৎসাহ ইত্যাদি উপসর্গ সকল "হিলিংবাম" সেবনে আরোগ্য হয়।

"হিলিংবাম" নিজগুণে বহু খ্যাতনামা উচ্চ উপাধিধারী ডাক্তারগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকজন ডাক্তারের নাম দেওয়া গেল যথা—

কর্ণেল কে, পি গুপ্ত (আই, এম্, এস্,) এম্, এ, এম ইত্যাদি; মেজর বি, কে বসু, (আই, এম্, এস্) এম্, ডি, সি, এম্; মেজর এম, পি, সিংহ (আর, এম্, এস্) এম্, আর, সি, পি; এম্, আর, সি, এস্; ডাঃ ইউ গুপ্ত এম্, ডি, এফ, সি, এস্; ডাঃ এস্ চক্রবর্ত্তী, এম্, ডি, লণ্ডন; ডাঃ ই, এস্, পুষং এম্, ডি, (লণ্ডন) ডাঃ জি, সি, বেজ-বড়ুয়া—এল্, আর, সি, পি, এল, এফ্, পি, এস্; ডাঃ এ ফারমী, এল্, আর, পি, এণ্ড এস্; ডাঃ আর, সনিয়াম এম্, বি, সি, এম্; ডাঃ আর, নিউজেণ্ট এল্, আর, সি, পি, এণ্ড এস্; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষ বিবরণাদির জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক বিনামূল্যে পাঠান হয়, পত্র লিখিলেই পাইবেন। মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারী ২।৷০, ছোট শিশি ১৷৷০ ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

আর লগিন্ এণ্ড কোং কেমিষ্টস্।

টেলিগ্রাফ—হিলিং, কলিকাতা।

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্যামেকা সালসা রক্ত পরিষ্কারক পারাগর্মি ও বাতনাশক, বলবৃদ্ধিকারক, সেবনকালে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৷০ ৩ শিশি ৪৷৵০।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মূল্য প্রতি ড্রাম /১০ ও /১৫, গৃহচিকিৎসা কলেরাচিকিৎসার বাক্স পুস্তক ঔষধ ও ফোঁটাফেলিবার যন্ত্র সহ মূল্য ১২ শিশি মাঃ সহ ২৷০, ২৪ শিশি ৩৷৵০, ৩০ শিশি ৪৷৵০, ৪৮ শিশি ৬৲, ৬০ শিশি ৭৷০ ৮৪ শিশি ১০৷০, ১০৪ শিশি ১৩৲

দরিদ্র ভাণ্ডার ঔষধালয় শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল ১৫/৩নং লক্ষ্মী দত্তের লেন। পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ব্লু-ব্ল্যাক কালীর ট্যাব্‌লেট।

এই কালীর ট্যাব্‌লেট বিলাতী কালী অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ৫ টি ট্যাব্‌লেটে এক দোয়াত সুন্দর কালী হয়।

ফ্যান্সি টিন বাক্স সমেত ১ গ্রোস বা ১৪৪টী ট্যাব্‌লেটের মূল্য ৸৵০ আনা।

সবুজ ৸৵০ ভাওলেট ৸৵০ ও লাল ১৵০ আনা, মাশুলাদি ।০ চারি আনা। একত্রে ১২ গ্রোস লইলে মূল্য ৯৲ টাকা মাশুলাদি ১৲ টাকা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

স্বাধীন জীবিকা—মূল্য মাশুল সহ ১৵০, যোগ বা সাধন তত্ত্ববারিধি ১৵০, পাঁচুবিবি উপন্যাস ৷৵০, কায়েত ধূর্ত্ত বা যমের দর্পচূর্ণ ৷৵০, বিশ্ববিজ্ঞান কাব্য ৷৵০, পারিজাত হরণ গীতাভিনয় ১৵০, শঙ্কর বিজয় নাটক ।৵০, ইংলিশ টিচার বা ইংরাজী পণ্ডিত ।৵০ আনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল।

১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

১০ খানি গোল্ডমেডেল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত।

গবর্ণমেণ্ট এবং রেলওয়ে কালী ও রবারষ্ট্যাম্পের একমাত্র কণ্ট্রাক্টার্স।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুদৃশ্য মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও বহুদিন স্থায়ী। বিলাতি ফরাসী দেশের এসেন্সকে হার মানিতে হইয়াছে। দেশীয় এসেন্সের ত কথাই নাই। প্রিয়জনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব সামগ্রী। একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন, আপনি সুখী হইবেন। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এসেন্সের তালিকা যথা :—

এসেন্স বোকে—বিলাতি এসেন্স কাশ্মীর বোকে হইতেও উৎকৃষ্ট ... ১।০

মনের মতন—উৎকৃষ্ট স্থায়ী গন্ধ, বিশেষ আদরণীয় ... ... ১।০

ভিক্টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ, বহুক্ষণ স্থায়ী ... ১।০

নৈশসুন্দরী beauty of the night হাসনাহানা পুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ ... ১৶০

কাশ্মীরকুসুম—নূতন ধরণের গন্ধ—৸৶০। হোয়াইট রোজ—দেশীয় গোলাপের গন্ধ— ৸০

ডামাস্ক রোজ—দেশীয় গোলাপের গন্ধ ৸০

এসেন্স রজনীগন্ধ—সদ্যপ্রস্ফুটিত রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ ৸০

বকুল—সুলভ উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ, বড় শিশি—৸৶০। ছোট— ॥/০

খস্—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুক্ষণ স্থায়ী ৸০

কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী পুষ্পের গন্ধ ৸০

গন্ধরাজ প্রস্ফুটিত—গন্ধরাজ পুষ্পের স্থায়ী গন্ধ ... ৸০

চেরি—চেরি-ব্লসমের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ—৸০ জেস মিন্—প্রস্ফুটিত জুইফুলের স্থায়ীগন্ধ—।৶০

কুমুদিনী—সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের স্থায়ীগন্ধ—৸০। টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ (অতি মনোহর) ॥০

সেফালিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ (যাহা কোথাও নাই) ... ... ।৶১০

হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ (এরূপ এই গন্ধ নূতন) ৸০

ভুলনা আমায় forget me not—দ্রব্যের সহিত তুলনায় মূল্য অতি অল্প ... ২৶

অডিকোলন—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী, তৃপ্তিজনক ও বহুক্ষণ স্থায়ী ... ॥০

অফিস—১৩নং সুকিয়াস লেন, মুর্গিহাটা (পর্টুগীজ চার্চ্চের সম্মুখে) কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

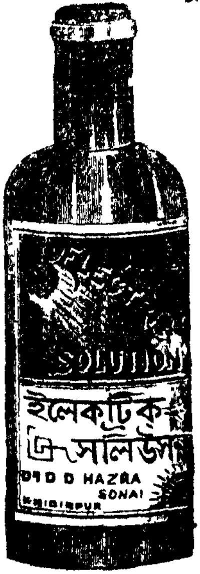

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু যাহারা জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছে, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল বহুমূত্র, বাত, হিষ্টিরিয়া, পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছে, তাহারা বাঁচিতে পারে। পরীক্ষা করুন। আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটেলের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত "ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন" ব্যবহার করুন। ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নব-জীবন লাভ করিতেছে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৴০।

ম্যালেরিণ।

নূতন পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বর, কম্পজ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পালাজ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। যাঁহারা অন্য কোন ঔষধে ফল পান নাই, তাঁহারা "ম্যালেরিণ" ব্যবহার করুন; আশু ফল পাইবেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা জ্বরে ও বিজ্বরে সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। মূল্য প্রতি শিশি ॥৴০, মাশুলাদি ।০।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ কলিকাতা ও কলিকাতার প্রধান ২ ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

আর্য্য-শক্তি ঔষধালয়, হাঁসাইল, ঢাকা।

১৩০৬ স্থাপিত সুলভ অকৃত্রিম ঔষধ ভাণ্ডার। অধ্যক্ষ—কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক, গ্রন্থপ্রণেতা, হিন্দু কেমিষ্ট ও হাঁসাইল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক। হেড অফিস—হাঁসাইল, ঢাকা। চ্যবনপ্রাস—৩৲ সের, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ—৪৲ তোলা, এইরূপ কবিরাজী সকল ঔষধ ভূড়ান্ত সস্তা। শ্বাসসুধা—হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র—১৲ শিশি, প্লীহা-বিজয়—প্লীহা ও যকৃতের মহৌষধ—৩০টী বড়ী ৸০ আনা; কন্দর্পবিলাস—অকাল বার্দ্ধক্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য নিবারক এবং যৌবনের বল ও যৌবনশ্রীবর্দ্ধক ১ মাসের ঔষধ ৩৲ টাকা; সর্ব্বজ্বরের পাচন—সকল প্রকার পুরাতন জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র—১৲; অমৃতবিন্দু কষায় সালসা, উপদংশ রক্তদুষ্টির অব্যর্থ ঔষধ ১৲ টাকা; অভয়ামোদক—সুখে ২।৩ বার কোষ্ঠ পরিষ্কার মূল্য ।০ আনা; দদ্রুদাবানল—সকল প্রকার দাদনাশক মূল্য প্রতিকৌটা ।০ আনা; দন্তসুধা—শান্তিক ও দন্তমূল স্ফীতির মহৌষধ, প্রতিকৌটা ।০ আনা; হজমীবটী, প্রতিকৌটা ॥০ আনা। ক্যাটলগে হিসাব দেখুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অর্ডার দিবার সময় এই পত্রিকার নামোল্লেখ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মুল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯৷৷৹ সাড়ে নয় টাকা, ও তিন শিশির মূল্য ২৷৷৹ আড়াই ডাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা রহিল।

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

সি, কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট-কলিকাতা

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল।

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরশ্চরণ-সিদ্ধ গ্রহৌষধি সমন্বিত

অষ্টধাতু নির্ম্মিত।

নবগ্রহ কবচ।

মাদুলির মধ্যে প্রাপ্য।

এই কবচটী আমার পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেব জ্যোতির্ব্বিৎ-শিরোমণি মহেশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন মহাশয় পুরশ্চরণ-সিদ্ধ করিয়া আমাকে প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, এই অমূল্য কবচটী যাঁহাকে ধারণ করাইয়াছি, তিনিই ইহার অলৌকিক শক্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া সাধারণে প্রচার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা ধারণ মাত্র শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি স্ফুরিত হয় এবং নানাবিধ জটীল ব্যাধি আরোগ্য হয়। মৃতবৎসাদি দোষ-দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের ইহা একমাত্র বন্ধু। বিষয়কর্ম্ম লইয়া যাঁহারা সর্ব্বদা শত্রুভয়ে ভীত, মোকর্দ্দমা যাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম, তাঁহারা অগোণে ইহা ধারণ করুন এবং ইহার **অমোঘ দৈবশক্তি দর্শনে হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি আস্থাবান্ হউন।** আমি কবচমাত্রেই জাবক, কুঙ্কুম গোরোচনা দ্বারা চতুর্ব্বর্ণ ভূর্জ্জপত্রে বিচারপূর্ব্বক যথাবিধি লিখিয়া থাকি। তাহার উপর এই কবচটীতে নয়প্রকার গ্রহৌষধি প্রদত্ত হয়। বহুল প্রচারার্থ ইহার মূল্য মাত্র ২৷৷৹ আড়াই টাকা। মাশুলাদি ।৶০ আনা।

রামকবচ, নৃসিংহকবচ, ত্রৈলোক্যমঙ্গল কবচ, ইষ্টসিদ্ধিকবচ ইত্যাদির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাশুলাদি ঐ। অন্যান্য কবচের বিষয় অনুসন্ধানে জ্ঞাতব্য। বিস্তর প্রশংসাপত্র আছে।

জ্ঞাপক—**শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়।**
৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

গ্রহস্ফুট, ভাবস্ফুট, ভাবসন্ধি ফলপরিমাণাদি সহ কোষ্ঠীর গণক

পণ্ডিত—**শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।**

মহাশয় এখানে সাধারণের উপকারার্থে অতি সুলভ মূল্যে কোষ্ঠীগণনা ও ভাগ্যফল বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহার গণনা অভ্রান্ত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত। নিম্নে কোষ্ঠী ঠিকুজীর মূল্য প্রদত্ত হইল॥

ঠিকুজী প্রস্তুত ২৲ দুই টাকা হইতে। স্ফুট কোষ্ঠী প্রস্তুত ১০৲ দশ টাকা হইতে।

কোষ্ঠী বিচার ২৲ দুই টাকা হইতে। যোটক বিচার ১৲ এক টাকা।

জ্ঞাপক—**শ্রীসত্যগোপাল [illegible]।**

বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে

কামশাস্ত্র।

দীর্ঘজীবন লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের আমাদের "কামশাস্ত্র" একবার পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ করিবার ও শরীর সুস্থ রাখিবার স্বাভাবিক নিয়মগুলি বিশদ-রূপে বর্ণিত আছে, ইহাতে গার্হস্থ্য চিকিৎসাপ্রণালীও সম্বলিত আছে। ইহা ঘরে থাকিলেও চিকিৎসকের কার্য্য করিবে। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে প্রেরিত হয়।

বটিকা কি ?	"আতঙ্কনিগ্রহ"
ঐ বটিকা	দুর্ব্বলের জন্য।
ঐ বটিকা	শরীরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে।
ঐ বটিকা	ধাতবপদার্থ রহিত !
ঐ বটিকা	৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটা ১৲ টাকা।

বটিকার প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রীর

"আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়"

২১৪নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,

(আফিস)

আলোচনা, ২৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৯ সাল।

শ্রীকৃষ্ণ।

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ।)

সকলের পিতা তুমি—
ঈশ, দয়াময় ;
সর্ব্বত্র পূজিত, প্রভো,
সকল সময়।
ভক্ত বলে, ভগবান,
জ্ঞানী ব্রহ্ম বলে,
কত রূপে, কত নামে
অবনী মণ্ডলে।
নন্দিত, বন্দিত, প্রভো,
সকল সময়,
ব্রহ্ম, ভগবান্, আত্মা—
নামে পরিচয়।
যোভ্ বা যিহোবা, আল্লা,
বলে কত জনা ;
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড ভবি,
তোমার বন্দনা ;
সভ্য বা অসভ্য কিম্বা,
পণ্ডিত বর্ব্বর ;
সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে
পূজিত, ঈশ্বর।
সকলের আদি তুমি
সকলের পার ;
সকল কারণ তুমি
সকলের সার।
সকলেব মাঝে তুমি,
তবু অজানিত,
সকল তোমার মাঝে,
তবু অবিদিত।
সব দেখি, মনে হয়
তুমি সর্ব্বময়,
খুঁজি না পাইলে মনে.
বড় দুঃখ হয়।
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
যা কিছু আমার—
সকলেই ডেকে বলে—
সংবাদ তোমার।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ,
ধরিবারে ধায় ;
দিশাহারা হ'য়ে তারা,
খুঁজিয়া বেড়ায়।
তখন ডাকিয়া কেবা,
অন্তর হইতে,
বাহিরে খুঁজিলে বলে,
না পাবে দেখিতে।

অন্তরের মাঝে সে যে—
ভক্তিযোগ পথে,
প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়—
থাকে সাথে সাথে।
অন্তর খুঁজিয়া দেখ—
অমৃতের খনি ;
মিলিবে মিলিবে সত্য—
সে পরশ মণি।

কমলার মা।

(শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য।)

কলেজের ছুটি হইয়াছে। শচীন্দ্রনাথকে সত্বরেই দেশে যাইতে হইবে। তাঁহার পিতা বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিয়া বারম্বার পত্র দিতেছেন। শচীন্দ্রেরও বিবাহে অমত নাই। তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধু উমানাথকে সঙ্গে লইয়া আগামী কল্য ভোরের ট্রেণে দেশে রওনা হইবেন। শচীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিবাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। উমানাথের সহিত কথা ছিল—তিনি সন্ধ্যাকালে আসিয়া শচীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল শচীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতিকষ্টে উমানাথের বাসার উদ্দেশে বাদুরবাগান রওনা হইলেন।

উমানাথ গরিবের ছেলে। একমাত্র মা ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহই নাই। মামার সামান্য কিছু সাহায্য লইয়া উমানাথ লেখাপড়া শিক্ষা করিত। নানাস্থান হইতে উমানাথের বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে। কিন্তু উমানাথের মামা এম-এ পাশ না করিলে বিবাহ দিবেন না বলিয়া প্রার্থিগণের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিতেছেন। তত্রাচ, হতভাগ্যগণ সুপাত্রে কন্যা-দানের আশায় তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে,

একটা বড় রকমের শিকার ধরাই উমানাথের মামার উদ্দেশ্য।

শচীন্দ্র উমানাথের বাসায় গিয়া দরজায় কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে উমানাথের মা বলিয়া উঠিলেন—"মা কমলা! দোর খুলে দে। উমানাথ ডাকিতেছে।" শচীন্দ্র বাহির হইতে বলিলেন—"আমি শচীন্দ্র।" কিন্তু সে স্বর বাড়ীর কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না। কমলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হঠাৎ অপরিচিত মুখ-দর্শনে কমলা একটু সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইল। শচীন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না—এটা বাস্তব না চপলার চকিত চমক। তিনি এরূপ রূপ-লাবণ্য আর কখনও দেখেন নাই। তাই তিনি এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প সেইখানেই বন্ধ হইল।

রাত্রি ১০টার সময় উমানাথ শচীন্দ্রকে দেখিয়া যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। কারণ সন্ধ্যার সময় শচীন্দ্রের বাসায় উমানাথের যাওয়ার কথা। শচীন্দ্রকে দেখিয়া উমানাথ বলিলেন—"ভাই শচীন্দ্র! মনে কিছু ক'রো না। আমার অনেক বন্ধুর পিতার ব্যারাম আজ খুব বেশী হয়েছে; তাই কিছুক্ষণ সেখানে তাঁর সেবা-যত্নে ব্যাপৃত ছিলাম। কা'ল কখন্ যাওয়া ঠিক হ'লো।" শচীন্দ্র বলিলেন—"কা'ল যাওয়া হ'লো না। আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, এ অবস্থায় রাস্তায় বে'র হ'তে সাহস হয় না।" উমানাথও তাহাতে মত দিয়া এক মাসের জন্য বিবাহ বন্ধ রাখিতে শচীন্দ্রের পিতাকে পত্র দিতে বলিলেন।

কমলার সম্বন্ধে নিজের মনের মধ্যে নানারূপ আলোচনায় শচীন্দ্র সর্ব্বদাই অন্যমনস্কভাবে থাকেন। সময়ে স্নান-আহার করেন না। কাজেই দিন দিন তাঁহার শরীর খারাপ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে শচীন্দ্র মধ্যে মধ্যে উমানাথের বাড়ী আসিতেন। এখন প্রত্যহই আসেন। হঠাৎ একদিন শচীন্দ্রের দিকে উমানাথের মায়ের দৃষ্টি পড়িল। তিনি বলিলেন—"বাবা শচীন্দ্র! তোর শরীর বড়ই খারাপ হয়েছে। আমার মনে হয়—খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধা হচ্ছে। তুই দিনকতক আমার কাছে থাক্।" শচীন্দ্র অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

শচীন্দ্রের ব্যারামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতা রমানাথ তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গঙ্গারামকে কলিকাতা পাঠাইলেন। গঙ্গারাম সে-কেলে লোক। সে সমাজে কোনরূপ অনাচার দেখিতে পারিত না। শচীন্দ্র শৈশবে মাতৃহীন।

গঙ্গারামই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। ভৃত্য হইলেও শচীন্দ্র গঙ্গারামের সহিত কখনও ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। কমলার সহিত শচীন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া গঙ্গারাম মনে মনে ধারণা করিয়া লইল—দাদাবাবু ব্রাহ্ম হ'য়ে গেছে। একদিন প্রকাশ্যে গঙ্গারাম শচীন্দ্রকে বলিয়া ফেলিল—"দাদাবাবু! আপনি এমন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে একবারে ব্রাহ্ম হ'য়ে গেলেন? আপনার পিতামহ ব্রজনাথ বাচস্পতি মহাশয় একজন পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। আর আপনি সেই বংশের বংশধর হইয়া সেই পবিত্রকূলে আজ কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিলেন?" শচীন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"সেকি গঙ্গা দাদা, আমি ব্রাহ্ম কি ক'রে হলাম!" গঙ্গারাম বলিয়া উঠিল—"দাদাবাবু! সে কথা আর আমাকে গোপন কর্‌বেন না। অত বড় মেয়ে সর্ব্বদা কাছে আসা-যাওয়া করে, এ ব্রাহ্ম নয় তো কি!" শচীন্দ্র এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না।

গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিল। সে একবারে রমানাথকে বলিয়া ফেলিল দাদাবাবু ব্রাহ্ম হ'য়ে গেছে। পিতার মন বড়ই চঞ্চল হইল। তিনি পুত্রকে বাটী আসার জন্য পুনরায় পত্র দিলেন। শচীন্দ্রনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

শচীন্দ্র একদিন উমানাথের সহিত প্রস্তাব করিলেন—এখানে যখন শরীর সারিতেছে না একবার পশ্চিম গেলে ভাল হয় না কি? উমানাথ সম্মতি দিলেন। শচীন্দ্র বলিলেন—আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ তাতে হিন্দুস্থানী পাচকের হাতের রান্না খেলে প্রাণ বাঁচবে না। সংসারে মা-ভগিনী এমন কেউ নেই—এই অসময়ে যাঁদের সাহায্য পেতে পারি। উমানাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা! আমার মাসী-মা তোমার সঙ্গে যাবেন। শচীন্দ্র যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন।

সন্ধ্যাকালে উমানাথ তাঁহার মা ও মাসী-মাকে ডাকিয়া শচীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাওয়ার এবং তাঁহার মাসী-মাকে সঙ্গে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। উমানাথের মাসী-মা বলিলেন—বাবা! পশ্চিম যাওয়ায় আমার কোনও আপত্তি নাই; বরং সৌভাগ্যের কথা; অনেক তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া হইত। কিন্তু বাবা! কমলার বিবাহ না দিয়া আমি কোন স্থানে যাইতে পারি না। শচীন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন—মাসী-মা আমি এখন সেওয়র

যাবো মনে করেছি। সেখানে অনেক বাঙ্গালী আছেন। এদেশ অপেক্ষা সেখানে কম খরচে ভাল পাত্র জুটিতে পারে। আপনি কমলাকেও নিয়ে চলুন।

কমলা এতক্ষণ দোর ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শচীন্দ্রের যাওয়ার কথা শুনিয়া অলক্ষ্যে তাহার দুই বিন্দু অশ্রুও পড়িয়াছিল। সে ভাবিতেছিল শচীন্দ্র চলিয়া গেলে সে আর এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। পরক্ষণেই শচীন্দ্রের মুখে তাহার যাওয়ার কথা শুনিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিল।

আজ রাত্রি ১০ টার ট্রেনে কমলা ও কমলার মাতাকে সঙ্গে লইয়া শচীন্দ্রনাথ দেওঘর রওনা হইবেন। তাঁহার, কলিকাতার ভৃত্য হরিদাস তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে। জিনিষ পত্র ঠিক করা হইয়াছে। কিন্তু সহসা সন্ধ্যা ৭ টার সময় শচীন্দ্রের পিতা জুতা হস্তে একটা ডবল কাপড়ের ছাতা ও একগাছা বাঁশের ছড়ির মধ্যে একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ কাঁধে করিয়া আদালতের পেয়াদার ন্যায় শচীন্দ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার ভাবগতিক দেখিয়া শচীন্দ্রের মনে বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। তত্রাচ, অনিচ্ছায় পিতাকে একটা প্রণাম করিলেন।

শচীন্দ্র তাঁহার ভৃত্য হরিদাসকে ডাক দিয়া বলিলেন—বাড়ীর মধ্যে বাবার জন্য খাবার প্রস্তত করতে বল-গে। রমানাথ সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—আমি তোমার মত ব্রহ্মজ্ঞানী নই যে যার-তার বাড়ীতে খাবো। আমি রাত্রে কিছু খাবো না। কাল সকালে ৭ টার ট্রেন আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে বাড়ী যেতে হবে। ১৮ই তারিখে তোমার বিবাহের দিনস্থির করে এসেছি। শচীন্দ্রনাথ পিতার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল বাড়ীতে জানাইয়া দিলেন—এখন পশ্চিমে যাওয়া হলো না। কা'ল বাবার সঙ্গে দেশে যেতে হবে। কমলা এ সমস্ত ব্যাপার কিছুই জানে না। সে শুনে নাই—শচীন্দ্রের বাবা আসিয়াছেন। কমলা শচীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে—কখন্ রওনা হতে হবে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কমলাকে দেখিয়া রমানাথের শরীরের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল এ মুখ তিনি যেন আর কোথাও দেখিয়াছেন। রাত্রে শয়ন করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষণেক কমলার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া পরক্ষণেই পুত্রের বিবাহের চিন্তায় বিভোর হইয়া নিদ্রাসুখে মুখব্যাদান করিলেন।

আজ ৭ টার ট্রেনে শচীন্দ্রনাথকে পিতার সঙ্গে দেশে যেতে হবে। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়াই কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন—কমলা! আমি দেশে যাচ্চি। কলেজ খুল্‌লে আবার আস্‌বো। তোমাদের সংবাদ মধ্যে মধ্যে দিও। মেয়েটীর নাম কমলা শুনিয়া বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি আপন মনে বলিলেন—হ্যাঁ কমলা! তাঁহার সে কথা আর কেহ শুনিতে পাইল কিনা জানি না।

শ্রীপুরের তারানাথ ভট্টাচার্য্যের কন্যা স্বর্ণবালার সহিত শচীন্দ্রনাথের বিবাহ। মেয়েটী রূপে-গুণে সমান। বিবাহের আর সাতদিন মাত্র বাকী আছে। শচীন্দ্রনাথের পিতা তিন হাজার টাকা পুত্রের মূল্য অবধারণ করিয়াছেন। আজ তাঁহার বায়না গ্রহণের দিন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া বায়না দিতে আসিয়াছেন। কন্যাদায়ে ব্রাহ্মণকে পৈতৃক জমি জায়গা সবই বিক্রয় করিতে হইয়াছে। আজ আবার শচীন্দ্রনাথের পিতা রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—শচীন্দ্রনাথকে আনিতে কলিকাতা যাওয়া আসায় আমার একশত টাকা খরচ হইয়া গেল। এই টাকা আপনাকে দিতে হইবে। তারানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যুক্তকরে বলিলেন মহাশয়! আর আমার কিছুই নাই। ঐ এক শত টাকা গরিব ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রনাথের পিতার পা ধরিতে গেলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। শচীন্দ্রনাথের পিতা বলিলেন—একশত টাকার জন্য যে লোক পা ধরিতে পারে সে রকম ছোট লোকের মেয়ে আমি গ্রহণ করিব না। ব্রাহ্মণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। শচীন্দ্রনাথ পিতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির অছিলায় এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন।

উমানাথ এখন এম-এ পড়িতেছেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক উমানাথের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। অনুরোধ উপরোধে উমানাথের দুই একটী প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বটে; কিন্তু পাঠকগণের ও সমালোচকগণের তীব্র তাড়নায় সম্পাদক মহাশয়গণকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। একখানা সংবাদপত্রের একজন সহকারী সম্পাদকের সহিত উমানাথের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তিনি প্রায়ই উমানাথের বাসার

আসিতেন। কমলার রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া সহকারী সম্পাদক মহাশয় তাহাকে বিনাপণে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। কমলার মাতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিবেন বলিয়া মনে বড় আনন্দ অনুভব করিলেন। সহকারী সম্পাদক মহাশয় কমলার বংশ পরিচয় জানিতে চাহিলে কমলার মাতা বলিতে লাগিলেন—বাবা! কমলার বংশ পরিচয় বিশেষ কিছু দিতে পারিব না। কমলা আমার গর্ভজাত কন্যা নহে। আমি সামান্য একটী পল্লিগ্রামে বাস করি। আমার স্বামী কুলীন। তাঁহার সংসারে একমাত্র আমি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। আমার দশমাস গর্ভাবস্থায় আমার স্বামী অর্থের লোভে বহুদুর দেশে পুনরায় বিবাহ করিতে যান। সেই হইতেই তিনি আমার সহিত বিচ্ছিন্ন। শ্বশুরের সম্পত্তির মালিক হইয়া এখন তিনি শ্বশুরালয়েই বাস করিতেছেন। আমার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মে। পুত্রটীকে মাত্র সম্বল করিয়া এত কষ্টের মধ্যেও আমি স্বামীর ভিটা ছাড়ি নাই। একবৎসর পরে কাল বিসূচিকা রোগ আমার প্রাণ-পুত্তলিটীকে গ্রাস করিল। সেই সময় আমি মধ্যে মধ্যে শ্মশানে বেড়াইতে যাইতাম। একদিন শ্মশানঘাটে গিয়া দেখি—এক ব্রাহ্মণ একটী কন্যা ক্রোড়ে লইয়া একটী শবের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আমি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি এই শিশু কন্যাটীকে লইয়া শ্মশানে আসিয়াছেন কেন? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—আমার স্ত্রী ছয়দিনের এই মেয়েটীকে রাখিয়া মারা গিয়াছেন। আমি তাঁহার সৎকার করিতে আসিয়াছি। সংসারে আমার এমন কেহ নাই যে তাহার কাছে মেয়েটীকে রাখিয়া আসি। তুমি স্ত্রীলোক তুমি একাকিনী শ্মশানে বেড়াইতেছ কেন?

ঠাকুর! আমার একটী গুপ্তধন ছিল। নিষ্ঠুর শ্মশান আমার সেই গুপ্তধনটী চুরি করিয়াছে। সেই রত্নটী ভিক্ষা করিতে আমি মধ্যে মধ্যে শ্মশানে আসি। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে আমি পুত্রশোকাতুরা। ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এই মেয়েটীকে নেবে কি? ব্রাহ্মণ আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মেয়েটী আমার কোলে দিলেন। আমিও নির্ব্বাক অবস্থায় মেয়েটীকে গ্রহণ করিয়া একবার মাত্র মনে মনে বলিলাম—ঠাকুর! এ আবার কি করিলে? আমি মেয়েটীকে লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ আমাকে ডাক দিয়া বলিলেন—দেবি। দয়া করিয়া যখন অধমের দান গ্রহণ করিয়াছ, এই দক্ষিণা লও। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তস্থিত একটী অঙ্গুরী

আমার হাতে দিলেন। আর বলিলেন—এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের আর একটী অনুরোধ আছে। মেয়েটী যদি বাঁচে, নাম রেখো 'কমলা'। আমি সামান্য লেখাপড়া জানি। বাটী আসিয়া দেখিলাম অঙ্গুরীতে লেখা আছে—রমানাথ মুখোপাধ্যায় সাং সূর্য্যপুর।

এই বলিয়া তিনি কমলার পিতার প্রদত্ত অঙ্গুরীটী সহকারী হরিধন বাবুর হাতে দিলেন। বাসার কেহই এই সমস্ত ব্যাপার জানিতেন না। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। হরিধন বাবু সেদিন আর কোনও কথা না বলিয়া বাসায় আসিয়া তাঁহার 'দেশরঞ্জন' পত্রে নিম্নলিখিতরূপ একটা সংবাদ প্রকাশ করিলেন:—

আগামী ৬ই ফাল্গুন রবিবার সূর্য্যপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলাবালা দেবীর সহিত 'দেশরঞ্জন' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ-বিবাহ হইবে। হরিধন বাবু একজন শিক্ষিত কর্ম্মী যুবক। তিনি বিণাপণে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কমলা এক্ষণে বাদুরবাগানে তাঁহার পালিতা মাতার নিকটে থাকেন। বিবাহ ৯নং বাদুরবাগান হইতে হইবে। কমলার আত্মীয় স্বজন কেহ এই বিবাহে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলে সাত দিনের মধ্যে পুরা নাম ও ঠিকানা সহ এই কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জানাইবেন। তাঁহার আবশ্যকীয় পাথেয় ডাকযোগে তাঁহার নিকট পাঠান হইবে।

রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'দেশরঞ্জন' পত্রের গ্রাহক ছিলেন। বিবাহের দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মুখুজ্যে মহাশয় কাগজখানি পাইয়া উহা খুলিয়া প্রথম স্তম্ভে এই সংবাদটী পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। পরে গঙ্গারামকে ডাক দিয়া বলিলেন—গঙ্গারাম! প্রস্তুত হও। এখনই কলিকাতা যাইতে হইবে। বেলা ৫টার সময় মুখুজ্যে মহাশয় গঙ্গারামকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। রাত্রি ১০টার সময় ট্রেণ হাওড়ায় পৌছিল।

রাত্রি ১ টার পর বিবাহের লগ্ন। কন্যাদানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী লইয়া বিবাহ বাড়ীতে খুবই একটা গোলযোগ চলিতেছে। এমন সময় একখানা ছ্যাকরা গাড়ী হইতে দুইটী লোক অবতরণ করিলেন। মুখুজ্যে মহাশয় কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মনের আবেগে একবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—একটী মেয়েকে বিবাহের সাজে সাজান হইতেছে। তিনি তাহাকেই কমলা বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া গিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—মা! নরকের কীট আমি, তাই এমন স্বর্ণপ্রতিমাকে বিলিয়ে দিয়ে এতদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সেছিলাম। তোর এই পাষণ্ড পিতাকে ক্ষমা কর্ মা। তুই ভাগ্যবতী—তাই এই দেবী তোকে গ্রহণ করেছেন। আমার মত হতভাগ্য পিতার কাছে থাক্‌লে তোকে এত যত্নে রাখতে পারতাম না। এমন সুপাত্রে বিবাহও দিতে পারতাম না। মা! আজ তোকে পেয়ে যতটা আনন্দ না হয়েছে, ততোধিক আনন্দ হয়েছে সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায়। সেই সময় মুখুজ্যে মহাশয় মনে মনে বলিলেন—পিশাচ আমি, আমি তারানাথকে যে কষ্ট দিয়েছি, সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। মা, তোর ন্যায় অপরিচিতাকে বিনাপণে গ্রহণ কর্‌তে সম্মত হ'য়ে আমার পুত্রোপম 'দেশরঞ্জন' পত্রের সহকারী সম্পাদক হরিধন যে উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। কমলার মাতা নানাকার্য্যে ব্যস্ত আছেন। এতক্ষণে তিনি কমলার পিতাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—না হোক্ ঠাকুর! ঠিক সময়ে এসেছ। কন্যাদানের ফলটাও আমাকে নিতে দিলে না। এই লও তোমার অঙ্গুরী, জামাইকে দিও—আর জামাইকে বলে দিও—আমার জনম দুঃখিনী কমলাকে যেন তিনি ছায়া-রূপে রক্ষা করেন।

শচীন্দ্র তিন চারি দিন পূর্ব্বে আসিয়াছেন। তিনিই এখন কন্যাকর্ত্তা। তিনি নানাকাজে ঘুরিতেছেন। পিতার আগমনবার্ত্তা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া পিতাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! আপনি কখন্ এলেন? পিতা ক্রন্দনের স্বরে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন—শচীন্দ্র, বাবা! আজ কি শুভদিন। আমার ন্যায় মহাপাপীর অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে কোন দিন ভাবি নাই। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা-শূন্য হইল। শচীন্দ্রনাথ কাছে বসিয়া পিতার চোখে-মুখে জল দিতে ও বাতাস করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। তিনি শচীন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—বাবা শচীন্দ্র! আমি জীবনে কোনদিন তোমাকে কোনও অনুরোধ করি নাই। আজ আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর। প্রতিজ্ঞা কর, রক্ষা করিবে? শচীন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—তুমি কালই দেশে যাইয়া বিনাপণে তারানাথের কন্যাকে বিবাহ করিবে। আমি আর দেশে যাইয়া পিতৃ-ভিটা কলঙ্কিত করিব না। বৃন্দাবনে আমার এক কাকা থাকেন। আমি কালই সেখানে

চলিয়া যাইব। বাসনা—জীবনের শেষ দিন কয়টা যমুনা তীরেই অতিবাহিত করিব। শচীন্দ্রনাথ আর বেশীক্ষণ পিতার কাছে বসিতে পাইলেন না। তাঁহাকে কার্য্যান্তরে চলিযা যাইতে হইল। কমলা এখন পিতার শুশ্রূষা করিতেছেন।

শচীন্দ্রনাথ লোকজনের আহারেব যোগাড় করিতেছেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন—তাঁহার গঙ্গা দাদা পান চিবাইতে চিবাইতে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিতেছে। গঙ্গা-দাদাকে দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ পুলকস্বরে বলিয়া উঠিলেন—কি গঙ্গা দাদা—তুমিও ব্রাহ্ম হ'লে না কি?

পাগলের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব)

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, লিখিত।)

কতই ঘুরি, আর কতই দেখি। তব চিঁড়িয়া-খানা দেখে আর আশা মেটে না। তাই দিন-রাত ঘুরি আব কত কি নূতন নূতন কাণ্ড দেখি। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সমস্ত দিন আহারাদি নাই। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে পা আর চলে না। গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী পুষ্করিণীতে হাত মুখ ধুইয়া লইলাম। তাহার পর সেই পুষ্করিণীর তীরস্থিত একটা বৃক্ষের গোড়ায় আসিয়া বসিলাম। এ সংসাবে আমাব ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। কারণ আমার বলিতে কোন বস্তুই ছিল না। এমন কি আমার এই বীতস্পৃহ দেহটাও না; তত্রাপি নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া থাকিলেই সেই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম ভগবানের চিন্তাটা কেমন স্বতঃই মনে উদয় হয়। আজও তাহাই হইল। কিন্তু তাঁহাকে কিরূপ ভাবিব জানি না। না জানিলেও মন তাঁহাকে ভাবিতেও ছাড়ে না। সে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই সেই বিরাট শক্তিকে আকর্ষণ করিতে চায়; তাহার সসীম আয়তনের মধ্যে সেই অসীমকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া নিজ ইচ্ছামত ভাবে বসাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চলতা হেতু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার উপর ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণার তাড়নায় লোকে চাক্ষুষ দেবতা পিতার নামই ভুলিয়া যায়। আমি আর বসিতে পারিলাম না। পুষ্করিণীতে নামিয়া একপেট জল খাইলাম।

তাহার পর আহারান্বেষণে গ্রামের মধ্যে চলিলাম। গ্রামটি দেখিয়া বোধ হইল, ইহাতে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস আছে। কোথাও আহার জুটিলেও জুটিতে পারে। কিছুদূর যাইয়া শুনিলাম অনতিদূরে কোথায় বেশ মিঠে সুরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। প্রাণে বড় আনন্দ হইল। ভাবিলাম, উঁহারা নিশ্চয় সদাশয় ধার্ম্মিক লোক। যখন নামে রুচি আছে তখন জীবে দয়া নিশ্চয় করিবেন। বিশেষ আমার মত আশ্রয়-হীন অনাথ পাগলকে এক মুঠা অন্ন দিতে কাতর হইবেন না। উৎসাহে দ্রুতগতি চলিলাম। অবিলম্বে একটী বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, কতকগুলি ভদ্র সন্তান সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সহকারে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। সকলেরই চক্ষু নিমীলিত ও শরীর ভাব-গদগদ। দুইজন সুকণ্ঠ গায়ক মওড়া দিতেছেন, অপর সকলে দোয়ারকি করিতেছেন। শ্রীহরির নামের কি মহিমা। এ পাগলের প্রাণও কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষুধা রাক্ষসী আমার সে যোগ ভঙ্গ করিয়া দিল। অথচ কাহাকেও ডাকাডাকি করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না, কাজেই চুপ করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে নির্জ্জন কারাবাসের তুল্য কষ্টকর কার্য্য। করিই বা কি? এমন সময় একজন বৈঠকখানার বাহিরে আসিল। আমি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। সে আমারই একজন বাল্যবন্ধু। তাহাকে আমরা রমেশ বলিয়া ডাকিতাম। রমেশ বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া একবার ছাদের দিকে চাহিল আমি উপরে চাহিতেই দেখিলাম, একটী রমণী মূর্ত্তি সত্বর সরিয়া গেল। তখন রমেশ একটু বিরক্তির সহিত আমার দিকে চাহিল। আমি কথা কহিবার সঙ্গী পাইব ভাবিয়া ডাকিলাম,—"কি রমেশ চিনিতে পার?" বহুকাল পরে আজ প্রথম দেখা।" রমেশ যেন রাগতঃ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"বহু দিনের অদর্শনে প্রকৃতিস্থ লোকে বাল্যবন্ধুকে ভুলিলেও, পাগলা দেখিয়াই চিনিয়াছে।" রমেশ অতিশয় বিরক্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? আমায় জানিলে কিরূপে?"

আমি। পূর্ব্বে ছিলাম হরনাথ বাবু। এখন হইয়াছি 'পাগলা হর'। চিনিলে কি?

রমেশ। না। এখন আমাদের সাধনার সময়। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। অপেক্ষা কর। পরে পরিচয় লইব। এই

বলিয়া রমেশ আর একবার ছাদের দিকে চাহিল। কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া দ্রুত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সাধনায় যোগদান করিল।

মানুষের সঙ্গে কথা কহিবার আশা ছাড়িয়া মনের সঙ্গে কহিতে লাগিলাম। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! যে রমেশ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া সঙ্গদোষে প্রভূত পৈত্রিক সম্পত্তি উচ্ছৃঙ্খলতায় আহুতি দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল সেই রমেশ আজ সাধনার অমূল্য সময়টুকুও অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। যাহা হউক, শ্রীহরির কৃপায় রমেশের মতিগতি এই ভাবেই ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হউক!

এমন সময় জনৈক ভদ্র আকারধারী মাতাল টলিতে টলিতে আসিয়া জড়িত স্বরে বলিল,—"আঃ শালারা এখনও কপ্‌চাচ্চে।" তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল "কে বট হে! বিষ্ণুদূত? এই ক শালা হরি হরি করে জ্বালিয়ে মেরেছে। আর কেন মাণিক, শালাদের গোলোকে নিয়ে যাও,—নির্ব্বিবাদে বাটীতে বাস করে বাঁচি।"

এতক্ষণে আমি উপযুক্ত সঙ্গী পাইলাম। অপ্রকৃতিস্থ লোকের সহিত প্রকৃতিস্থ লোকের সদ্ভাব অসম্ভব। অপ্রকৃতিস্থে অপ্রকৃতিস্থে মিলন উভয়তঃ সুখকরী। তাহাই হইল। আমি বলিলাম,—"আমি বিষ্ণুদূতও নহি, যমদূতও নহি, রাজদূত নহি। কাজেই কাহাকেও স্থানান্তরিত করিবার অধিকার আমার নাই। আমি তোমারি মত পাগল।"

মাতাল। তবে এখানে কেন?

আমি। আমি ভবঘুরে। আমার এখান-সেখান বিচার নাই। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়েছি। তাই এইখানে একটু বসে বাবুদের সঙ্গীত শুনিতেছি। তা, তুমিও আমার কাছে বসিয়া গান শুন না কেন?

উঁহুঁ—তা পারবো না বাবা। বুঝতেই পেরেছ আমি দমখেয়েছি। তার উপর শালাদের সাধনার দুর্গন্ধে আমার অন্নপ্রাশনের ভাত শুদ্ধ উঠে আসবে। আর তুমি যা বলেছ তা বলেছ, আর বলো না। শুনলে শালারা তোমার হাড় গুঁড়া করে দেবে। শালাদের চোখে পড়ার পূর্ব্বেই চল সরে পড়ি।

আমি। অন্যায় কথা ত কিছুই বলি নাই। উহারা আমায় মারিবেন কেন? আর পলাইবার মত কুকর্ম্ম কি করিয়াছি? আমি নাচার পাগল, ক্ষুধার্ত্ত; ক্লান্ত। কেন উঁহারা আমায় তাড়াইবেন তুমি দেখিতেছি উঁহাদের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট।

মাতাল। বাবা, সাপুড়ে না হলে কি সাপের

ধর্ত্তে পারে ? আমি একটা বিচ্ছুবদমায়েস ছেলে তাই ওদের বুজরুকি ধরে ফেলেছি। যাগ্, মদের মুখে কি বল্‌তে কি বলিয়া ফেলিব। হে বাবা অজ্ঞাতকুলশীল, তোমায় প্রণাম হই। চলিলাম।

আমি। আহা, যেওনা যেওনা ; আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমার মত দোসর পেলে আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ কর্ত্তে পারি।

মাতাল। কেয়াবাৎ ! এই বসিলাম। তোমায় আমায় আজ থেকে দোস্তি হল। কি বলিতেছিলে ?

আমি। আমি এমন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, যদ্দ্বারা—

মাতাল। বহুৎ। এই নং ১—'সাধুদের' পরিবর্ত্তে একটা অশ্লীল কথা 'বাবুদের' উচ্চারণ করেছ। নং ২—এমন রসের সাধনাটাকে নেহাইৎ চল্‌তি ভাবা 'সঙ্গত' আখ্যা প্রদান করেছ। নং ৩—তুমি কিনা ছোটলোকের মত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছ। হয় 'সাধনা' ধ্বনি শুনিয়া উদর পূরণ কর, না হয় মার খাও। নং ৪—তুমি অসভ্য হইয়া সভ্যভব্য এই সাধুর আশ্রমের একপার্শ্বে শুইতে চাও।

আমি। এতগুলা অপরাধ আমি করিয়া ফেলিয়াছি ? কিন্তু এ সব যে অপরাধ তাহা বুঝিব কিরূপে ?

মাতাল। বাবা, স..্ ।া হলে কি আর সাধুত্ব বোঝা যায় ! এই মদ না খেলে যেমন সুরামাহাত্ম্য বোঝা কঠিন। যদি এসব তত্ত্ব বুঝিতে চাও তবে এখানে নহে। আইস, আমার গুপ্ত আড্ডায় বসিয়া সকল কথা কহিব। আর তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহারও কিছু প্রতিকার হইবে।

আমি। তাই চল।

আমি তাহার সহিত চলিলাম। কতকটা আহারের আশাতেও বটে আর কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও বটে। কিছুদূর যাইয়া সে একটা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটার সকল ঘরই ভগ্ন। তাহার মধ্যে যেটা অর্দ্ধভগ্ন সেইটার মধ্যেই তাহার আড্ডা। তথায় তখন আর কেহ ছিল না ; কেবল একটা আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে একটা চেটাই পাতিয়া আমায় বসিতে বলিল। বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, বিশেষ কোন আসবাব পত্র নাই। কেবল কয়েকটা ভাঁড় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের এক কোণে তিনটা ইষ্টক দ্বারা একটা উনানের মত করা আছে। অপর কোণে কয়েকটা মদের বোতল। উপরে

একটা দড়ির শিকল একটা পোড়া মাটির হাঁড়ি ঝুলিতেছে। সে সেই হাঁড়িটা নামাইয়া তাহার মধ্য হইতে কয়েকটুকরা পাঁউরুটি ও কয়েক খণ্ড মাংস বাহির করিয়া আমায় খাইতে অনুরোধ করিল।

আমি বলিলাম, "ও গুলা তোমার কাজে লাগিবে, রাখিয়া দাও।"

মাতাল। কি বাবা! সাধনার ধ্বনি শুনিয়াই কি সাধু বনে গেলে? তা পঞ্চ ম কারও সাধনা বিশেষ। কোন দোষ হবে না।

আমি। আমি ও সাধনায় বহুপূর্ব্বে সিদ্ধি-লাভ করেছি। কেঁচে গণ্ডুষ করিবার আবশ্যকতা নাই।

মাতাল। সাবাস্ বাবা! আজ থেকে তুমি আমার গুরুজি হলে। তবে আইস, প্রধান 'ম'কার যোগে এগুলা শোধন করিয়া লই।

আমি। ওটা শিষ্যের কাজ। গুরুজি কেবল চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ থাকিবে। মাঝে মাঝে এটা সেটার উপর দিব্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে এবং অপরের অগোচরে ইঙ্গিত করিয়া শিষ্যকে মনোভাব বুঝাইয়া দিবে। পরে যবনী-কার অন্তরালে নিজ অভিলিপ্সিত লীলা খেলায় পূর্ণাভিনয়েই স্বীয় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবে।

হাসিতে হাসিতে মাতাল একপাত্র সুরা-গলাধঃকরণ করিয়া মাংস ও রুটি চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "জিতারহ বাবা, গুরুগীরিতেও দেখ্ছি পক্কতাং। তবে আর আমার দোষ নাই। কিন্তু নজর দিও না।

আমি। সাধুরা 'নজর' দেয় না 'দিব্যদৃষ্টি' দান করে।

মাতাল। অর্থাৎ পরের দ্রব্য দেখিলেই 'চক্ষুদান' দিয়া থাকে।

আমি। কারণ পরকে আপনার করা সাধুর ধর্ম্ম।

মাতাল। চুপ। কে আস্‌ছে না? বস, আমি দেখে আসি।

আমার আনন্দও হইতেছিল। আনন্দ,— ঈশ্বরেব সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখিয়া; ভয়,—পাছে চোর বলিয়া ধরা পড়ি। পড়িলামইবা? ধরাতো পড়িয়াছি। জেল খাটারইবা কসুর কোথায়? তবে 'চোর' অপবাদটা প্রাণে সহ্য হবে না। চুরিও তো করিতেছি। ধর্ম্মের ঘরে চুরি, সত্যের ঘরে চুরি, ভারের ঘরে চুরি, এমন কি নিজের চোখে কাপড় বাঁধিয়া নিজের ঘরে চুরি করিতেছি। তবে এগুলায় দোষ নাই, কেন না, মানুষের চর্ম্ম চক্ষে ঠুলি দিয়া এসব চুরি হইয়া থাকে। সুতরাং আমি 'চোর' নহি আমি

'বাহাদুর'। মাতাল ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খবর" ?

মাতাল। ভয় নাই। উনি আমাদের পীতাম্বর বাবু।

আমি। তোমাদের পীতাম্বর বাবুকে তোমরাই চেন, আমি চিনিব কিরূপে।

মাতাল। উনি আমাদের গ্রামের মোড়ল। সকলেই উহাকে ভয় ভক্তি করে। উহারি বিধি নিষেধ মানিয়া গ্রামস্থ লোক অপরের নিমন্ত্রণ রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। কাহাকে এক ঘরে করিতে হইবে, কাহাকে জাতে তুলিতে হইবে, এ সকল মীমাংসা উহারি কাছে হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি কি দোষে কিরূপ শাস্তি পাইবে তাহার তালিকা উহার কাছে পাওয়া যাইবে। লোকটার লোকবল ও অর্থবল যথেষ্ট। সাত্ত্বিক ও ন্যায়বান্ বলিয়া নামডাক আছে। ধর্ম্মভীরুতার পরিচয়ও দিয়া থাকে। যে একবার উহার কোপ-চক্ষে পড়িবে তাহার আর নিস্তার নাই। প্রকাশ্যে বা নেপথ্যে তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। তবে এ অধম তাঁহার চিরকালই প্রিয়পাত্র।

আমি। কিরূপে হইলে ?

মাতাল।—তোষামোদ-মহামন্ত্র বলে। এ ছাড়া আমি উহার গুপ্তচর। অনেক গুপ্তক্রিয়া উনি আমার দ্বারা করাইয়া লয়েন। আর মালটা আসটা আনা নেওয়ার ভার আমারই উপর আছে। এ আড্ডাতেও মোড়ল মহাশয়ের পদধূলি পড়িয়া থাকে।

আমি। আজ কি তবে আমায় দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন ?

মাতাল। না। উনি দুলো বাগ্দীর বাটী যাইতেছিলেন।

আমি। কেন ? উহাকেও কি জাতে তুলিতে হইবে ?

মাতাল। উহাদের একঘরে করে কার বাপের ক্ষমতা। স্বয়ং মোড়ল মহাশয় দুলোর এক অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার গুণমুগ্ধ।

আমি। এই না হল মোড়ল! তা দুলো বাগ্দী মোড়ল মহাশয়ের এই অনুকম্পা লাভে বেশ সুখী ?

মাতাল। অসুখী হইয়াছিল বলিয়াই অনেক দিন তাহাকে এ জগত হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুলোর দুর্ভাগ্য। তার মেয়ে এখন ছোটলোক মহলে সম্রাজ্ঞী স্বরূপিণী। ছুঁড়ির দাপটে সকলেই সন্ত্রস্ত, নচেৎ কোনদিন কাহার নেপথ্যে কি হইয়া যাইবে কে বলিতে পারে! তবে এসব ব্যাপার সমাজে অপ্রকাশ। উঁহার বিশেষ অনুগত ভক্তবৃন্দ ছাড়া অন্য কেহ

জানে না।

আমি। সব বুঝিয়াছি। এখন যাহা বলিতে আসিলে তাহাই বল।

মাতাল। নেশাটা ফিকে হয়ে এসেছে। আর একপাত্র টানিয়া লই। চোখের ও মনের ময়লা একেবারে পরিস্কার হয়ে যাবে। তবে তো, বাবা, তত্ত্ব আলোচনা চল্‌বে ভাল।

আমি। ঠিক। হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া প্রাণটাকে অমন করিয়া অকপট সরল ও তরল করিতে সুরার মত আর কেহই পারে না।

মাতাল।—দেখ ঐ যে বয়াশালা আছে, ও শালার তিনকুলে কেউ নাই। শুনিয়াছি, শালা সব খুয়িয়ে শেষে অনুপায় হয়ে কণ্ঠি নিয়েছে। সকল পথ বন্ধ হওয়ায় শেষে এদের দলে এসে মিশেছে। বাইরে ধর্ম্ম ভাবটা বেশ কেতাদোরস্ত ভাবেই বজায় রাখে। আর শালার কণ্ঠও শ্রুতিমধুর, সঙ্গীতেও একটু দখল আছে, দেখতেও সুশ্রী; এই সকল কারণে আসর বেশ জমাতে পারে। শালা আজ দুই তিন মাস এই খানেই আস্তানা নিয়েছে। নড়বার নামটি করে না। কারণ; অন্যান্য দলে পুরাণ কাপ্তেনরা সব না থাকায় কিছু লেজুড় দাঁড়িয়েছে, এখন এই সব দলে সামান্য পসার জমাতে পার্‌লেই—ষোল আনা সুবিধা ও সুখ্যাতির সম্ভাবনা। এ সময়ে চালাক ছেলে মাত্রেই ঝাঁ করে এই সব দল ভারি করে আর একটা একটা জঙ্গের ভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ও শালাও বেশ পসার করেছে! নানা স্থান হতে ডাক আসে, ভোগ মারেন আর খোদার খাসির মত কাঁদে বাড়্‌ছেন। শালারা কি এতেই সন্তুষ্ট! আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে দখল করে বসে আছেন। আমি যাতে বাড়িতে ঢুকিতে না পাই, শালারা, তার বিধিমতে চেষ্টা করে থাকে। আমি মহাপাপী, আর শালারা ধার্ম্মিক প্রবর, কাজেই এই সাধুর আশ্রমে যাহাতে মহাপাপী প্রবেশ করিতে না পায়, অর্থাৎ, যাহাতে নির্ব্বিরোধে রাসলীলা, সুসম্পন্ন হয়,—সে কারণ আমাকে ছলেবলে কৌশলে এক রকম গৃহহীন করেছে। অন্য কোন অতিথী অভ্যাগতেরও এ আশ্রমে বাস নিষেধ। পাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গে। সুতরাং তোমার আশ্রয় লাভের আশা একেবারেই নাই। তাহার পর জীবে দয়া শালাদের যথেষ্ট। উঁহাদের রসনার তৃপ্তি করা স্বালক্ষ্মীরও অসাধ্য। বিশেষ পরের দ্রব্য পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আগুবাড়া, তা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ যা ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই হউক। কিন্তু নিজেদের এমন সংস্থান নাই বা অভিরুচি নাই যে স্বীয় তহবিল হতে এক কপর্দ্দকও বাজে খরচ করেনএ

সে সব গোপিনী আর শ্রীরাধার চরণে অর্পণ করে বসে আছেন।

আমি।—তাহা হইলে তোমার আর সংসারে থাকাই উচিত নহে।

মাতাল।—যাইব কোথা? বিশেষ আমার যখন সুকণ্ঠ নাই, সুঠাম চেহারা নাই, বা সবার সেরা এ যুগসম্রাট অর্থও নাই। আমায় দলে নেবে কে?

আমি।—তাহা হইলে, তখন ছাদে যে রমণী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তিনিই তৃতীয় পক্ষের শ্রীমতী। সময় বুঝিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু এ মহাপাপীকে দেখিয়া অসুবিধা বোধে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। কাজে কাজেই রমেশ আমার উপর বিরক্ত না হইবেই বা কেন?—তা তোমার দোষেই তোমার স্ত্রীর অধঃপতন ঘটেছে।

মাতাল।—তা বেশ বুঝি। কিন্তু সাধু বাবাদের আনন্দবেও তো দোললীলা পূর্ণ জোয়ারে বয়ে যাচ্ছে। সেটা কি 'প্রেম' বলে বুঝতে হবে?

আমি।—হা ভগবন্। তুমি কখন, কি ভাবে যে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছ তা তুমিই জান। আর আমি বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। ক্ষুধায় আমাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। অন্যত্র চেষ্টা দেখি।

মাতাল।—তা হবে না বাবা! দোস্ত থেকে গুরুজি করেছি। ছেড়ে দেব না। সঙ্গে নিতে হবে।

আমি।—পাগলের সঙ্গে পাগল হয়ে থাকতে পারবে?

মাতাল।—পরীক্ষা দেব।

আমি।—ভাল। কিন্তু মনে রেখ, তুমিও আলাহিদা আমিও আলাহিদা। কেবল পাশাপাশি থাকবো আর খোসগল্পে দিন কাটাব।

মাতাল। খুব রাজি।

ইন্দ্র রঘুর যুদ্ধ।

(শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে সেন।)

ইক্ষাকুর কুল-স্রোত যে এখন,
বহিবে অবাধে—তা'র যা' কারণ,
পতির মনের যা' চির কামনা,
তাহা যে পুরিবে— করে যা' সূচনা;
সখীদের যাহা চখের আঁধার
নাশিতে আহ্বান করিছে জ্যোৎস্নার,

"ইন্দ্র রঘুর যুদ্ধ" কালিদাস-কৃত রঘুবংশ কাব্যের তৃতীয় সর্গ দর্শনে রচিত।

স্বদক্ষিণা হেন গর্ভের লক্ষণ,
ক্রমেতে করিতে লাগিল ধারণ। ১
অবসন্নতাব শরীরে এসেছে,
ভূষণ কেবল কয়েক রয়েছে ;
পাণ্ডুর বরণ বদনে ধারিণী,
যেন সে শোভিছে উষার রজনী ;
হেথা সেথা তারা যা' আছে দু'চার.
শশী আছে প্রভা গিয়াছে তাহার। ২
করেন সম্রাজ্ঞী মৃত্তিকা ভক্ষণ ;
তাহাতে সুরভি, তাঁহার বদন,
সম্রাট্ আঘ্রাণ করিয়া বিজনে,
পরিতৃপ্তি আর নাহি পান মনে ;
যথা গ্রীষ্ম শেষে বনস্থলী দেশে,
প্রথম পয়োদ যে বারি বরষে,
তাহাতে সঞ্জাত সোঁদা গন্ধময়,
করী করি' ঘ্রাণ স্বল্প জলাশয়। ৩
দিগন্তে দিগন্তে পৌঁছিবে স্যন্দন,
তবেত বিশ্রান্ত হইয়া নন্দন
আরামে আমার, ভুঞ্জিবে ভূলোক,
মহেন্দ্র যেমন ভুঞ্জেন দ্যুলোক ;
করিয়া প্রবল এ হেন মননে,
মধুরাম্ল আদি রসের বর্জ্জনে,
প্রথম হইতে তা'রি আস্বাদন,
স্বদক্ষিণা যেন করেন গ্রহণ। ৪

ইচ্ছা কিসে তাঁর, তাহাত আমারে,
কহিতে না চান সরমের ভরে ;
মাগধী যে কি কি মাগেন জান কি,
প্রিয়ার যাহারা সখী তাদে ডাকি,
কোশল অধীশ অশেষ আদরে,
শুধান দু'বেলা আসি অন্তঃপুরে। ৫
অরোচক ক্লেশে রুচি যাহে আসে,
স্ফুটিতেই রাণী তা' জুটিত পাশে ;
সিদ্ধ শরাসনে গুণ আরোপণে,
স্বর্গের সামগ্রী যদি আহরণে,
ভূনাথ তাঁহার নাথের মনন
হইল, হইত তাহারো যোজন। ৬
ক্রমে অতিক্রম করিয়া সে ক্লেশ,
লাবণ্যের ছটা ধরিল বিশেষ ;
জীর্ণ পর্ণগত, নবীন সঞ্জাত,
হেন যোগাযোগে ব্রততী যেমত। ৭
দিন যত গত হইয়া আসিল,
পয়োধর দ্বয় পূরিতে লাগিল ;
নীলাভ চূচুকে শোভিয়া তখন,
আরম্ভিল তা'রা করিতে গঞ্জন,

৪। স্যন্দন—রথ। দ্যুলোক—স্বর্গ।
৭। ব্রততী—লতা।

সুপুষ্ট কমল কলির যুগল,
অলির সংযোগে শিখরে শ্যামল। ৮
ধরণী ধরে যে উদরে রতন;
শমী যে শরীরে রক্ষে হুতাসন;
সরস্বতী নদী যথা গতি করে,
তথায় বালুকা স্তরের অন্তরে,
বহে যে সলিল প্রবাহ পাবন;
এ সবে সংশয় না রয় যেমন,
রাণী যে জঠরে সেরূপ কুমার,
পালিছে, প্রত্যয় উপজে রাজার। ৯
তখন প্রিয়ায় প্রণয় যেমন
যেমন উদার হৃদয় আপন,
যেমন স্বভুজে অর্জ্জিত বিভব,
যেইরূপ পুনঃ হর্ষের উদ্ভব,
সমারোহ নৃপ করি' সে তেমন,
পুংসবন-আদি করেন সাধন। ১০

ইন্দ্রাদির অংশে গর্ভ গুরুভার;
করেন কত যে প্রযত্ন স্বীকার,
সম্ভ্রমে মহিষী ত্যজিতে আসন,
ভবনে ভূপতি আগত যখন;
অভ্যর্থনা তরে করে করে করে,
কিন্তু ক্লান্ত তা'রা কাঁপে থর থরে;
তরল নয়নে কি চারু চাহন,
ইথে নাথ কি যে আনন্দে মগন। ১১
বিশ্বাস ভাজন বৈদ্য যে সকল,
বাল-তন্ত্রে জ্ঞাত বিশেষ কুশল,
সে সবা নিয়োগে পুষ্টি অনুষ্ঠান,
যে মাসেতে যাহা হয় সমাধান;
এ দিকে কালেরো পূরণ হইল,
প্রীত চিত পতি নিরখি বুঝিল,
প্রিয়ায় প্রসবে উন্মুখী কেমন,
নভস্থলী যথা গ্রীষ্মান্তে স-ঘন। ১২
মন্ত্রণা প্রভাব উৎসাহে অম্বিত,
রাজশক্তি যথা বিভব প্রভূত,
পুলোমজা তুল্য প্রসবে কুমার;
সৌভাগ্য সম্পদ্ সূচিল যাহার,

৮। চুচুক—স্তনাগ্রভাগ।

৯। শমী-গর্ভ হইতে অগ্নির জন্ম হয়। শমীখণ্ড ঘর্ষণ করিয়া অথর্ব্ব ঋষি সর্ব্ব প্রথমে অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাণের বর্ণনা মতে সরস্বতী নদী অন্তঃসলিলা।

১০। পুংসবন সংস্কার দ্বারা পুত্র সন্তান প্রসূত হয়। উহা তৃতীয় মাসে কর্ত্তব্য। চতুর্থ মাসে অনবলোভন, পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত, ষষ্ঠ মাসে সীমন্তোন্নয়ন, পরে সাধ ভক্ষণ আরম্ভ। এই সকল গর্ভিণি-সংস্কার।

১২। স-ঘন—মেঘযুক্ত। এই স্ত্রীলিঙ্গ নভস্থলী শব্দ উপমার অনুরোধে কল্পিত হইল।

তুঙ্গ রাশি আসি' সুদীপ্ত উদয়,
গ্রহেরা সদলে বর্জ্জি' চতুষ্টয়। ১৩

দিক দশ কিবা প্রসন্ন হইল,
বায়ু ঝুরু ঝুরু বহিতে লাগিল ;
দক্ষিণে লম্বিত করিয়া শিখায়,
লইছে অনল হবির আদায় ;
লোক-হিতে জনু তাদৃশ জনার,
শুভ তাই আজি সবারি আচার। ১৪

সুপুষ্ট বালক ভূমিষ্ঠ যেমন,
ভূমিষ্ঠ শরীর জ্যোতিতে আপন,
অরিষ্ট-শয়ন করে বিভাসিত,
তখন সময় যদিও নিশীথ,
সহসা আলোকে প্রভার বিলোপ,
চিত্রে যেন দীপ গুলির আরোপ। ১৫

'মহারাজ! জাত হয়েছে কুমার'.
অন্তঃপুর চর গোচর তাঁহার,
কৈলে ছত্র আর চামর যুগলে
মাত্রে রাখি, বেশ ভূষণ সকলে,
ভূপতি অবাধে করিয়া মোচন,
সংবাদ বাহকে করেন অর্পণ। ১৬

নিবাতে-নিষ্কম্প-নলিন-নয়নে.
নিরখি সুন্দর নন্দন-বদনে,
আনন্দ নৃপের দেহে না ধরিল,
কলেবর তাঁর যদিও বিপুল ;
ইন্দু দরশনে উদ্ভূত উজান,
মহোদধি দেহে হয় কি কুলান! ১৭

তপোবন হ'তে তদা তপোধন,
পুরোহিত কিবা শুভাগত হ'ন ;
জাতকর্ম্ম বিধি শাস্ত্রীয় যাবৎ,
অবিলম্বে ঋষি সাধি' যথাবৎ,
তেজোধিক করে দিলীপ-কুমারে,
সংস্কারে খনিজ মনির আকারে। ১৮

মধুব সু-স্বন মঙ্গল বাদন,
নর্ত্তকী গণের প্রমোদ নর্ত্তন,

১৩। পুলোমজা—ইন্দ্রাণী। রাজ্ঞী সুদক্ষিণা পুলোমজা সদৃশা। রঘুর জন্মকালে নবগ্রহের মধ্যে পাঁচটী গ্রহ শুভফল দাতা ও বলবান্ ছিল। এরূপ প্রায় হয় না।

১৪। অনল—অগ্নি। জনু—জন্ম।

১৫। অরিষ্ট—সূতিকাগার।

জাত বালকের দেহ-জ্যোতিতে আলোকগুলি মলিন বোধ হইতে লাগিল।

১৭। সমুদ্র ও চন্দ্রে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়, অর্থাৎ জোয়ার জন্মে। উহা নদ-নদী দিয়া স্থলভাগেও প্রবেশ করে।

১৮। বশিষ্ঠদেব যোগবলে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া বালক জাত হইতেই রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। জাতকর্ম্ম বিধি নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে, অপরের স্পর্শের পূর্ব্বে, এবং স্তন্য দানের পূর্ব্বে করণীয়। বাঙ্গালা প্রদেশে সেরূপ হইতেছে না।

শুধুনা প্রকাশ রাজেন্দ্র-সদনে,
গগনে দেবতা-ভবনে-ভবনে। ১৯
সুত জন্ম-জাত হরষের ভরে,
মোচন করিবে বন্দী কারাগারে ;
কিন্তু শূন্য তাহা হেরে সে পালক ;
তবে, এতদিনে জন্মিতে বালক,
পিতৃঋণ নামে পুরাণ বন্ধন
হ'তে, করে স্বীয় উদ্ধার সাধন। ২০
শিক্ষা-কালে শিশু যা'বে শাস্ত্র-পারে,
শত্রু-পারে পুনঃ, পশিয়া সমরে ;
গমনার্থ ধাতু এ হেতু স্মরণ,
"লঘি" হ'তে রঘু—এনাম করণ। ২১
সম্পদে অতুল পিতার যতন,
অঙ্গ উপাঙ্গের তাবত গঠন,
কিবা দিন দিন পুরায় শিশুর,
রশ্মিরাশি-রূপ সম্পদ্ ভানুর,
অনুপ্রবেশন করিয়া যেরূপ,
পুষ্ট করে নব শশীর স্বরূপ। ২২
ষড়াননে যথা উমা-মহেশ্বর,
জয়ন্তে যেমতি শচী-পুরন্দর ;

সেরূপ কুমারে সেরূপ দম্পতি,
লভিয়া সানন্দ-অন্তর তেমতি। ২৩
চক্রবাক চক্র-বাকীর তুলায়,
সুখী এ ওনার যে প্রেমে দোঁহায় ;
এবে যে সে প্রেমে বিভাগ ঘটিল,
অংশে উভয়েরি সুতে উপজিল ;
হেন ভাব কিন্তু হেরি পরস্পর,
পরস্পরে প্রীতি হয় দৃঢ়তর ! ২৪
ধাত্রী মুখে শুনি, কথা উচ্চারণে,
অঙ্গুলি তাহারি ধরিয়া চলনে,
প্রণিপাত শিখি. করিয়া বন্দন,
শিশু করে হর্ষ পিতার বর্দ্ধন। ২৫
বক্ষে পুত্রধন করিয়া ধারণ,
অঙ্গে লভে ভূপ অমিয়-সিঞ্চন ;
উপান্তে নয়ন মুদিয়া আসিছে,
এ ভাবে কতই ক্ষণ যে থাকিছে।' ২৬
আনন্দে এ চিন্তা আসিছে তখন,
এই যে সাম্রাজ্য হয়েছে গঠন,
গুণাধিক যুত আত্মজ ইহার,
চলিবে, কুলেরো পালন ব্যাপার ;
সৃজি' প্রজালোক যথা প্রজাপতি,
হইতে পারিল হরষিত-মতি,
মূর্ত্তিভেদে তাঁর সত্বগুণময়,
শ্রীহরির যবে আবির্ভাব হ'য়। ২৭

১৯। জাত বালক সুক্রিয়া দ্বারা দেবপ্রিয় হইবেন, তাহাই সূচিত হইল।

২১। লওর ইহাদের প্রভেদ অতি সামান্য। ইহারা প্রায়ই পরস্পরের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় বয়সে ধরিয়া চূড়ায়,
পঞ্চমে, বর্দ্ধিত চঞ্চল শিখায়,
সমান-বয়স সচিব-বালকে
অন্বিত কুমার অ আ ক খ শিখে;
সেই সে মাতৃকা-সরিত সহায়ে-
পৌঁছিল বাঙ্ময় সাগরে আসিয়ে। ২৮

হ'য়ে উপনীত উচিত বিধানে,
সুবিদ্বান্ গুরু-গণ সন্নিধানে,
প্রীত করি তাঁদে প্রখর মেধায়,
যা' শুনে তাহারি লয় সে আদায়;
আধার নির্ম্মল বিরাজে যথায়,
শিক্ষার সুরাগ সুন্দর তথায়। ২৯

শুশ্রূষা-শ্রবণ-গ্রহণ চিন্তায়,
বেদ-তর্ক দণ্ড বার্ত্তা এ সবায়,
যদিও সাগর সমান সে চার,
ক্রমে ক্রমে রঘু হ'তেছেন পার;
নীলাভ তুরঙ্গ যোজনে যেমন,
গমনে যাহার পরাস্ত পবন,
অর্ণব সদৃশ দিক চতুষ্টয়,
অতিক্রম করে দেব রশ্মিময়। ৩০

ব্রহ্মচারি ভাব তখনো রক্ষণ,
রুরুচর্ম্ম বাস পবিত্র বহন,
আগ্নেয়াদি অস্ত্র পিতারি সকাশ
হইতে সমন্ত্র হ'তেছে অভ্যাস;
শুধুনা ধরার এক অধীশ্বর,
সে গুরু ধরায় এক ধনুর্ধর। ৩১

বৎসতর যথা মহোক্ষে দাঁড়ায়,
করভ করীন্দ্র ভাবে পঁহুছায়,
শৈশব হইতে ফুটিছে যৌবন,
গাম্ভীর্য্য রঘুর আসিছে কমন। ৩২

তখন কেশান্ত সংস্কার সাধনে,
দিলীপ গৃহস্থ করেন সন্তানে:
রাজকন্যাগণ লভি সে সুপতি,
চন্দ্রে দক্ষ-সুতা সম প্রীতমতি। ৩৩

২৮। তৃতীয় বৎসর চূড়াকরণের কাল। মাতৃকা—বর্ণমালা।

৩০। দণ্ড—দণ্ডনীতি শাস্ত্র। বার্ত্তা—কৃষি ও পশু রক্ষণাদি বিষয়ক শাস্ত্র। রশ্মিময় দেব—সূর্য্য। সূর্য্য সাধারণ দৃষ্টিতে দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও দর্শক দেহ মধ্যে বায়ু গ্রহণ ও স্তম্ভন করিয়া স্থির চিত্তে দর্শন পরায়ণ হইলে তখন সেই সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাকৃত সহজ দৃশ্য ও নীল জ্যোতিতে পূর্ণ বোধ হয়। সূর্য্যের সেই নীল জ্যোতিই তাঁহার রথের নীলবর্ণ বা হরিবর্ণ অশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

৩১। রুরু—কৃষ্ণসার মৃগ। যজ্ঞে নিহত কৃষ্ণসার মৃগের পবিত্র চর্ম্মই ব্রহ্মচারীদিগের অনুত্তম পরিধেয়। সাধারণ বিদ্যাগুলির সমাপ্তির পর বিবাহের পূর্ব্বেই ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ক্ষত্রিয় যুবকের কর্ত্তব্য।

৩২। পঞ্চ শিখ (পাঁচ চূড়া) থাকিয়া পাঠ্যাবস্থা অতীত হইলে, তখন কেশান্ত সংস্কার।

যুবা, যুগসম ভুজের প্রসার,
কপাট-সমান বক্ষের বিস্তার,
গ্রীবাদেশ দৃঢ় শরীর মাংসল,
রঘু দেহ-গুণে গুরুরে জিনিল ;
কিন্তু যে কেমন নম্রতা ধরিছে,
তিনিই অল্পক সকলে বুঝিছে । ৩৪
স্বভাবে সংস্কারে সুশীল সে সুতে,
যুবরাজ করি' নিজ কর হ'তে,
বহুকাল ধৃত, নৃপতি, প্রজার,
লঘু করে গুরু পালনের ভার । ৩৫
গুণাভিলাষিণী শ্রী তখন আসে,
মূলরাজ হ'তে যুবরাজ পাশে .
ধীরে পরিহার করি পুরাতন,
সে পদে নূতন কমলে যেমন । ৩৬
অনিল-সহায়ে অনল যেমতি,
ভানু লভি যথা শরতে সারথি,
মদোদয় যোগে মাতঙ্গ যেমন,
রঘু সনে মিলি' দিলীপ তেমন ;
অশক্য সহন যদি একেশ্বর,
অধুনা দুঃসহ সমধিক তর । ৩৭
রাজসুত গণে সেবিত তাঁহায়,
ধনুর্ধারী হোম-হয়ের রক্ষায়,
রাখি' পিতা ক্রতু একে হীন শত,
শতক্রতুসম সাধে যম্নোহিত । ৩৮
পরবারে যবে যজ্ঞের কারণ,
পুনঃ নরপতি করেন মোচন,
ধনুর্ধর রক্ষি গণের সমক্ষে,
অশ্বে সহস্রাক্ষ হরেন অলক্ষ্যে । ৩৯
তখন বিস্মিত রঘু-দলবল,
বুদ্ধি হারাইয়া যেমন নিশ্চল,
অমনি বশিষ্ঠ ধেনু সে নন্দিনী,
সুবিদিত যা'র মাহাত্ম্য কাহিনী,
চরিতে চরিতে আপন ইচ্ছায়,
দেখা দিল ঠিক আসিয়া তথায় । ৪০
পবিত্র তাহার শরীরজ নীরে,
রঘু আঁখি-যুগ প্রমার্জ্জন করে ,
তাহাতে ইন্দ্রিয় অতীত বিষয়,
দর্শনে শকতি তাঁর উপজয় । ৪১
পূর্ব্বে পর্ব্বতের পক্ষের ছেদক
দেবেশে, হেরে সে নৃদেব-বালক,
রথ-রশ্মি যোগে বন্ধনে রাখিয়া,
চলেছে অশ্বেরে হরণ করিয়া ;

৩৪। অল্পক – অল্প বয়স্ক।

৪১। নন্দিনীর মূত্র জলে নয়ন বিধৌত ক'রতে রঘুর দিব্য দৃষ্টির আবির্ভাব হইল।

পশু সে যেমন হ'তেছে চপল,
সারথি অধিক হ'তেছে প্রবল। ৪২

অসংখ্য নিমেষ বিহীন নয়ন
নিরখি হরিত পুনঃ অশ্বগণ,
চোরে ইন্দ্র বলি' তখনি বুঝিয়া,
গগন পীরশী গম্ভীর তুলিয়া,
কণ্ঠস্বরে, যেন ফিরাইয়া তাঁয়,
নিঃশঙ্কায় রঘু বচন শুনায়। ৪৩

ওহে দেবরাজ! সকল বিদ্বান,
যজ্ঞভাগ-ভোজী গণের প্রধান
বলিয়া গণনা করেন যাঁহার,
সেই সে তোমারি এ হেন ব্যাপার?
তোমাদেরি তোষ দিবার কারণ,
অজস্র যাঁহার যজ্ঞ আয়োজন,
সেই সে আমার পিতারি ক্রিয়ার,
ব্যাঘাত বাধাতে বাসনা তোমার! ৪৪

ওহে! ত্রিলোকের তুমি নিয়ামক,
অসুর যাহারা যজ্ঞ বিঘাতক,
দিব্যচক্ষু যোগে তুমি তাহাদের,
মতি বুঝি' সাধ উপায় বধের;
সে তুমি আপনি হ'লে অন্তরায়,
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠাতা গণের ক্রিয়ায়,
ধরম করম কে আর করিবে।
শাস্ত্র-বিধি সব বিলোপ পাইবে। ৪৫

তাই বলি রাখ আমার বচন,
যজ্ঞ যে বিপুল হইবে সাধন,
ও তুরঙ্গ অঙ্গ তাহার প্রধান,
কর ওর প্রতি মোচন বিধান;
মহাত্মারা পথ ভালই দেখান,
মলিনে চরণ কভুনা লাগান। ৪৬

রঘুমুখে হেন প্রগল্‌ভতা ময়
বাণী স্বর্গপতি শুনি' সবিস্ময়,
রথের বেগেতে বিরাম থুইল,
এ হেন বচনে উত্তর ধরিল। ৪৭

যা' তুমি বলিলে ক্ষত্রিয় কুমার!
বুঝিনু স্বরূপ সকলি তাহার,

৪২। বর্ণিত আছে যে পর্ব্বতেরা অগ্রে পক্ষবান ছিল, ও তাহারা উড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিত। তাহারা যে স্থানে অবতীর্ণ হইত, তথায় তাহাদের বিপুল দেহে অসংখ্য প্রাণী নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত। সেই হেতু ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাদের পক্ষ ছেদন করিয়াছেন।

ইন্দ্রকে পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাচ্যামিন্দ্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে দ্রব্য দানের বিধি আছে। একদা অসুরগণ কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে, তিনি পূর্ব্বদিকে আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেও তিনি পূর্ব্বদিকের বিশেষ অধিপতি রহিয়া গেলেন। তিনি বৃষ্টি দাতা। পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু ও মেঘ আসিতে থাকিলেই বারি-বর্ষণ দীর্ঘ স্থায়ী হয়।

৪৩। ইন্দ্র সহস্র-লোচন। এই বিশেষণ হেতু রঘু তাঁহাকে দূর হইতে সহজে চিনিতে পারিলেন। দেবতাদিগের চক্ষে পক্ষ পাত হয় না।

মেঘ-বাহন ইন্দ্রের অশ্ব ও হরিদ্বর্ণ

যশঃ কিন্তু যাঁরা বিষয় ভাবেন,
শত্রু হ'তে ত্রাণ তাহারি করেন,
ত্রিলোকে-প্রকাশ সে যশে আমার,
যাগে যে নাশে হে, জনক তোমার। ৪৮

পুরুষ উত্তম বলি' হরি খ্যাত;
মহেশ্বর বলি' ত্রিপুরারি জ্ঞাত;
শতক্রতু বলি, তথা শুধু আমি:
মোদের এ নাম না দ্বিতীয়-গামী। ৪৯

এই শততম অশ্ব সে কারণ,
পিতার তোমার করিনু হরণ,
কপিল প্রতিম আমায় বুঝিয়া,
যাও ইথে তব প্রয়াস ছাড়িয়া।
সগর সুতের সরণী স'রোনা,
তাহাতে চরণ থুওনা থুওনা। ৫০

তখন তুরঙ্গ রক্ষক হাসিয়া,
মনের কোণেও কিছু না ডরিয়া,
বলিতে লাগিল পুরন্দরে পুনঃ,
যখন তোমার অশ্ব-অমোচন,
নিশ্চয় বলিয়া হইল মনন,
তখন শস্ত্রের করহ গ্রহণ,
আগেতে রঘুরে সমরে জিনিবে,
কৃতী বলি' পরে আপনে গণিবে। ৫১

ইন্দ্রে হেন কথা যেমন বলিল,
রঘু ঊর্দ্ধ মুখে অমনি বসিল;
পিছে বাম জানু, সম্মুখে অপর,
শরাসন খানি করিছে স-শর;
সে ভাবে সে দেহে সে কি রঘু?—নাকি
ত্রিপুর নাশিতে আসীন পিণাকী! ৫২

হিরণ্ময় বাণ [illegible]যু যা হানিল,
হৃদয়ে মহেন্দ্রে ক্ষত উৎপাদিল,
অমনি তাহাতে রোষেরো উদ্ভব,
অমোঘ শায়ক সন্ধানে বাসব,
সেই সে তাঁহার সুচারু ধনুকে,
পলকে নবীন মেঘে যা' ঝলকে। ৫৩

দিলীপ সুতের বক্ষের প্রসারে,
পশি' শর সেই কুতুহল-ভরে,
নর-শোণিতের আস্বাদ কিরূপ,
প্রথম বুঝিছে তাহার স্বরূপ।
কেন না অসুর যারা পাপাশয়,
তা'দেরি রুধিরে তা'র পরিচয়। ৫৪

কুমার বিক্রম তখন কুমার,
স্বনাম-খোদিত শায়ক আবার,

৪৮। স্বরূপ (স্ব-রূপ) — প্রকৃত অবস্থা।

৫০। গৌরবান্বিত পক্ষের সহিত যুদ্ধারম্ভে সম্রাট বংশীয়গণ সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণময় বাণ ব্যবহার করিতেন অন্যত্র সুবর্ণ পুঙ্খ যুক্ত বাণ ব্যবহৃত হইত।

করিল প্রোথিত সুরপতি ভুজে,
শচী-অঙ্গরাগ মুদ্রাঙ্ক যে রাজে,
যদিও কর্কশ করশাখা গণ,
সুর-করিবর করিয়া তাড়ন। ৫৫

শিখিপক্ষ শোভী শরাস্ত্র ছাড়ে,
শক্রের অশনি ধ্বজায় উপাড়ে,
বলে আকর্ষিয়া সুরশ্রীর যেন,
করিলেন রঘু কেশের ছেদন ;
তাহাতে বিষম ক্রোধের উদয়,
নরেন্দ্র সন্তানে দেবেন্দ্রের হয়। ৫৬

জিনিবারে আশ উভয়ে বিপুল,
সংগ্রাম তখন বাধিল তুমুল ;
ঊর্দ্ধমুখে বাণ উঠে শন্ শন,
অধোমুখে বাণ ছুটে চন্ চন্,
পক্ষযুত যেন ভীম আশীবিষে,
ধাযাধায়ি করে মেদিনী-আকাশে,
পাশে দাঁড়াইয়া দেখে কুতুহলে
হেথা সিদ্ধ, সেথা সৈনিকের দলে। ৫৭

অস্ত্রবৃষ্টি ইন্দ্র প্রবাহে ঢালিছে,
নিবাইতে নাহি তথাপি পারিছে,
দুর্নিবার তেজ-রাশির আধার,
ভুজপ্রসহ সেই রাজেন্দ্র কুমার,

স্বদেহ হইতে বিচ্যুত অনলে,
পারে কি জলদ প্রশমিতে জলে ? ৫৮

যথা সে প্রবাহ হতেছে প্রবৃত্ত,
তথা রঘু তা'য় করিতে নিবৃত্ত,
বিপুল ধনুর অতুল শিঞ্জিনী,
মন্থনে অব্ধির যৈবা ধীর ধ্বনি,
করিছে কাশ্মীর রঞ্জিত হরির
প্রকোষ্ঠ প্রদেশে, তাহা এক তীর,
ফলা যা'র শশি-কলার আকার,
করিযা মোচন করে ছার খার ! ৫৯

ইথে বৈর ভাব অসীম বাড়িল,
নাশিবারে সেই বিপক্ষে প্রবল,
চাপ শচীপতি করি পরিহার,
ধরে তথাবত মণ্ডল-আকার,
অস্ত্র, যা' ভাতিছে স্ফুরিত প্রভায়,
নগ-পক্ষচ্ছেদ হইত যাহায়। ৬০

হৃদয়ে তাহার প্রচণ্ড তাড়নে,
সৈনিকগণের অশ্রুধারা সনে,
রঘু ধরাতলে হয় নিপতিত,
নিমেষে পুনঃ সে ব্যথা পরাভূত

৫৫। করশাখা—অঙ্গুলি। সুর-করিবর—ঐরাবত।
৫৭। আশীবিষ—সর্প।
৫৮। স্বদেহ-বিচ্যুত অনল—বজ্রাগ্নি।
৫৯। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা। অব্ধি—সমুদ্র। কাশ্মীর—কুঙ্কুম। হরি—ইন্দ্র। প্রকোষ্ঠ—করতল ও কফোনীর মধ্যগত বাহু-ভাগ।

কবি, সেনাদের সহর্ষ গর্জ্জন
সহ, সমুত্থিত হ'তেছে কেমন। ৬১
বজ্রপাত সম—হেন অতিশয়,
বীর্য্য হেরি' তুষ্ট নৃপসুতে হয
দেবেন্দ্র. যদিও সংগ্রাম ব্যাপারে.
শত্রুভাব বধু সম্যক আচরে :
মহাগুণ, তা'র উচিত আদর
সর্ব্বস্থানে লাভ করে কি সুন্দর। ৬২
ওহে বীরবর। এই যে আমার
অস্ত্র বলীয়ান, আঘাত ইহার.
শৈলগণ কভু না পারে সহিতে,
তুমিত সহজে পারিলে জিনিতে ;
জানিও হইনু আমি এ কারণ,
তব প্রতি অতি প্রীতিযুত মন ,
তুরঙ্গ ব্যতীত যা' চাহিবে দিব,
ফুটিয়া তখন বলিছে বাসব। ৬৩
বাণ এক তদা তূণীর হইতে,
কুমার নিরত আছিল তুলিতে ;
শায়ক মূলেতে কনক খচিত,
আভাতে অঙ্গুলি করিছে রঞ্জিত ;
বর্ষে মিষ্ট বাণী এবে সুরেশ্বর,
পুর রাখি' তাই বচনে উত্তর। ৬৪
ও অশ্ব ছাড়িয়া যখন দিবে না,
যথাবিধি তবে করিলে সাধনা,

যাগের যে ফল হইত উদয়,
অশেষে সে ফল প্রাপ্তো যেন হয়
ওহে, সমুদিত জনকে আমার ,
যাগেতেই রতি যে হেতু তাঁহার। ৬৫
পুনঃ দেব, হেন করহ বিধান,
এ বৃত্তান্ত যেন জানিবারে পান,
তব দূত-মুখে বসিয়া সভায
নৃপতি ; কেন না এখন তাঁহায়,
যজমান ভাবে রুদ্র অধিষ্ঠিত,
সাহসে কে তাঁ'র হ'বে অগ্রে স্থিত ? ৬৬
তথাস্তু বলিযা রঘুব বচন
অঙ্গীকাব করি', করিলে গমন,
অজয়ী থাকিয়া মাতলি-সারথি ;
তুরগের নাশে নাতি প্রীত-মতি,
কুমারো এদিকে তখন ফিরিছে,
বাজাব সভার উদ্দেশে চলিছে। ৬৭
ত্রৈলোক্য-নাথের আসি' বার্ত্তাহর,
সম্রাটে সংবাদ শুনাল সত্বর ;
কুলিশ-পতনে ক্ষতের ধারণে
জয়ী সুত পরে এলে সন্নিধানে,
আনন্দে পিতার কথা না সরিছে,
হরষে অসাড় করে পরশিছে। ৬৮
অবনীশ নবাধিক এ নবতি,
করি' রাখিল ইষ্টির যা মহতী,

রয় যেন উহা, পরমায়ু গতে,
অধিরোহণিকা ত্রিদিবে উঠিতে। ৬৯

এই বিষময় তখন বিষয়
পরিহরি' একেবারে,

রাজ চিহ্ন যেবা, যথাবিধি যুবা
সুতে তাহা দান ক'রে,
যথা মুনিজন, চলে হেন বন
দিলীপ দেবীর সনে,
বয়স গলিত হইল যেমত,
এ ব্রত ইক্ষ্বাকুগণে।

৬৯। এই শ্লোকটী তোটক ছন্দে রচিত; অতএব ইহার প্রতি চরণের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, ও দ্বাদশ বর্ণ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক।
ইষ্টি—যজ্ঞ। অধিরোহণিকা—সোপান। ত্রিদিব—স্বর্গ।

৭০। যখন স্বর্গ কামনায় বেদ বিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে গিয়া স্বর্গপতিকে মনঃক্লেশ প্রদান করা হইল, তখন কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক, সর্ব্বপ্রকার বিষয় কামনা জনিত আনন্দ বিমিশ্র ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল।

ইতি শ্রীকালিদাস বিরচিত রঘুবংশ কাব্য দর্শনাৎ বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর প্রবরভুক্ত কুলোৎপন্ন শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে সেন কৃতে বঙ্গ-রঘুবংশ কাব্যে ইন্দ্র-রঘুর যুদ্ধ নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

ত্রিবেণী।

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

রাত্রি দুইটা আন্দাজের সময় ফিরিয়া আসিয়া ধীরেন দেখিল ইন্দু অকাতরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রে আজকাল ইন্দু খায় না। রাত্রের আহার প্রায়ই তাহার হজম হয় না। দিনের বেলায় যেদিন সময় পায় চাট্টি খায়। সম্পূর্ণ ভাবে জ্বর এখন পর্য্যন্ত ছাড়ে নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একটু করিয়া জ্বর আসিয়া থাকে। সেটুকু কোন দিন ছাড়ে, আবার হয় তো কোন কোন বার দুই তিন দিন ছাড়ে না। তাহারই উপরে তাহাকে সব কাজই করিতে হয়, স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত; ঘুঁটে দেওয়া গোয়াল পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, জল তোলা ইত্যাদি এসব তো আছেই।

জ্বরের উপর আবার একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। সেটী কাশি। কাশিতে কাশিতে সময় সময় তাহার দম বন্ধ হইয়া যায় এবং মাঝে মাঝে মুখ দিয়া রক্তও পড়ে।

আজ একটু বেশী জ্বর আসায় শিশুীর

শিগগীর শুইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রের বাসন কাল সকালে মাজিবে বলিয়া সে সমস্ত রান্নাঘরে একটা কোণে জড় করিয়া রাখিয়াছিল।

বীরেন আশা করিয়াছিল অন্যান্য দিনের মত আজও ইন্দু তাহার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং হস্তস্থিত ছড়ির দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিয়া বলিল,"ওঠ না, জান না আমি এ সময়ে আসব?"

হঠাৎ চমকিয়া ইন্দু শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল। খাটের পাশে একটী আলমারী ছিল। সেটী না ধরিয়া ফেলিলে হয়তো পড়িয়া যাইত।

ইন্দু বলিল,—"কখন এলে? একটা ছাতা নিয়ে যাওনি। ভিজে গ্যাছ যে।"

বীরেন বত্রিশপাটি দন্তপংক্তি বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমি শালা মলুম ভিজে, আর উনি ঘুমিয়ে উঠে দরদ দ্যাখাচ্চেন। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কি সংযের মত; জুতোটা খুলে দাও।"

আঁচলের একটী খুঁট ইন্দুর পৃষ্ঠের দিকে ঝুলিতেছিল। সেই দিকে লক্ষ্য পড়িতেই বলিল,—"তোমার আঁচলে ও বাঁধা কি?"

মুখ না তুলিয়াই ইন্দু বলিল,—"কিছু না।"

বীরেন একেই রাগিয়াছিল; আরও রাগিয়া গিয়া বলিল,—"সুরেশের পীরিতের চিঠি বুঝি? বরতে ছটফট ক'রে আর চিঠি না লিখে থাকতে পারেনি?"

আজকাল সুরেশের নাম পর্যন্ত বীরেনের নিকট উচ্চারণ করিতে ইন্দু ভয় পাইত, পাছে সে কি বলিতে কি বলিয়া বসে। কোন কদর্য্য ভাষাই বীরেনের জিহ্বায় আটকাইত না।

উত্তরে একটী ছোট্ট 'না' বলিয়া ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

"তবে কি বাবা আবার নতুন ক'রে পীরিত কর্ত্তে আরম্ভ ক'রেচ নাকি? এখানে তোমার সেই প্রণয়ীটী কে?

'ভিজে এসেচ, একটু চা ক'রে দেব খাবে?'

জুতা খোলা হইয়া গিয়াছিল। খাটের ওপাশে একটা টেবিল রাখা ছিল। তাহারই উপর ভর দিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়াছিল। ইন্দুর কথা শুনিয়া বীরেন বলিল,—"কথা উল্টালে কি হবে চাঁদ? বল ওটা কি, নইলে মেরে ঘর থেকে বা'র করে দেব। কিষ্টি চিষ্টি মানব না।"

ইন্দুর জিদ হইয়া গেল, বলিল,—"ব'লচি তো ও কিছু নয়।"

বীরেন আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, জোর করিয়া ইন্দুর আঁচল হইতে পত্রটী বাহির করিয়া লইল। টানাটানিতে কাপড়ের যেটুকু ইন্দু

সেলাই করিয়াছিল সেটুকু আবার ছিঁড়িয়া গেল।

বীরেনের আঘাতে ইন্দু আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেই খানেই বসিয়া পড়িল।

পত্রটী দেখিয়া বীরেন বলিল,—"এযে সুরেশের চিঠি দেখ্‌চি। তাইতো বলি অত যত্ন ক'রে আঁচলে বেঁধে রাখা কেন। আমার এক-খানা চিঠিও তোমার বাক্সর ভেতর দেখতে পাইনি, বাবা। সুরেশের চিঠি একেবারে আঁচলে, মার্‌লা ক'রে প'ড়তে পারনি? এক্ষুণি তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। যাও বলচি। শুনলে যে! যাও।"

ইন্দুর আর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। সেই-খানেই শুইয়া পড়িয়াছিল, বলিল,—"বাইরে কোথায় যাব?"

ঘাড় ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া ইন্দুকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া বীরেন বলিল,—"আমার ঘরে আর তোমার স্থান হবে না। সুরেশের কাছেই যাও।"

দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরের বাহিরে দালান থাকিলেও সেখানটা বৃষ্টির ঝাপটে ভিজিয়া গিয়াছিল। তখনও খুব বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভিজিতে ভিজিতে ইন্দু বলিল, "দাঁড়াতে পাচ্ছি না, পায়ে পড়ি, দোর খুলে দাও।"

তারপর আর কিছু শুনিতে পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝে কেবল মাত্র কাশির শব্দ আসিতে-ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, ইন্দুর কোন আর্ত্তনাদ গ্রাহ্য না করিয়া বীরেন একমনে সুরেশের পত্রটী পড়িতেছিল। পত্রটী আজ সন্ধ্যার পর আসিয়াছিল। সুতরাং বিছানা পাতিতে দিতে যাইবার সময় বীরেন উহা দেখিতে পায় নাই।

সুরেশ লিখিয়াছিল :—

"স্নেহের ইন্দু,

আমার বোন যে কখন আত্মহত্যা ক'রবে না এ বিশ্বাস আমার চিরকালই ছিল। এখন তো আরও দৃঢ় হ'য়ে গ্যাছে। সত্যিই তো ইন্দু আত্মহত্যাটা ক'রবি কেন? দুর্ব্বল লোকেরাই আত্মহত্যা ক'রে থাকে। তোর মন তো আর দুর্ব্বল নয়, তুই আত্মহত্যা ক'রবি কেন? বীরেনের মুখে শুনলুম বীরেন তোকে নাকি এতদিন পরে আদর যত্ন কর্ত্তে আরম্ভ ক'রেচে; শুনে আমার খুবই আনন্দ হ'ল। আমার কেমন বিশ্বাস একদিন না একদিন সে তোকে ঠিক চিনতে পারবে এবং এই আদর যত্নগুলোই বোধ হয় তার আরম্ভ।

বীরেণের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। সে বলে তোর জ্বর আজকাল রোজ ছাড়ে না! তার ওপর সর্দ্দি কাশি হ'য়েচে। একটু সাবধান থাকিস্, যেন বাড়াবাড়ি না হ'য়ে পড়ে।

শুনলুম, তুই নাকি সব কথা বীরেনকে বলিস্ না। ওটা কিন্তু ভাল নয় ইন্দু। বীরেনের কাছ থেকে তোর কোন জিনিষ লুকোনো একেবারেই উচিৎ নয়। সে হাজার হোক্ তোর স্বামী, এটা আমি বিশ্বাসই কর্ত্তে পারি না যে, সে তোকে মোটে দেখতে পারে না। নিশ্চয়ই সে মনে মনে তোকে ভালবাসে। তাকি কখন হয় ইন্দু যে স্বামী স্ত্রীকে দেখতে পারে না? এখন যদি বীরেন তোকে দেখতে না পারে, হতাশ হ'সনি ইন্দু, একদিন না একদিন সে তার নিজের ভ্রম নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে; তখনই সে তোকে আপনার ক'রে নেবে।

তাই ব'লছিলুম বীরেনের কাছে কখন কিছু লুকুসনি। যখন যা দরকার হবে, যখন যে কথা মনে উদয় হবে, বীরেনকে ব'লবি। বিশেষতঃ তোর এই অসুখের কথাটা নিশ্চয়ই ক'রে তাকে ব'লবি।

তুই বীরেনের মঙ্গলের জন্যে সবই তো ত্যাগ ক'রেছিস্ তবে এই অভিমানটুকু আঁকড়ে ধ'রে আছিস্ কেন? সেটাকেও ত্যাগ ক'রিস্; দেখবি মনে আরও শান্তি পাবি।

তোর এ সাধনার ফল হবেই হবে। সিদ্ধিলাভ তুই করবিই ক'রবি। ভগবান কখন চিরকাল চোখ বুজে থাকতে পারবেন না। তিনি তোকে এ মহাব্রতের পুরস্কার দেবেনই দেবেন।

তুই লিখেচিস্, আমি যেমন তোর দাদা, তেমনি তুই বীরেনের দিদি! এতে লাভটা হ'ল আমারই বেশী, কেন না আমি তা'হ'লে দুজনকারই দাদা হলুম। আমরা এক মায়ের পেটের ভাই বোন নাই বা হলুম ইন্দু। আমাদের মধ্যে যেরকম স্নেহ আছে, মায়া আছে, একটা পবিত্র সম্বন্ধ আছে; এক মায়ের পেটের ভাই বোনদের মধ্যেও তো তাই থাকে। এর চেয়ে কিছু বেশী থাকে ব'লে আমার বোধ হয় না। আমি চিরকালই তোর দাদা থাকব, বীরেন চিরকালই তোর ছোট ভাইটী থাকবে, আর তুইও চিরকাল আমাদের বোনই থাকবি। নাই বা হলুম আমরা একমায়ের পেটের ভাই বোন, ইন্দু!

নিজের শরীরের ওপোর একটু যত্ন নিস্। কাশি আর ঘুস্‌ঘুসে জ্বর শুনে আমার বড় ভাবনা হ'য়েচে। দোহাই ইন্দু, নিজের দিকে, একটু নজর দিস্। দেখিস্, আমাদের কেলে

যেন আগে চ'লে যাস্‌নে। তাহ'লে তোর এই ভাই দুটোকে দেখবে কে? ধীরেনকেই বা দেখবে কে? সে যে সম্পূর্ণভাবে তোর ওপোর নির্ভর ক'রে আছে, তাকি তুই জানিস্ না? সে এখন অন্ধ, না বুঝচে ... ক তা বুঝতে পাচ্চিস্ না ইন্দু? যেদিন তার চোখ খুলবে সেদিন সে স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পাবে তোর ওপোর কতটা নির্ভর সে ক'চ্চে। তাই ব'লছিলুম এখন তোর বেঁচে থাকার অনেক দরকার।

অশ্রু আরও সেরে উঠেচে। একটু দুর্ব্বলতা ছাড়া তার আর কোন উপসর্গ নেই।

আবার ব'লচি ইন্দু তুই তোর শরীরের সমস্ত গ্লানি ধীরেনকে ব'লিস্; সে নিশ্চয়ই তোর প্রতিকার ক'রবে। হাজার হোক সে মানুষ, চোখের সামনে তার সতী স্ত্রীকে কখনই ম'ত্তে দেখতে পারবে না।

তাকে আমার ভালবাসা দিস্। ধীরেন ও তুই আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্।

এখানে কাকিমা, মা, সবাই ভাল আছেন। ইতি—

তোর "সুরেশদা।"

মনে করিয়া চার পাঁচ বার পত্রটী পাঠ করিতে ধীরেনের প্রায় আধ ঘণ্টার উপর লাগিয়া গেল। সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল, যাহা দেখিতে পাইবে আশা করিয়াছিল সে সব কিছু পাওয়া দূরে থাক্, উপরন্তু সমস্ত পত্রটী তাহাদের কথায় ভরা—তাহার নিজের, ইন্দুর এবং ধীরেনের।

হঠাৎ ধীরেন ডাকিল "ইন্দু, ইন্দু, ইন্দু।"

এই সে প্রথম ইন্দুর নাম ধরিয়া ডাকিল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া একরকম প্রায় লাফাইয়াই ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। তখনও অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

দরজার চৌকাঠের কাছেই ইন্দু শুইয়াছিল, বৃষ্টির ঝাপটে সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল।

সেদিন ধীরেনও বাড়ী ছিল না এবং তাহার জননীও বাড়ী ছিলেন না। হঠাৎ রাত্রে তাঁদের অসুখের সংবাদ পাওয়ায় ধীরেনকে সঙ্গে করিয়া তিনি পিত্রালয় চলিয়া গিয়াছিলেন।

বাহিরে আসিয়া ধীরেন আবার ডাকিল, "ইন্দু, ইন্দু, শুনচ ইন্দু।"

এবারেও কোন উত্তর পাইল না।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একটা আলো আনিয়া দেখিল ইন্দু উপুড় হইয়া শুইয়া আছে এবং তাহার মুখ দিয়া অনেকটা রক্ত বাহির হওয়ায় সে স্থানটী লাল হইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ—

মাতৃ-পূজা।

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব)

কর্ম্মভূমি এই পবিত্র ভারত,
কর্ম্ম ইহার সার।
সদা ত্রিকালজ্ঞ পূজ্য ঋষিগণ
কর্ম্ম-প্রভাবে যাঁর॥
এখানের কর্ম্ম সত্ত্ব-নিষেবিত
দয়া-মৈত্রী-সুসংযম
যত কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মাঝে
মাতৃ-পূজা অন্যতম॥
যে পূজা-প্রভাবে আচণ্ডাল-বিপ্র—
আপ্যায়িত হয় সবে।
আনন্দে বিহ্বল স্বদেশ বিদেশ
আনন্দময়ীরে ভেবে॥
সেই শুভক্ষণ আসিয়াছে এবে
পবিত্র করিতে দেশ।
(তাই) সাজিয়াছে ধরা শারদ-সম্ভারে
ধরিয়া মোহন বেশ॥
ভাবি আগমন জগৎ-মাতার
বৃক্ষ লতা জলাশয়।
পূর্ণতনু সবে স্বীয় সমৃদ্ধিতে
পূজিতে পূর্ণার পায়॥
করুণ-নয়নে, গ্রহ তারাদল
সদা মিটি মিটি চায়।
দেখিবে মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুষমা
মাতৃ-পূজা, এ আশায়॥
নানা গীত-বাদ্য করে পক্ষিগণ
হুলুধ্বনি এয়োমত।
আশাবধূ ধূপ দীপ লয়ে করে
অর্চ্চে মায়ে মনোমত॥
শারদীয়া ঊষা করে উদ্বোধন
পুষ্প-নৈবেদ্যাদি-করে।
জীমূত-মন্দ্রে মিশি সমীরণ
পূত সামগান করে॥
আইস সন্তান! দেখ, দ্বারে তব
দাঁড়ায়ে আনন্দমনে।
করিতে মঙ্গল, সর্ব্বমঙ্গলা—
ডাকেন নিজ সন্তানে॥

পূজ' শুভঙ্করী শকতি যেমত
শাস্ত্রবিধি বহু মত।
দেখিয়া হয়ো না বিশ্বাস-মূঢ়
নানা-মুনি-নানা-মত ॥
উপচার আছে, ষোড়শ পঞ্চ
দশ অষ্টাদশ আর।
বহু উপচার আদি চতুঃষষ্টি
সম্ভার আছে রাজার ॥
অকিঞ্চন তুমি—কোথা তব ধন ?
মাতা দিয়াছেন যাহা।
সবে অধিকারী মানসোপচারে,
পূজ' দিয়া তুমি তাহা ॥

বড় প্রীতা মাতা ঐ উপচারে
অন্য কিছুই নাই।
মায়ের লইয়া মাতাকে অর্চিবে
প্রভুত্ব কি তব ভাই ?
জলেতে বরুণ, দীপেতে সূর্য্য—
পূজিলে যেমত হয়।
উপচার দিয়া পূজিলে মায়েরে
হবে সেই ফলোদয় ॥
(তাই) মনপটে আঁকি মূর্ত্তি দশভূজা
ভক্তি উপচার দিয়া
পূজ' ডাকো মাকে জয় মা জয় মা—
অমৃতে ভরুক হিয়া ॥

ওঁ শান্তিঃ।

ত্রিবেণী।

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

সুরেশকে বিদায় দিয়া অশ্রু কিছুতেই স্থির হইতে পারিল না, অবাধ্য মনকে শান্ত করিতে পারিল না। সদাই ভাবিতে লাগিল, সে তো সুরেশকে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই; কে যেন জোর করিয়া তাহার মুখ হইতে 'এস' কথাটী বাহির করিয়া দিল। অনাহারে অনিদ্রায় কান্নাকাটী করিয়া সকাল হইয়া গেল। গত রজনী তাহার নিকট যেন একটা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দিন পাঁচ ছয় পরে ইন্দুর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া অশ্রু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল, অনেকটা মনকে বুঝাইতে সক্ষম হইল। বার বার ইন্দুর পত্রখানি পড়িয়াও অশ্রুর তৃপ্তি হইল না। সন্ধ্যার পর চৌকাঠগুলিতে জল

ছিটাইয়, সমস্ত ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া আলোর সামনে পত্রখানি ধরিয়া আবার পড়িতে লাগিল।

কিরণময়ী তখন রান্নাঘরে ছিলেন। রতন কি একটা দরকারে বাজারে গিয়াছিল।

আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়া অশ্রু একমনে পত্রটী পড়িতে লাগিল। ইন্দু লিখিয়াছে :—

স্নেহের অশ্রু,

মানুষ যখন মনের আবেগে একটা কোন কথা বলে সেই সময়েই তার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, কেন না যুক্তি ব'লে তখন তার কিছুই থাকে না। এই যুক্তি তর্কটাই মানুষকে অনেক সময়ে অনেক বড় বড় কাজ থেকে টেনে নিয়ে আসে; সেদিকে মোটেই এগুতে দেয় না।

তোর চিঠিখানা পেয়ে বুঝলুম, তুই মনের আবেগেই এতটা কথা লিখতে পেরেছিস্। বেশ ভেবে চিন্তে লিখ্‌তে ব'সলে, বোধ হয়, এত কথা আমায় জানাতিস্ নে। যাই হোক্, তোর হৃদয়ের পরিচয় আরও ভাল ক'রে পেলুম, আর আন্তরিকতার গভীরতা কতখানি তাও বুঝতে পাল্লুম।

এই যে সুরেশদা পুরী গেছেন, জানবি, মনের আবেগেই তাঁকে সেই দিকে টেনে নিয়ে গেছে। বিদ্যুতের পাখার তলায় আর আলোর সামনে ব'সে একখানা উপন্যাস পড়তে পড়তে যদি তিনি পুরী যাবার কথা ভাবতেন, তাহ'লে আমার সন্দেহ হয়, তিনি যেতে পার্ত্তেন কিনা? নিশ্চয় ঐ কতকগুলো বেশ ভাল ভাল যুক্তি তর্ক এসে তাঁকে বাধা দিত। এটা তো জানিস্ যে, ইচ্ছার অনুকূল যুক্তি চিরকালই আছে।

সুরেশদা লিখেছেন তিনি যাবার সময় তুই নাকি বড্ড কেঁদেছিলি এবং প্রথমটা তাঁকে যেতে মানা ক'রেছিলি। এটা কিন্তু তোর ভাল হয় নি অশ্রু।

পুরুষ মানুষ হাজার কেন মেয়েমানুষকে দাবিয়ে চলুক না, মেয়ে মানুষ না হ'লেও তাদের একদণ্ড চলে না। যত মনের জোর, যত ক্ষমতাই কেন পুরুষদের হোক্ না, এ হিসেবে আমাদের ছাপিয়ে তারা কখন উঠতে পারবে না।—যদিও আমাদের বিচক্ষণতার ক্ষেত্র তাদের চেয়ে অনেক কম।

ভগবানের দেওয়া আমাদের কতকগুলো আশীর্ব্বাদ আছে, কতকগুলো ক্ষমতা আছে যার জোরে আমরা খাঁচার পাখী হ'য়েও, হাত পা আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকলেও আমরা পুরুষ-মানুষদের নরক থেকে তুলেও আনতে পারি আবার নরকে ডুবাতেও পারি।

অনেক সময়ে আমাদের একটুখানি হাসির জন্যে, মুখের একটা কথার জন্যে পুরুষমানুষরা লালায়িত হ'য়ে থাকে। সেই জন্যেই আমরা তাদের অত যত্ন করি, অত ভালবাসি, তাদের অত ঝাঁটা লাথি আমরা মুখ বুজে সহ্য করি। পুরুষ মানুষরা আমাদের ওপোর কতখানি নির্ভর করে, সেটা তারা নিজেরাই অনেক সময়ে বুঝতে পারে না। সেই জন্যেই তাদের আমরা অত আগলে আগলে বেড়াই।

তাই ব'লছিলুম অশ্রু, সুরেশদা যখন তোর কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলেন তোর উচিত ছিল—হাসিমুখে তাঁকে যেতে দেওয়া। এখন তোর সেই ভিজে চোখ দুটো, অনুনয়ে ভরা কাতর দৃষ্টি, আর ভয় এবং ভাবনায় মাখা সেই মুখখানি তিনি ভুলতে পারেন নি। তা না হ'লে অত দুঃখ করে আমায় চিঠি লিখতে পাত্তেন না।

দেখছিস্ অশ্রু, পুরুষমানুষ কত দুর্ব্বল! কত স্ত্রীলোকের মুখাপেক্ষী! কত আত্মনির্ভরতায় গরীব! ঠিক সেই সময়টা না কাঁদলেই ভাল হ'ত, অশ্রু। এই তো এখন সুরেশদা চলে গেছেন, যত খুশী কাঁদনা, কেউ তো আর মানা করবে না। কাঁদাবে পুরুষ মানুষেরা কিন্তু আমাদের কাঁদতে হবে তাদের আড়ালে। তাদের সামনে কেঁদে, তাদের দুর্ব্বল মনকে আরও দুর্ব্বল ক'রে দেওয়া আমাদের উচিত নয়।

এটা তুই আমার ঠিক মনের মতন কথাই লিখেছিস্ অশ্রু, যে ভালবাসাটা পাঁচিলের মধ্যে বদ্ধ রাখলে চলবে না। যেমন ক'রে হোক্ এটাকে পাঁচিল টপকে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। নিজের ভাই বোনটীকে, নিজের বাপমাকে, নিজের স্বামী স্ত্রীকে আর নিজের আত্মীয় স্বজনটীকে শুধু ভালবাসলে চলবে না; সেটাই যে ভালবাসার চরম হ'লো তা নয়। ভালবাসতে হ'বে সকলকে—তা সে নিজেরই হোক্ আর পরেরই হোক্।

সত্যি ব'লচি অশ্রু, যখন আমি ভাবি আমার বাবা নেই, তিনি মারা গ্যাছেন, এ জীবনে আর তাঁকে দেখতে পাব না তখন আমার বড্ড কষ্ট হয়, চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু, আবার ভাবি বাবাই না হয় মারা গ্যাছেন, আর তো সবাই বেঁচে আছে, সমস্ত পৃথিবীটাইতো এখন বেঁচে আছে! তবে আমি শুধু একজনকার জন্যে এত ভেবে মরি কেন—এত কাঁদি কেন?

চোখের জল আপনা থেকে শুকিয়ে যায়, মনের মধ্যে আপনা থেকে বল আসে এবং বাবার সেই শেষ উপদেশটা বেশ উজ্জলভাবে

মনের মধ্যে ফুটে উঠে' আমাকে সজাগ ও সজীব ক'রে দ্যায়। মরবার সময় বাবা আমায় ব'লে গিছলেন,—"সকলকে আপনার মত ভাববি ইন্দু। ভগবানের পৃথিবীতে—কেউ কারুর পর নয় সবাই আপনার।"

আর এটাও ঠিকই লিখেছিস্ অশ্রু, ভালবাসা যে জিনিষটাকে অতি সহজে জয় ক'ত্তে পারে, জোর আর রক্তপাৎ তার সিকির সিকিও পারে না। ভালবাসায় জয় ক'ত্তে হ'লে মনের জোরের দরকার, ধৈর্য্যের দরকার, সাধনার দরকার। কটা মানুষ তা পারে অশ্রু? তাই তারা গায়ের জোরে একটা জিনিষকে জয় ক'রে ফেলে যখন দ্যাখে সেটা চিরস্থায়ী হ'ল না তখন পস্তায়।

ভালবাসার ভিতরে ওপরে সাধনা ও ধৈর্য্যের বালি সুরকী চূণে গাঁথা যে স্নেহের অট্টালিকা ওঠে, আমার বোধহয় সেই অট্টালিকাই খুব পাকা হয়। অনেক বড় বড় ভূমিকম্পও তাকে সহজে টলাতে পারে না।

আর সে অহঙ্কারের অট্টালিকা গায়ের জোরের ওপোর তোলা, অশান্তি এবং অতৃপ্তির কাজ করা, সেটাকে দেখলেই মনে হয় যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে একটা দম্ভ একটা বৃথা গরিমা ফুটে বেরুচ্চে, এবং ভেতরে ঢুকলে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারা যায় যে, এমন একটা দেখতে ভাল অট্টালিকা ভেতরটা অশান্তির পোকা একেবারে ফোঁপ্‌রা ক'রে দিয়েচে।

ভগবানের তাই শিক্ষাই হচ্চে, 'মানুষকে প্রেমে বশ কর'বে কামনায় নয়। যেখানে কামনা সেখানে যথার্থ প্রেম থাকতে পারে না, আর যেখানে প্রেম নেই সেখানটাকে কখন চিরস্থায়ী ভাবে জয় করাও যেতে পারে না। প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা—সকলেরই তলায় কামনা থাকলে চ'লবে না। আমরা শুধু দিতেই এসেছি, নিতে কিছুই আসিনি। তবে কেউ যদি কিছু দ্যায়, সেটা ফেলে দেওয়াটাও আবার আমাদের উচিৎ নয়। তার ভেতর একটু আন্তরিকতা থাকলে সেটাকে বুকের ভেতর রেখে দেওয়া উচিত।

আমার বিষয়ে তোকে আর কি ব'লবো অশ্রু? সুরেশদার কাছে সবই তো শুনেছিস্। তবে তোর প্রশ্নটার জবাবে আমি শুধু এইটুকু ব'লছি, "হ্যাঁ, আমি প্রাণ দিয়ে আমার স্বামীকে ভালবাসি।"

কেন জানিস্ অশ্রু? প্রথমতঃ, তিনি আমার স্বামী; দ্বিতীয়তঃ তিনি বড় অসহায়, তৃতীয়তঃ আমি তাঁর কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। এই

জন্যেই, অশ্রু, আমি তাঁকে অত ভালবাসি। বাবা মারা যাবার পর মা যখন আমার বিয়ের জন্যে অত্যন্ত ভাবনায় পড়লেন, আমায় নিয়ে সকলের দোরে দোরে ঘুরলেন, আমার জন্যে কত লোককে খোসামোদ ক'ল্লেন, কেউ যখন মার কান্নায় সহানুভূতি দ্যাখালে না, দয়া ক'ল্লে না, মুখ তুলে চাইলে না, আমায় কেউ কৃপা ক'রে পায়ে স্থান দিলে না তখন ইনিই গিয়ে আমায় পছন্দ ক'রে আসেন, দয়া ক'রে আমায় বিয়ে ক'রে ভাবনা থেকে মাকে রেহাই দ্যান।

শুভদৃষ্টির সময় স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত প্রাণটা ভ'রে উঠেছিল। সেই দিন থেকেই আমার যা কিছু আছে তাঁকে সব দিয়ে ভালবাসলুম। এবার বুঝতে পেরেছিস্, অশ্রু, আমার এত দুঃখেও, এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত মনের জোর কেন। আমার সম্বন্ধে আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। দ্যাখা হ'লে আরও অনেক কথা ব'লবো।

সুরেশদা'কে মাঝে মাঝে চিঠি দিস্। লজ্জাটাকে আর কান্নাটাকে চেপে রেখে তাঁকে উৎসাহ দেওয়াই তোর এখন উচিৎ। তুই জানবি তোর চিঠি তাঁকে এখন সালসার কাজ ক'রবে—মনে এবং দেহে উভয় যায়গাতেই। তাই ব'লচি, অশ্রু, হৃদয়ের করুণতাটা, মেয়েমানুষের কোমলতাটা এখন আপাততঃ কর্ত্তব্যের কঠিন আবরণে ঢেকে রেখে নারীত্বের আর একটা দিক্‌কে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রবি। জানবি আমার সুরেশদা'র এ মহাব্রতের কৃতকার্য্যতা তাঁর চেয়ে তোরই ওপোর বেশী নির্ভর ক'চ্চে।

আমার স্নেহ-ভালবাসা জানবি। মাকে আমার প্রণাম দিবি।

ইতি—

তোর বোন্

স্নেহের ইন্দু।"

চিঠিখানি মুড়িয়া অশ্রু নিজের বাক্সর ভিতর তুলিয়া রাখিয়া দিল। রাখিবার সময় একবার কপালে ঠ্যাকাইয়া লইল।

নীচে হইতে কিরণময়ী ডাকিলেন, "অশ্রু!"

বাক্সটী বন্ধ করিতে করিতে অশ্রু বলিল, "কেন মা?"

একবার নীচে আয় না মা, রুটী ক'খানা বেলে দিবি। একলা যে আর পেরে উঠ্‌চি না।"

"যাই।" বলিয়া অশ্রু নীচে নামিয়া আসিল।

কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ কি ক'চ্ছিলি? সকাল থেকে তো ছ' সাতবার প'ড়লি; আর কতবার প'ড়বি?"

রুটী বেলিতে বেলিতে অশ্রু বলিল, "মোটে তো ছ' সাতবার প'ড়েচি মা। এখন আমাকে অনেকবার প'ড়তে হবে।"

রাত্রে শয়ন করিয়া অন্যান্য চিন্তার মধ্যে অশ্রু এইটুকুও ভাবিল যে, সেদিন সুরেশের সামনে অমন করিয়া কাঁদাটা, বিশেষতঃ তাহার হাত ধরিয়া, অশ্রুর অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল এবং একটু বেহায়াপনাও হইয়া গিয়াছিল।

ক্রমশঃ

দুর্গাপূজা।

(শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।)

আইল শরৎ, পদ্ম জলে স্থলে —
না দেখি ভুবনে তুল্য,
হাঁকিল মধুপ, ঝরিল সিউলি—
নাহিক শোভার মূল্য।
কাশ ফুলে ধরা সাজিল,
বাজিল কালের বিজয় তূর্য্য,
ছিন্ন মেঘ কোলে খেলে লুকোচুরি,
খর মৃদুভাবে সূর্য্য।
সুনীল আকাশে সোণালিতে ছাপা
শোভে কিবা কম-চন্দ্র,
কভু আছে, নাই, আহা যেন আশা,
খেলিছে জীমূত মন্দ্র।
কহিল মেনকা, যাও গিরিরাজ,
আন গিয়া উমা শক্তি,
তাতেই পাইব শিব,—বিশ্ব-শিব,
দাও হৃদে বাঁধি ভক্তি।

শুনি, বিশ্বমাতা, সে উমা আমার,
মিলিয়া শিবের অঙ্গে,
দু অঙ্গে একাঙ্গ, শিব শক্তি জাগে,
প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গে।
শিব শক্তি কোলে ধন বিদ্যা স্থির,
লক্ষ্মীবাণী মহাঋদ্ধি ;
তাদের রক্ষায় রত শক্তিধর,—
গণপতি মতি সিদ্ধি।
বিকট দংষ্ট্রায় সিংহ শত্রু নাশে,
বাঁধে পাশে অরি-ইন্দ্র,
উদয় এরূপে শক্তি পিতৃগৃহে,—
পূজিল ভকত বৃন্দ।
হিমাদ্রির কোলে, সুজলা সুফলা
শোভা মরি কিবা বঙ্গে,
সে ধূপ-সুবত্তি বহিল সমীর,
মাতে বঙ্গবাসী রঙ্গে।

দুর্গোৎসব-মধু-কণা, গৃহে গৃহে
ছুটিল মধুর গন্ধ,
মাতিল সবাই ভুলি শত্রু ভাব,
আবাহনে হলো অন্ধ।
আমন্ত্রণ অধিবাস সপ্তমীতে,
পূজা অষ্টমীর সন্ধি,
নবমীর পীঠে রক্ত বুক চিরে,
দেয় খোলা প্রাণে বন্দী।
হবিঃ গন্ধ হোমে, ধ্যান প্রাণভরা,
নিনাদিত সাম-মন্ত্র,
সত্ত্ব ভাবাশ্রয়ে সত্ত্ব প্রতিমায়,
জাগায় ধরিয়া তন্ত্র।
পূজার বাজনা জ্বলিল, নিভিল,
হলো হোম দক্ষিণায়,
সজীর নয়নে নীরাজন আহা—
হয় কি পরাণ শান্ত?
শরৎ কুসুম বাহিরে, ভিতরে—
ভকতির ফুলে, ভক্ত,
পূজিল আবেগে দশভূজারূপ,
সাধনেতে অনুরক্ত।
একাধারে শক্তি শিব বিস্তাধন,
সিদ্ধিলাভ বিন্দু বিন্দু,
তাই দুর্গাপূজা এত আদরের,
পূজে আত্মহারা হিন্দু।
আয়, শক্তি, মাগো! তোরে পেলে পাব,
তোরই প্রিয় শিব-মূর্ত্তি,
ঐহিকের জ্বালা জুড়াবে জননি,
চরমে পরম মুক্তি।

সভ্য-জাতির সমর-নরমেধ।

(অর্থাৎ মহাত্মা টলষ্টয়ের লিখিত যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ চতুষ্টয়)

কার্থেজ ধ্বংস করিতেই হইবে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ।]

জাগো, ভ্রাতৃগণ! ঐ দুর্বৃত্তগণের আহ্বান শুনিও না শৈশব হইতে উহারা তোমাদের বুদ্ধি কলুষিত করিয়া দিতেছে। উহারা তোমাদিগকে যে Patriotism (স্বদেশ প্রেম) শিক্ষা দেয়, উহা অসত্য এবং ধর্ম্ম-বিরোধী, উহাতে তোমাদের যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নিতেছে—

তোমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া দিতেছে, তোমাদের মনুষ্যোচিত সম্মান অপহরণ করিতেছে!

ঐ পাপীষ্ঠ ধর্ম্মযাজকদিগের সেকেলে মত বিশ্বাস করিও না—উহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না—দুর্ব্বৃত্তগণ মিথ্যা এবং বিকৃত ধর্ম্মের শিক্ষা তোমাদিগকে দেয়—উহারা বলে—যুদ্ধ ঈশ্বরের আদেশ—এই নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ ঈশ্বর উহাদেরই আবিষ্কার! ইহাদিগের কথা শুনিও না। ইহারা প্রবঞ্চক পুরাতন গণের পুনরাবির্ভাব বিজ্ঞান এবং সভ্যতার দোহাই দিয়া এই নৃশংস কার্য্যের ধারা ইহারা বজায় রাখিতে চায়। সেইজন্য সভায় সকলে একত্র হয়, বড় বড় বক্তৃতা দেয়, নানা গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করে এবং যাহা করা হইতেছে জগতের কল্যাণের জন্যই করা হইতেছে এই বলিয়া ভাণ করে, প্রকৃত পক্ষে উহার জন্য কোন চেষ্টাই করে না. যে জন্য চেষ্টা করে তাহা কর্ম্মফলেই পরিচয় পাওয়া যায়। এই শঠ দিগকে বিশ্বাস করিও না। বিশ্বাস কর শুধু তোমাদের বিবেককে—যে বিবেক তোমাদিগকে বলে—তোমরা পশু নও, তোমরা ক্রীতদাস নও, তোমরা স্বতন্ত্র পুরুষ, 'স্বকর্ম্ম ফলভাক্ পুমান্' —নিজের কর্ম্মফল পুরুষ নিজেই ভোগ করে—কাহাকেও তুমি স্বেচ্ছায় মারিয়া ফেলিবে, সে পাপের ফল তুমিই ভোগ করিবে। কাহার কথায় তুমি কাহাকে মারিবে? কেন মারিবে ভাবিয়া দেখ। যে তোমাকে মারিতে হুকুম দেয় তাহারই উহাতে ষোল আনা স্বার্থ—তোমার স্বার্থ কিছুই নাই। এতদিন ত মূঢ়ের ন্যায় দিনযাপন করিলে। এখন একবার ভাই জেগে উঠ, উঠে দেখ দেখি রণোন্মাদে কি ভীষণ নৃশংসতা, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! অনুষ্ঠান তুমি করিয়াছ ও করিতেছ শাণিত অস্ত্র ভাইয়ের বুকে মারিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতেছ। কাহার কথায় কাহাকে মারিতেছ, সেইটুকু শুধু বুঝিয়া লও। ভ্রাতৃহত্যা কি তুমি ঘৃণা কর না? তথাপি কেন কর, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? বেশ করিয়া বুঝিয়া এই পাপ কার্য্য পরিত্যাগ কর। ভ্রাতৃবিরোধেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইল।

তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, শুধু সৈনিক হওয়াটা ছাড়িয়া দিয়া ভ্রাতৃবধ হইতে বিরত হও। এমন কার্য্য ত তুমি ঘৃণা কর, অতএব আর তুমি ইহা করিও না। তা'হলে দেখিতে পাইবে, ঐ প্রবঞ্চক শাসক গণের যাহারা প্রথম তোমার বুদ্ধি কলুষিত করে, পরে তোমার উপর অত্যাচার করে,—তোমাদের

এই শুভ জাগরণে তাহারা দিবালোকভীত পেচকের ন্যায় অন্তর্ধান করিয়াছে,—এবং তোমাদের এই আশ্চর্য্য জাগরণে জগতে এক নবীন ভ্রাতৃভাবের উদয় হইয়াছে,—ইহারই জন্য সমস্ত খৃষ্টান জগৎ তৃষিত চাতকের ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছে। দুর্বৃত্তের অত্যাচারে উৎপীড়িত, শঠের শঠতায় মুগ্ধ, কুতর্করূপ বিরুদ্ধ বচনজালে বিজড়িত খৃষ্টান জগৎ এই মুক্তির পথই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

দূষিত তর্ক যুক্তির দ্বারা আর মানুষের বুদ্ধি কলুষিত করিও না। বিবেক বুদ্ধি তাহাকে সর্ব্বদা যাহা বলে, তাহাই তাহাকে করিতে দেও; তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের শরণাগত হইতে হইলে তাহাকে কি করিতে হইবে; তাহা শাস্ত্রের আদেশ, কিম্বা তৎ প্রেরিত কোন মহাপুরুষের আদেশই ঈশ্বরের বাণী, সে বুঝিয়া লইবে।

ক্রমশঃ

মানব-জাতি।

বিভিন্ন জাতি ও রাজ্যাধিকারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ)

লোহিতবর্ণ জাতি।

অন্য পক্ষে এমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে লোহিতবর্ণ জাতি সকল অপেক্ষাকৃত কম শিশুভাবাপন্ন। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক বুদ্ধি নিতান্তই কম। আমেরিকায় ইউ-রোপিয়ানদের বসবাসের পূর্ব্বে অবশ্য তথায় বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ সভ্যতা-সম্বলিত সুবিস্তৃত রাজ্যসকল বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু পেরু ও মেক্সিকোর ঐশ্বরিক রাজতন্ত্র সমূহ (Theocratic monarchies) স্থানীয় জাতি কর্ত্তৃক গঠিত বলিয়া মনে হয় না; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এসিয়া হইতে আগন্তুক অধিবাসী বৃন্দই ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা—এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। পেরুর ইন্‌কাসদিগকে যে "সূর্য্যের শ্বেত সন্ততি" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল এবং শ্বেত মনুষ্য-গণকে "দেব সন্ততি" বলিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করা হইত—ইহাই তাহাদের আর্য্য-যুগের প্রকৃষ্ট

পরিচয়। এদিকে যেখানেই ইণ্ডিয়ানরা স্ব-ভাবে থাকিতে পারিয়াছিল সেইখানেই তাহারা বন্য শিকারীর অবস্থায় পুনরাগমন করে ও ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সদা পরিবর্ত্তন-শীল প্রধানগণ, উগ্র বক্তা ও জন-সংঘ সম্বলিত তাহাদের জাতীয় পরতন্ত্র সমূহের মূলে স্থায়ী বিধি নিষেধ বা ব্যবস্থাবলী পরিদৃষ্ট হয় না। তাহাদিগকে রাজ্য না বলিয়া শিকারী-সংহতি বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছামূলক স্বাধীনতা থাকিলেও সমষ্টিগত একতার মূল নিতান্তই অনুদার ও অপরিণামী ছিল। শ্বেত জাতীয়ের সভ্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সাধ্যাতীত হওয়ায় বিলোপ এবং ধ্বংশ ভিন্ন ইহাদের গত্যন্তর রহিল না।

তথাকথিত **হরিদ্রাবর্ণ জাতির** রাষ্ট্রীয় উন্নতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাহারা চিরদিনই এসিয়াবাসী এবং ইহারা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, পাংশুলবর্ণের মালায়া ও পাংশুলাভযুক্ত ফিন ও মঙ্গোল। শেষোক্ত বিভাগ হইতে বহু বিখ্যাত রাজপুরুষ, সেনা-নায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য ঐ জাতীয় কতক সম্প্রদায় অদ্যাবধি শিকারী বর্ব্বর ও দস্যু ভাবে প্রধানতঃ মধ্য এসিয়ায় বন্য জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায় বিখ্যাত সাম্রাজ্য সকল স্থাপন করিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে ইহারা রূঢ় ভাবাপন্ন থাকিলেও পূর্ব্বাঞ্চলে ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছে। নীগ্রো কিম্বা ইণ্ডিয়ানগণ অপেক্ষা সাধারণতঃ এই জাতিই ককেসিয়ান সহিত নিকটতর রূপে সম্পর্কিত এবং প্রাচীনকাল হইতে, বিশেষতঃ ইহাদের উচ্চশ্রেণী ও শ্বেত বর্ণের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। চীন ও জাপানের সভ্য জাতি সকল হান ও টার্ক জাতি অপেক্ষা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে রাজনীতিজ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং ইয়ুরোপবাসী আর্য্যদের অপেক্ষা অল্প সময়েই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মমূলক ভাবগুলি, বর্ব্বরতা ও মনুষ্যত্ব এবং আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও আত্ম-মর্য্যাদা প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহারা কৃষি, বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা ও স্থানীয় শান্তি-রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের ব্যবহার-নীতি সম্পর্কীয় ধারণা সমাজ-নীতি ও গার্হস্থ্য-নীতি সংস্পৃষ্ট হওয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল। তাহাদের শাসন-তন্ত্র মোলায়েম এক-তন্ত্রের অনুরূপ (Benevolent despotism) তাহাদের সম্মান-বোধ এবং জাতীয় স্বাধীনতা বোধ ছিল না।

শ্রেষ্ঠ-জাতি।

ককেশিয়ান শুভ্র জাতি বা ইরানিয়ান জাতিই সভ্যতার উচ্চতম স্তরে অবস্থিত ছিল। কো াস ইহাদিগকে "দিনের আলোর জাতি" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। "রজনী বা সন্ধ্যা সন্ততি" আখ্যার বিরুদ্ধ বিচারেই এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ইহারা "সূর্য্য সন্ততি বা স্বর্গ-সন্ততি" নামেও প্রাচীনকালে অভিহিত হইত। ইহারাই জগদেতিহাসের প্রধান অধিনায়ক। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন-সন্ধানবাহী সমস্ত উচ্চ স্তরের ধর্ম্ম-নীতিই ইহাদের নিকট প্রথম প্রতিভাত হয়; এমন কি সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্রই ইহাদের মানস-সরোবরে প্রথম প্রস্ফুটিত, হইয়াছিল। অন্য জাতি ইহাদের সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া নিজেদের শাসনাধীনে আনিত। সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও বিকাশ ইহাদেরই প্রচেষ্টা দ্বারা অনুসৃত। এক কথায় বলিতে গেলে, মনুষ্য প্রকৃতির বিবিধ উচ্চতম পরিণতির জন্য আমরা ভগবান ব্যতীত ইহাদেরই বুদ্ধি-বৃত্তি ও অধ্যবসায়ের নিকট ঋণী।

কিন্তু এই 'দিব্য-জাতি' দুইটী বিখ্যাত শাখা-জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে—সেমিটিক ও আরিয়ান জাতি। সেমিটিক জাতির কৃতিত্ব মনে হয় যেন ধর্ম্মালোচনায় পর্য্যবসিত হয়। জুডাইজম্ ক্রিষ্টান ধর্ম্ম, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল সেমিটিক জাতি কর্ত্তৃক প্রাচ্যেই প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান বহু নিম্নে। অন্য পক্ষে আরিয়ান জাতি উচ্চভাব ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন ভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া রাজ্য ইতিহাসে ও মনুষ্যের ন্যায্য-স্বত্ব (rights) সাব্যস্তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহারা ইয়োরোপ খণ্ডেই ইহাদের প্রকৃত জন্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপনা করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে মনুষ্যোচিত প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতি পরিস্ফুট করিয়াছে। এই জন্যই ইয়োরোপের আরিয়ান জাতি তাহাদের জ্ঞানগবেষণা ও অনুষ্ঠান-প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জাতির রাজনৈতিক 'গুরু' পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র মানব জাতিকে জাতীয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা হৃদয়ে পোষণ করে।

এক্ষণে এই সমস্ত জাতিগত বিভিন্নতা যে প্রকৃতিগত বা নৈসর্গিক সৃষ্টি-শক্তি সম্ভূত, কেবল মাত্র মানব-ইতিহাস ঘটিত নহে—ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। অন্য পক্ষে এই সমস্ত জন্মগত জাতির (races) স্থানান্তর প্রবাসে ও নানা প্রকারে অন্য জাতির সংমিশ্রণে যে সব রাজনৈতিক জাতির (nation) উদ্ভব হইয়াছে

তাহারা মানব-ইতিহাসের বিষয়ীভূত। সুতরাং রাজনৈতিক জাতি বা রাজ্য-জাতি মনুষ্যের জন্মগত জাতির ঐতিহাসিক শাখা বিশেষ। অবশ্য আমরা অনেক আদিম জাতির সন্ধান পাই—যাহাদের সম্বন্ধে ইতিহাস মাত্র অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোন সন্ধানই দিতে পারে না এবং ইহাদিগকেই আমরা 'আদিম জাতি' আখ্যা দিয়া থাকি। তবে যে সমস্ত বহুসংখ্যক জাতির বিষয় ইতিহাসের বিষয়ীভূত তাহাদের সম্বন্ধে পর্য্যালোচনার ফলে ঐ সমস্ত 'আদিম জাতির' উত্থান-পরিণতি একই প্রকারে সাধিত হইয়াছিল—এইরূপ ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইতিহাস, একীকরণ ও পৃথক্করণ, পরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি সাহায্যে বহু পুরাতন জাতির লোপ ও "নূতনের" উদ্ভব সাধন করিয়াছে। এই জন্যই আকৃতিগত বৈষম্য অপেক্ষা প্রকৃতি, চরিত্র, ভাষা ও ব্যবহার-নীতিগত বৈষম্যই জাতীয়ত্বের শ্রেষ্ঠতর নিদর্শনরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

গ্রহণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব লিখিত)

সর্ব্বং ভূমিসমং দানং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ॥

গ্রহণকালীন দান একান্ত কর্ত্তব্য। কি ধনী কি নির্ধন সকলের পক্ষেই গ্রহণকালীন দান একান্ত অনুষ্ঠেয়। এই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকার বলিতেছেন,—"গ্রহণকালীন যে কোন দানই হউক না কেন অথবা যত অল্প পরিমাণই হউক না, তাহা ভূমিদানের তুল্য। নিঃস্ব তুমি, তোমার কিছুই নাই বলিয়া হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। তোমার যাহা আছে, তাহা হইতেই কপর্দ্দক-মাত্র দান করিলে তুমি ভূমিদানের ফল পাইবে। যে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে দান কর, তাহাই বেদব্যাসের হাতে দেওয়ার তুল্য হইবে।" আরও বলিতেছেন,—গ্রহণ হইলেই স্নান করিতে হইবে। তুমি যে কোন জলাশয়েই গিয়া স্নান কর, সেই জলাশয়েই পতিত-পাবনী গঙ্গা উপস্থিত হইয়া তোমার সমস্ত পাপরাশি বিধৌত করিবেন। এ বিষয়ে অন্য প্রকার শাস্ত্রানুশাসনও আছে ;—

সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্ যস্তু মানবঃ।
সপ্তজন্মস্বসৌ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চ ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সংক্রান্তিতে এবং গ্রহণে

স্নান না করিবে, সে সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও দরিদ্র হইবে।" কি ভীষণ শাসন! এরূপ বিধির তাৎপর্য্য এই যে, এরূপে শাসিত হইলে মানবগণ গ্রহণকালীন অবশ্যই স্নান করিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, গ্রহণকালে স্নান এবং দানের জন্য পরম কারুণিক ত্রিকালদর্শী সংহিতাকারগণ এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন কেন? এ বিষয়ের প্রকৃত কারণ বুঝিতে যাওয়া সামান্যবুদ্ধি মানবের পক্ষে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়ার ন্যায় নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। তবে ইহাতে আমার অনীয়সী বুদ্ধি যতটুকু প্রসারিত হইতেছে, সাধারণে সেইটুকুই প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

অগ্রেই বুঝা উচিত, গ্রহণ বলিয়া যে ব্যাপার—সেটী কি? ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর পদার্থতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাই বলুন, আমাদের পুরাণ-প্রসঙ্গাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রহণের আদি-কারণ জলধি-মন্থন। সমুদ্র-মন্থনে বহুবিধ অমূল্য বস্তুর আবির্ভাবের পর অমৃত উত্থিত হয়। তজ্জন্যই দেবাসুরে মৈত্রী-স্থাপনানন্তর একত্রিত হইয়া সমুদ্র মন্থনে বহু ক্লেশ স্বীকার করেন। তৎপরে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলে অমৃত-বণ্টন বিষয়ে পরিবেশক সম্বন্ধে বিস্তর কথান্তর হয়। ভগবান তখন অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করতঃ উপস্থিত হইয়া নিজেই পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়া সুধার পরিবর্ত্তে বিলাস-বিলোল-কটাক্ষ এবং স্মরোদ্দীপক হাস্যে তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করতঃ দেবগণকে পীযূষ পান করান। দৈত্যদিগের মধ্যে রাহু অতিশয় ধূর্ত্ত। তিনি বেগতিক দেখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দেবগণের পঙ্‌ক্তিতে মিশিলেন ও সুধাপান করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটী চন্দ্রদেব ও সূর্য্যদেব বিষ্ণুকে জানাইয়া দিলে বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সুদর্শনের দ্বারা রাহু দৈত্যকে ছিন্ন করিলেন। রাহু তখন অমৃত খাইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইল না। মস্তকভাগ রাহু ও কবন্ধ অংশ কেতু বলিয়া খ্যাত হইল। এই আক্রোশে অদ্যাবধি চন্দ্র ও সূর্য্যদেবকে সময়ে সময়ে রাহু দৈত্য গ্রাস করিয়া থাকেন। ঐ গ্রাসই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ বলিয়া প্রথিত। অমৃত পান করিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি রাহু ও কেতু গ্রহদিগের মধ্যে স্থান পাইলেন।

সূর্য্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ শূন্যমার্গে সংঘটিত হয়, কিন্তু সেজন্য আমাদের এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? এইরূপ হয়ত কেহই কেহ ভাবিতে পারেন। তদুত্তরে বলা যায় যে, পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর উপরই গ্রহদিগের আধিপত্য

পূর্ণরূপে বর্তমান। ইহার সাক্ষী বেদের চক্ষুঃ-স্বরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্র। "রাজানৌ রবিশীতগূ"—গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রদেব রাজা। চন্দ্রের প্রভাব আবার সূর্য্যদেবের তেজঃ লইয়া। এক-মাত্র সকল তেজের আধার সবিতা। ঐ সূর্য্য-দেবের তেজকে আশ্রয় করিয়া এই জগৎ প্রতি-ষ্ঠিত অতএব ইহার নাম সৌর জগৎ। বেদ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়;—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ"। অর্থাৎ বিধাতা অগ্রে সূর্য্যদেবকে সৃষ্টি করিলেন। ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কল্পনা করিলেন। অন্যান্য সৃষ্টিপ্রকরণ দৃষ্টেও জানা যায় যে, ভগবান হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াই প্রথমতঃ সূর্য্যদেবকে কল্পনা করেন। কারণ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই বিশ্ব তমস্তোমে আবৃত ছিল বলিয়া সূর্য্যদেবের সহায়তা ব্যতীত কোন বস্তুরই সত্ত্বা সম্ভবপর নহে। সূর্য্যদেব যে সকলের মূলাধার এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু প্রমাণের আবশ্যক হইবে না। অতএব জগতের প্রাণ—সবিতা। জ্যোতিষ দৃষ্টে জানা যায়;—

১। সত্ত্বং ভবয়ুঃ শশিসূর্য্যজীবাস্তমো যমারৌ চ
রজোজ্ঞশুক্রৌ।

২। সূর্য্যেন্দুজীবাঃ সত্ত্বাখ্যাঃ জ্ঞশুক্রৌ চ
রজোগুণৌ।

স্বর্ভানুভৌমরবিজাস্তমোগুণময়াঃ সদা॥

অর্থাৎ "সূর্য্য চন্দ্র ও বৃহস্পতি সত্ত্বগুণী, বুধ ও শুক্র রজোগুণবিশিষ্ট এবং রাহু মঙ্গল ও শনি তমোগুণান্বিত॥" সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমো-গুণে নাশ। সূর্য্যদেবরূপ সত্ত্ব (সমগ্র জগতের সত্ত্বাধার) আজ রাহুরূপ তমোগ্রস্ত। যদি মূল সত্ত্বই তমোগ্রস্ত হইল, তাহা হইলে জাগতিক জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়-গহ্বরনিহিত স্বল্প সত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? জীবের সাময়িক এই অকল্যাণ নিবারণার্থই ঋষিগণ জীব জগৎকে তাৎকালিক সত্ত্ব-সংরক্ষক ধর্ম্মানুষ্ঠানে দান দণ্ড এই উভয় নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ওহে জীবগণ! গ্রহণাবসরে দান কর, স্নান কর, জপ কর, পুরশ্চরণ কর, শ্রাদ্ধ কর, তর্পণ কর, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সদনুষ্ঠান যতটুকু আচরণ করিবে, "তদানন্ত্যায় কল্পতে" তাহাই অনন্ত হইবে। উর্ব্বর ভূমি-নিহিত বীজ যেমন কালে অনন্ত ফলের অনন্ত বীজের জনক হয়, তদ্রূপ এই সত্ত্বধ্বংস সময়ে তোমার হৃদয়-ভূখণ্ডে যদি সামান্য মাত্রও সত্ত্ববীজ স্থান পায়, তাহাই ভবিষ্যতে অনন্ত সত্ত্বগুণ প্রসব করিবে। সময়ে সেই স্বল্প সত্ত্বই মেরুতুল্য হইয়া তোমার অনন্ত শ্রেয়ঃ সাধন করিবে। আর এরূপ না করিয়া যদি সেই সত্ত্বগ্রাসী সময়ে সামান্য

মাত্রও তমোভাবকে প্রশ্রয় দাও, তাহা হইলে তাহাও, আবার কালে অনন্ত হইয়া তোমার প্রভূত অকল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

ধন্য আর্য্যগণ! ধন্য আপনাদের সর্ব্বতোমুখিনী জনবাৎসল্যতা! এরূপ কারুণিক না হইলে 'আর্য্য' নামের স্বার্থকতা কোথায়? এক্ষণে সহজেই বুঝা যায় যে, গ্রহণকালীন স্নান কেন প্রয়োজনীয়। স্নান নিমিত্ত আর্য্যগণ কেন আমাদিগকে অপত্যোচিত এরূপ ধমকাইতেছেন, ইহা অবশ্যই ভাবিবার কথা। জলের যে কি মহীয়সী শক্তি, তাহা সন্ধ্যার মার্জ্জন মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। "শন্নো আপোধন্বন্যাঃ......আপো জনয়থাচন।" জল—নারায়ণ, স্নানার্থীর সঞ্চিত যাবতীয় পাপরাশি ধৌত করিবার ক্ষমতা জলের আছে;—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়ন্নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

তাহাতে আবার কর্ম্ম চণ্ডালযোগজনিত প্রাণিদেহে পাপসঞ্চার এবং সমস্ত জলাশয়ে পতিতপাবনী গঙ্গার যুগপৎ আবির্ভাব। নাশ্য-নাশকের যেন যমজভাবে জন্মগ্রহণ। এতদুভয়ের মধ্যে নাশকই বলবান; অতএব তাৎকালিক যোগজ পাপ নরদেহাদিতে যদিও আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী গঙ্গার আবির্ভাবে সে পাপে ভীত হইবার কারণ কি? মানব! স্নান কর, স্নান কর, এ সময়ে স্নান করিলে তুমি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। পরন্তু সত্ত্বভাবাশ্রয়ে অদূরকালে তুমি পরম কল্যাণভাজন হইবে। একটু ভাবুন দেখি—এ ক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতাদিতে সাত জন্ম যন্ত্রণা ভোগরূপ শাসন করিয়া ঋষিগণ অন্যায় করিয়াছেন কি? পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি আমাদের দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করিতে জানে না, বুদ্ধিও সসীম, তখন কি করিয়া দেখিব—কিরূপে বুঝিব যে, গ্রহণকালীন আশ্রিত-কল্মষ—আমাদের সপ্তজন্মকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিবে না?

চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণাবসরে কালের একটী অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে। আদ্যন্তরহিত কাল সাক্ষাৎ ভগবান্। তাহাতে তিথিনক্ষত্রবারাদি-যোগে যেমন যাত্রা বিবাহাদি শুভকর্ম্মে তারতম্য ঘটে, সেইরূপ রাহুর সূর্য্যচন্দ্রাদি-সঙ্গমে তাৎকালিক একটী অপূর্ব্বোৎপত্তি হয়। তাহা অক্ষয়। আধুনিক প্রতীচ্য-শিক্ষা-শিক্ষিত বহু সভ্যের ইহা হয় তো রুচিকর হইবে না। যেহেতু তাঁহারা তাবদ্ বস্তুরই তত্ত্বানুসন্ধান-প্রয়াসী। তাঁহাদিগের তত্ত্বপ্রসবিনী বুদ্ধির নিকট আর্য্যগণের গ্রহণ ব্যবস্থাটা (স্নানদানাদি) সহজেই পরাভূত হইবে। কারণ, তাঁহাদিগের নিকট মরা গরুতে যখন ঘাস খায় না, তখন কালের আবার যোগাযোগ কি? কিন্তু

তখন কালের আবার যোগাযোগ কি? কিন্তু তাঁহারা একটু স্থির বুদ্ধিতে দেখিলেই দেখিতে পাইবেন,—কর্ম্মচণ্ডালযোগীয় কালের কি মহনীয়-শক্তি! অনেকেই দেখিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই জানেন যে গ্রহণকালে অন্তর্ব্বত্নী স্ত্রীলোক যদি একটু মাত্র অসতর্কতা-প্রযুক্ত নখ-দ্বারা ভূমি-লেখন, রজ্জুছিন্নকরণ অস্ত্রদ্বারা কোন বস্তু-দ্বিধাকরণাদি কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার গর্ভস্থ শিশুও বিকল হইয়া যায়। তন্ত্রায়ুর্ব্বেদাদ্যুক্ত ঔষধসমূহ গ্রহণকালীন সংগ্রহ করিলে তাহা অতিশয় বীর্য্যবান্ এবং আশু-ফলোপধায়ক হয়। গ্রহণকালীন পুরশ্চরণ বিষয়ে মন্ত্র-জপের কোনও ধরাবাঁধা সংখ্যা নাই। কোনও কোনও মন্ত্রের পুরশ্চরণাদিতে তন্ত্রসার-নামক গ্রন্থে দেখা যায়, চতুর্লক্ষ ছয় লক্ষ অষ্ট লক্ষ দ্বাদশ লক্ষ প্রভৃতি বহু জপের নিয়ম আছে। কিন্তু গ্রহণ-পুরশ্চরণের এমনই আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে গ্রাসাদ্বিমুক্তি পর্য্যন্ত যত সংখ্যক জপ করিতে পারিবে তাহাতেই তোমার অভীষ্ট পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইল। পুরশ্চরণ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রের তিথ্যাদিযোগোত্থ বহু প্রকার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে গ্রহণে কিন্তু সকল মন্ত্রেরই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে গ্রহণ সময় কালের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না কি? অতএব ভাইগণ! পুরাতন আর্য্য-ঋষিদিগের প্রত্যেক অনুশাসন, প্রতিবাক্য, প্রতিবিধি-নিয়ম আমাদিগের যে কতদূর প্রতিপাল্য, আমাদিগের যে কতদূর শ্রেয়ঃসাধক তাহার তত্ত্বানুসন্ধান আমরা কিরূপে করিব? আইস—যতদূর পারি, কায়মনোবাক্যে মহাজনদিগের আদেশ পালনে তৎপর হই; প্রতি বাক্যকে বেদ-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখি; প্রতিবিধি-বাক্য আমাদিগের সম্বন্ধে মধুময় হউক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

মায়ের পূজা।

(গীতার যৌগিক ব্যাখ্যাকার)

দক্ষিণায়ণের শেষার্দ্ধে বা দেবলোকের মধ্য-রাত্রি অতিক্রম হইবার পর হইতে—মাতৃ-পূজায় শক্তিলাভ করিতে আমরা সাধন অভিযান করি। আর চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে সক্ষম হই বা না হই,

মাতৃ-অস্তিত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে যত্নবান হই। মধ্যরাত্রে অকালে মাকে দুর্গা বলিয়া উদ্বোধিতা করিয়া তৃতীয় প্রহরে করালিনী কালীরূপে মায়ের প্রলয়ঙ্করী শক্তির আবাহন করিয়া উষার উত্থান-বাসব ও প্রাতে জগদম্বা-বোধে সাধন করিয়া আমরা আর কিছু পাই বা না পাই—সে যে আমাদের আছে—তাকে যে আমরা এ মোহাবর্ত্তনে মগ্ন হইতে হইতেও ভুলি নাই—এ সত্যটাকে বুকের পরতে পরতে চাপিয়া কতকটা শান্তি কতকটা আশ্বাস লাভ করি—অনির্দ্দেশ্য মায়ের কতকটা নির্দ্দেশ পাইয়া যেন কৃতার্থ হই—প্রাণটা লঘু হয়—আবার যেন মোহাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবার শক্তি ফিরিয়া পাই। হায় যদি সত্যের পূজা করিতে পারিতাম!

যদি সত্য জানিতাম—সত্য মানিতাম—সত্য সত্যই আমার অন্তর্বাহ্যে বিরাজিতা মাকে আমার, সাদরে আত্মসমর্পণ করিতেছি—এটা যদি সত্য হইয়া উঠিত—যদি সত্যবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া এ পূজাকে সত্যের পূজায় পরিণত করিতে পারিতাম—যদি এ সাধন অভিযান সত্যলোকাভিমুখে সত্যের অভিযান হইত! যদি ঘটস্থাপনা করিতে গিয়া দেহ-ঘট সংস্থাপিত হইত—যদি প্রতিমায় চক্ষুর্দ্দান করিতে আপনার দিব্যচক্ষুঃ উন্মেষিত হইত—যদি প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইতাম—তবে কি এ ঋষির ভূমি আবার ঋষিময় হইত না—এ বেদ-পীঠ আত্মবেদনে সম্বেদিত থাকিত না—এই ঋষির বংশধরেরা সত্য সত্যই আবার উচ্চকণ্ঠে সপ্তলোককে শুনাইয়া বলিয়া উঠিত না—"শৃণ্বন্তু-বিশ্বা অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানী দিব্যানি তস্থে—বেদাহং এতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" সেদিন কি আর আসিবে না?

আসিবে! যদি একজনও জাগে—তবে সে দশকে জাগাইবে—দশ শতকে জাগাইবে—শত সহস্রকে লক্ষকে উদ্বোধিত করিবে—সত্য মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া তড়িৎ মেখলার ন্যায় দিক্‌প্রান্ত ঝলসিয়া দিবে। বিদ্যুৎ যেমন সমস্ত আকাশে আছে মধ্যে মধ্যে ঝলসিয়া উঠিয়া স্বীয় অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দেয়—তেমনই সর্ব্বব্যাপিনী মা আমার মধ্যে মধ্যে ঝলসিয়া উঠিয়া—আবির্ভূতা হইয়া আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূতা হইবেন। শুধু যদি আমরা সত্য-বোধে উদ্বোধিত হইয়া মায়ের বোধন করি—সত্যের মাকে সত্যের প্রাণ দিয়া মা বলিয়া উঠি—সত্য সত্য যদি আমাদের আত্মা কাঁদিয়া উঠে—"আবিরাবির্ম্ম এধি।"

তাই আশায় বুক বাঁধিয়া বলি—হোক মৃত

হোক চৈতন্যহীন হোক মিথ্যা হোক রঙ্গাভিনয় —তবু এ পূজা ছাড়িও না—এ পূজার আয়োজনে কুণ্ঠিত হইও না—শাব্দিক ব্রহ্ম-জ্ঞানের মোহে পড়িয়া 'বাহ্যপূজাধমাধমঃ' বলিয়া উদ্ভট ঘোষণা করিয়া অন্ধকার বাড়াইয়া দিও না। তোমাদিগকে মিনতি করি, মায়ের আমার পূজার আয়োজন হেলায় অশ্রদ্ধায় যেমন করিয়া পার করিয়া যাও—করিয়া যাও। বেহুলা যেমন স্বামীর মৃতদেহ আগলাইয়া জলধি তরঙ্গে ভাসিয়াছিল, সাবিত্রী যেমন মৃত স্বামী ক্রোড়ে লইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল—তেমনই করিয়া আগলাইয়া বসিয়া থাক, দিন আসিবে গুরু মিলিবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে মন্ত্র চৈতন্যময় হইবে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইবে মা আমার ঠিক্ মায়ের মত আসিয়াই তোমাদের বুকের ব্যথা মুছিয়া দিবে।

তবে শুধু নিষ্ঠার প্রয়োজন—নিষ্ঠার অনুশীলনের প্রয়োজন। অনুশীলন বা তপস্যা ভিন্ন কোন সত্য সজীব কার্য্যকরী হয় না। গলিত-কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে অঙ্কে লইয়া ব্রাহ্মণপত্নী নিশার অন্ধকারে যখন শূলাবিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মাণ্ডব্য ঋষির উপরে অজ্ঞাতে পড়িয়া তাঁহার সমাধিচ্যুতি ঘটায়, তখন তিনি সতীকে 'নিশা প্রভাতে বিধবা হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, সতীর শত অনুরোধ যখন বিফল হইয়া ছিল তাহার তখনকার কথা স্মরণ কর—"এ রজনী প্রভাত হইবে না"। মাণ্ডব্য ঋষি ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে ব্রহ্মজ্ঞানহীনা ব্রাহ্মণীর বাক্যে বস্তুতঃই রজনী প্রভাত হয় নাই? সেই নিষ্ঠা—তপস্যার অনুশীলনে চৈতন্যময়ী সজীব নিষ্ঠা। সাধারণ স্ত্রীলোকেরাও স্বামীকে স্বামী বলিয়াই সেবা করে ও একনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের বাক্য এরূপ অব্যর্থ হয় না কেন? নিষ্ঠা আছে তপস্যা নাই নিষ্ঠার অনুশীলন নাই। এই নিষ্ঠার অনুশীলনের প্রচেষ্টাই সত্যপ্রতিষ্ঠা করা। যাহা সত্য জানি তাহা সজীব করা চৈতন্যময় করা। আর মাতৃ-সাধনায় এই অনুশীলনই বার বার তাঁহার এ পূজা ব্যবস্থার অন্যতম কারণ। যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহা শুধু জানিয়া ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সেই সত্যানুসারে কর্ম্মময় হইলে তবে তাহা সজীব হইবে। যদি জান মা আছে যদি জান আমাদের আত্মা আছে, তবে সে অস্তিত্ব-জ্ঞানের অনুশীলন কর, তপস্যা কর তবে মায়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে—তাহার দর্শন পাইবে। সেই অনুশীলনের বিশিষ্ট ঘন বিকাশই এ পূজা পদ্ধতি। ইহা কি তোমরা সাদরে ধরিয়া থাকিবে না?

মতি ঘোষের মহাপ্রয়াণ।

(জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ)

জাতীয় দলের মুখপত্র, বিশ্ববিখ্যাত "অমৃত-বাজার" পত্রিকার সুযোগ্য কর্ণধার মতিঘোষ ইহলোকে নাই গত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার মতি ঘোষের দেহান্ত হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। সে হিসাবে এখনকার কালে তাঁহার মৃত্যু অকাল মৃত্যু বলা যায় না। তবে মতিঘোষের মৃত্যুতে দেশের—সমাজের—জাতির —বঙ্গবাসীর তথা ভারতের যে সমূহ ক্ষতি হইল সে ক্ষতি পূরণ হইবার নয়—তাই আজ তাঁহার মৃত্যু অকাল মৃত্যু এবং ইহাতে সমগ্র দেশবাসী এক পরম আত্মীয়ের অকাল মৃত্যু বোধে ব্যথিত, মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ। মতি বাবুর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না। তিনি জীবনের অধিকাংশ দিনই নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই অসুস্থ শরীর তাঁহার দেশসেবার, তাঁহার কর্ত্তব্য-সাধনার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। তিনি কখনই অসুস্থ শরীরের "অজুহাতে" কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি যে এক বিশাল প্রাণ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে এ শরীর-নিবন্ধন বাধা বিঘ্ন অবাধে অতিক্রম করিতে সক্ষম করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিদিনের অনুষ্ঠেয় কার্য্যাবলীর হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় তিনি কত বড় দেশসেবক ও কর্ম্মী ছিলেন—প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া একটু ভ্রমণ করিবেন, তারপর মাত্র স্নান আহারের জন্য কিছু সময় ক্ষেপণ করিয়া সমস্ত দিনই প্রচলিত সংবাদ পত্রাদি পঠন ও অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখন বিষয়েই নিযুক্ত থাকিতেন। আহারান্তে বিশ্রাম লওয়াও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। আমরা কয়জনে এইভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে পারি? মাত্র এদিক হইতে দেখিলেও মতি বাবুর জীবন—আদর্শ জীবন। মতিবাবু অসুস্থতা নিবন্ধন তথাকথিত উচ্চ শিক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তিনি বি-এ, এম্-এ, উপাধিধারী ছিলেন না। ফাষ্ট আর্টস্ মাত্র পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই এফ্-এ ফেল মতি বাবুর ইংরাজী পড়িতে বি-এ, এম্-এ উপাধিধারী কৃতবিদ্য বহু জনে উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা" বাস্তবিকই

তাঁহার হাতে অমৃত বর্ষণ করিত। "পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ পড়িলেই পত্রিকার দাম উঠিয়া যায়"—ইহা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। মতিবাবু—এফ-এ ফেল মতিবাবু কেমন করিয়া এমন মিঠে ইংরাজী লিখিতে শিখিলেন?— মতিবাবু কর্ম্মী, সাধক—সাধকের পক্ষে সবই সম্ভব। আবার মতিঘোষের চরিত্রও আদর্শ চরিত্র। "পত্রিকার" নির্ভীক সম্পাদক, মতি বাবুর মত নিরীহ প্রকৃতির লোক অতি বিরল। এ সম্পর্কে আর একজন মহাত্মার কথা মনে পড়ে। তিনি আমাদের স্বর্গীয় গুরুদাস বাবু। যে মতিবাবুর তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতায় বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিজেদের বিপন্ন বলিয়া মনে করিত এবং যাহাকে দমন করিবার জন্য আমাদের আমলাতন্ত্রও বহুবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন, সেই মতিবাবুর নিকট একজন দুঃস্থ কেরাণীও নিজের উৎপীড়ন কাহিনী বিবৃত করিয়া দুঃখভার লাঘব করিত এবং করুণহৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ মতি বাবুও তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া অন্যায়ের প্রতীকার কল্পে আপনার অদম্য লেখনী পরিচালনা করিতেন। তাই মতিবাবু দুঃস্থ কেরাণীর বন্ধু, অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়িতের বন্ধু। মতি প্রকৃতই খাঁটি "মতি"—বুঝি বা "অমৃত-বাজার" ভিন্ন কোন বাজারেই এ 'মতি' মিলিত না। মতিবাবু আচার ব্যবহারে পোষাক পরিচ্ছদে খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। অনেক "সাহেব সুবো" তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। অতবড একটা কাগজের সম্পাদককেও অনেকের কাছে মান বজায় করিতে হইত কিন্তু কখনই তাঁহাকে সাহেবী পোষাকে বা "বাবু" সাজে সজ্জিত হইতে দেখা যায় নাই। এ দেশের পোষাক পরিচ্ছদ যে এদেশের জল হাওয়ার উপযোগী—এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ অনেক পদস্থ রাজপ্রতিনিধিকেও বিস্মিত করিতেন এবং তাঁহাদেরও এ দেশী পরিচ্ছদ গ্রহণে মতি দিতেন।

পত্রিকা সম্পাদনের গুরুভার মস্তকে লইয়াও মতিবাবু সঙ্গীত চর্চ্চা করিবার অবসর পাইতেন এবং "টপ্পা ভাঁজা" না হইয়া ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মতিবাবুর ধর্ম্ম জীবনও খুব উন্নত ছিল। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

যাও মতি! অনন্তধামে, তবে দেখিও তোমার দেশবাসী যেন মতিহীন না হয়।

রঘুর দিগ্বিজয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে সেন]

যদিও তাহারা দেহে ধরে হেন বল,
অনায়াসে করে ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল। ৪৮
দক্ষিণ বিষম দিক্, সঞ্চরণে তা'য়,
রবিরো প্রবল তেজ মন্দ ভাব পায় ;
কিন্তু আজি সেই দিকে হইল অক্ষম,
পাণ্ড্য গণ সহিবারে রঘুর বিক্রম। ৪৯
তাম্রপর্ণী সহ যথা সাগর সঙ্গত,
মুক্তা সার তথাকার যা' ছিল সঞ্চিত,
নিপতিত হ'য়ে তা'রা কৈল তাঁরে দান,
স্বকীয় বিমল যশঃ-রাশির সমান। ৫০
চন্দনে শোভিত শৈল দর্দ্দুর মলয়
দিক-সুন্দরীর সেই যেন কুচ-দ্বয়,
আরাম লভিয়া তথা অসহ্য-বিক্রম,
সহ্য-গিরি করিছেন সুখে অতিক্রম ;
সমুদ্র সুদূরে সরি' মুক্ত করে তা'য়,
বিবসনা মেদিনীর নিতম্বের প্রায়। ৫১, ৫২
অপরান্ত জয়ে কিন্তু উদ্যত যেমন,
সেনা তাঁ'র সে ভূভাগ করে আবরণ,
বাম-অস্ত্রে উৎসারিত অর্ণব আবার,
আসি' যেন সে প্রদেশ করে অধিকার। ৫৩
হেরিয়া বিপুল সেনা করে আগমন,
কেবলি রমণীগণ দেয় পলায়ন .
তরাসে কাতরা আহা প্রসাধনে হীনা
তাই সেই রঘুরাজ করেন যোজনা,
চমূ-রেণু কুঙ্কুমের প্রতিনিধি মত,
সুন্দরীগণের অই কেশদামে যত। ৫৪
এদিকে মুরলা তীরে কেতকী-কানন ;
তথাকার পুষ্প-রেণু আনি' সমীরণ,
সৈনিকগণের তাঁর অঙ্গ-বাস যত,
তাদের প্রযত্ন বিনা করে বাসযুত। ৫৫
তালীবন কম্পমান করে নভস্থান্
হইতেছে মর্ মর্ শব্দ সুমহান্,
কবচ ভূষণে কিন্তু বাজী গণ ধায়,
শিঞ্জনে পর্ণের ধ্বনি পরাভব দায়। ৫৬
বদ্ধ যত খর্জ্জুরীর স্কন্ধে রথী গণ,
কটেছে ক্ষরিত মনে গন্ধ সুমোহন,

৫০। তাম্রপর্ণী কর্ণাট দেশস্থ নদী।

৫৩। অপরান্ত—পশ্চিম দিক্। রাম—পরশুরাম।
৫৫। কেরল—মালবার।

আসিতেছে অলি কুল আঘ্রাণে তাহার,
নাগ কেশরের ফুল করি পরিহার। ৫৭
সমুদ্র যে জামদগ্ন্যে স্থান দিলে দানে,
সে কেবল সে বীরের প্রার্থনা শ্রবণে;
রঘুবীরে দিল কর সভয় অন্তরে,
উপকূল বর্ত্তি রাষ্ট্র পাল রূপ ধরে। ৫৮
উচ্চে যে দশন যোগে মত্ত গজ গণ,
ত্রিকূটের অঙ্গে করে অঙ্কের খোদন,
বিক্রম বর্ণিতে তাঁর বর্ণ তা'রা হয়;
অচল, অটল যেন জয়স্তম্ভ রয়। ৫৯
পারসীক গণে পরে করিবারে জয়,
গতি দৃঢ় স্থল পথ করিয়া আশ্রয়;
পরম তত্ত্বের জ্ঞান বর্ত্ম হরি সার,
ইন্দ্রিয় রিপুর গণে যোগী যে প্রকার। ৬০
বালাতপে কমনীয় যেমন কমল,
মধুরাগে যবনীর বদন কমল;
অকালের মেঘ রঘু হইল উদয়
আহা সেই সুরাগের করিল যে ক্ষয়। ৬১
তথায় তুমুল রণ যবনের সনে;
সবে করে আগমন হয় আরোহণে,
ধূলি তুলি রণস্থল অন্ধকারে ছায়,
ধনুর টঙ্কারে বোধ যোদ্ধা কে কোথায়। ৬২
ভল্ল অস্ত্রে তাদে রঘু করিল হনন,
আবরিল মহীতল মুণ্ডে অগণন;
শিরোদেশ হীন কেশ শ্মশ্রু সুবিপুল,
যেন সব মধুক্রম মক্ষিকা সঙ্কুল। ৬৩
রহে যারা শিরস্ত্রাণ করিয়া মোচন,
সবিনয়ে বিজেতার লইছে শরণ,
ত্যজিয়া উদ্ধত ভাব অবনত হ'লে,
মহাত্মার রোষ হ'তে পরিত্রাণ মিলে। ৬৪
তথায় দ্রাক্ষার লতাবাটিকায় পশি,
সুচিকণ পশুলোম আস্তরণে বসি
দ্রাক্ষা মধু সেবা করি সংগ্রামের শ্রম,
রঘু যোধগণ কিবা করে উপশম। ৬৫
করজালে রস যথা রবি অংশুমান,
দুর্ব্বিষহ শর জালে রঘু তেজীয়ান্

৫৮। জামদগ্ন্য=পরশুরাম।

৫৯। এই শ্লোকের ত্রিকূট পর্ব্বত পশ্চিম সাগরের উত্তর পূর্ব্বে। উহা রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কার ত্রিকূট পর্ব্বত হইতে ভিন্ন।

৬০। যবন ভূমি পারস্যের উল্লেখ হইতেছে; সিন্ধুনদ সেবিত ভূভাগ অজানিত রহিয়া গেল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ সর্গান্তে হইবে।

৬৩। ভল্ল=মৃহীদল-তুল্য-ফলক যন্ত্র। হরিবংশে বর্ণিত আছে যে সগর রাজা যবন ও কাম্বোজদিগের শিরোদেশ অর্দ্ধাংশে মুণ্ডিত করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেন।

৬৫। পারস্যে নির্ম্মিত পশুলোম-জাত সুন্দর আস্তরণ গালিচা নামে প্রসিদ্ধ।

'উদীচ্য মেদিনী পাল গণের উদ্ধারে
কুবেরাধিষ্ঠিত দিকে গতি তদা করে। ৬৬
সিন্ধুনদ তীরে তাঁর তুরঙ্গম গণ,
করিবারে ভ্রমণের শ্রম প্রশমন,
গড়াগড়ি দিয়া উঠি অঙ্গ অই ঝাড়ে;
কুঙ্কুম কেশর লগ্ন হয়েছিল পড়ে। ৬৭
সেই সে উত্তর ভাগে ব্যক্ত হ'ল রণে
রঘুর বিক্রম যদি হূণ ক্ষত্র গণে,
অবরোধে সুন্দরীরা গণ্ডে হানে কর,
কপো'লে পাটল ভাব ধরে অতঃ পর। ৬৮
সমরে কাম্বোজ গণ বীরপণা তার,
অক্ষোট পাদপ গণ গজবন্ধ ভার,
সহিবারে শক্তি হীন উভয়ে সমান,
হইতেছে উভয়েই সম নমমান। ৬৯
উচ্চ কনকের স্তূপ বিনা সংখ্যা মান,
বহুল সুন্দর করি বাজী তেজীয়ান,
উপহার উপনীত রঘুর সকাশে,
গর্ব্ব কিন্তু সে সবার সঙ্গে নাহি আসে। ৭০

অতঃপর অশ্বগণে করিয়া সাধন
পার্ব্বতীর পিতৃ শৈল করে আরোহণ;
খুরাঘাতে ধাতু রেণু হয় সমুত্থিত
শিখর সকল যেন করে বিবর্দ্ধিত। ৭১
শুনিয়া—গর্জ্জন করি সৈন্যগণ চলে—
সিংহ যত গুহাশায়ী, তুল্য সব বলে,
নিরখিছে গ্রীবামাত্র করি, উত্তোলন,
নহে কেহ অণুমাত্র বিচলিত মন। ৭২
তুলিয়া মর্ম্মর রব ভূর্জ্জতরু-বনে,
করিয়া শব্দায়মান কীচকের গণে,
গঙ্গার শীকর আনি, সমীরণ কিবা,
পথে যেতে রঘুবীরে করিতেছে সেবা। ৭৩
মৃগগণ নমেরুর শীতল ছায়ায়,
নাভি গন্ধে সুবাসিত রেখেছে শিলায়;
কৌতুকে সে শিলাতলে সৈনিকেরা বসে;
পথজাত পরিশ্রম সহজেতে নাশে। ৭৪
জ্যোতির্লতা চারিদিকে দীপ্ত নিশাকালে;
শাল-লগ্ন করীদের কণ্ঠের শৃঙ্খলে,
স্ফুরিত তাহার রুচি হ'তেছে আবার,
রঘুর দীপের কার্য্য সাধে চমৎকার। ৭৫

৬৭। এই শ্লোকের সিন্ধুনদের তীর ভাগ কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম সীমার বাহিরে।

কুঙ্কুম—কাশ্মীর প্রান্তের উৎকৃষ্ট কুসুম ফুল।

৬৮। হূণ রমণীরা বক্ষ ও কপাল দেশ তাড়ন করিয়া রোদন করে।

৬৯। অক্ষোট—আকরোট।

৭১। পার্ব্বতীর পিতৃশৈল—হিমালয় পর্ব্বত।

৭৩। রঘু সৈন্য এখন গঙ্গোত্রীর উত্তর দেশে।

দ্রাক্ষালতা-বাটিকা=আঙ্গুর ক্ষেত্র।

৭৫। জ্যোতির্লতা বৈদিক যুগের বস্তু। (বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদ-বিভাগের পূর্ব্ব পর্যন্ত বৈদিক যুগ।) অনেক পুরাতন জন্তুর ও পুরাতন উদ্ভিদের লোপ হইয়াছে।

ছাউনী তুলিয়া গেছে সৈনিকেরা চ'লে,
তথাপি কিরাতগণে দেবদারু বলে,
গলরজ্জু-ক্ষত ত্বকে করিয়া ধারণ,
উন্নত কেমন ছিল রঘুগজ গণ। ৭৬
রহে তথা সপ্ত যেই পর্ব্বতীয় জাতি
সংগ্রাম রঘুর সনে করে ঘোর অতি ;
ভিন্দিপাল নারাচ পাষাণ খণ্ড যত,
নিষ্পেষণে পরস্পর বহ্নি উৎপতিত। ৭৭
লঘু করে রঘু শর ঘন বরষণে,
নিরুৎসব কৈল যদি উৎসবাদিগণে,
কিন্নর তথায় যারা করে অধিষ্ঠান
বলবীর্য্য বিষয়ক ধরে তাঁর গান। ৭৮
বিবিধ বিচিত্র চারু চিত্ত-বিমোহন
তত্র জাত দ্রব্য যত আসে উপায়ন ;
হিমাদ্রির সার ইথে বুঝে মহাশয়,
যেমন তাঁহার সার বুঝে হিমালয়। ৭৯
দীপ্যমান যশোরাশি তথা নিবেশিয়া,
হিমগিরি হইতেই আসেন নামিয়া,
কৈলাস শৈলেরে যেন লজ্জা কৈল দান,
পূর্ব্বে লুপ্ত পৌলস্ত্যের হস্তে তা'র মান। ৮০

পঁহুছেন যেই তিনি লৌহিত্যার পারে
প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ-পতি কাঁপে থরথরে ;
কম্পমান অগুরুর যথা তরুগণ,
করে যাহে দিগ্বিজয়ী গজের বন্ধন। ৮১
পথেতে রথের সারি আসিছে রঘুর,
উঠিছে ধূলার রাশি তাহাতে প্রচুর,
দিনমণি রুদ্ধ তায় এ হেন দুর্দ্দিন
সহিতে নারে সে রাজা ধারাবর্ষ হীন.
কেমনে উপায় তবে করিতে সে পারে
সেনাদের অস্ত্রপাত তাঁর সহিবারে ? ৮২
অতীন্দ্র-বিক্রম যাঁর করিছে সম্মান
কামরূপ-পতি করি মত্তকরী দান ;
অমিত সাহস-শক্তি সাহায্যে যাদের
ঘটাইত পরাভব অন্য নৃপদের। ৮৩
হেমপীঠে শ্রীরঘুর পদছায়া রাজে
রতন-প্রসূন ভারে তাহে পুনঃ পূজে। ৮৪
এ প্রকারে চারিদিক পরাজয় করি,
রাজাদের ছত্রহীন কিরীট-উপরি,
রথ-উত্থাপিত রজঃ করায়ে বিশ্রাম,
জয়কার্য্যে রঘুবীর দিলেন বিরাম ৮৫

৭৬। কিরাত—বনচর ভিন্ন জাতি।

৭৮। উৎসব সঙ্কেত প্রভৃতি পর্ব্বতীয় জাতিগণের নাম। কিন্নর—কোন জাতি।

৭৯। উপায়ন-উপঢৌকন।

৮০। পৌলস্ত্য-রাবণ পূর্ব্বে রাবণের হস্তে কৈ পর্ব্বতের নিগ্রহ হইয়াছিল।

৮১। অগুরু বৃক্ষের কাষ্ঠ ধূপের একটী উপকরণ।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞ তদা হয় অনুষ্ঠান,
দক্ষিণা-স্বরূপে যাতে সর্ব্বস্বের দান ;
সাধুগণ ব্যবহারে মেঘ-ভাব ধরে,
অর্জ্জন তাঁদের শুধু বিসর্জ্জন-তরে। ৮৬

যজ্ঞ সমাপনে জিত রাজগণে
সচিবেরা করে পূজা,
পরাভব জাত মনঃ ক্ষোভ যত
যোগদানে নাশে রাজা।
ফিরায় স্বপুরে পুনঃ প্রীতিভরে,
অবরোধে নারী যা'রা,
দীর্ঘকাল ধ'রে অদর্শন তরে
উৎসুক রহেছে তা'রা। ৮৭

ধ্বজ-বজ্র-ছত্র অঙ্কিত বিচিত্র
সম্রাট-চরণ হেন,
প্রস্থান-প্রণতি করিছে যেমতি
তাহাতে নৃপতি গণ,
শিরে সবাকার কুসুমের হার
শোভে যা, তা' হ'তে ক্ষরে,
রেণু মকরন্দ অঙ্গুলির বৃন্দ
গৌরবর্ণ কিবা করে। ৮৮

৮৮। মকরন্দ-পুষ্পরস।

ইতি শ্রীকালিদাস-বিরচিত রঘুবংশ কাব্য দর্শনাৎ বশিষ্ঠ-শক্তি পরাসর প্রবরভূত কুলোৎপন্ন শ্রীকিশোরিমোহন চৌবেসেন-কৃতে বঙ্গ-রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

শুক্রনীতি-সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব কর্ত্তৃক অনূদিত]

যে রাজা বিচারপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহার অর্থ সামান্য হইলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে রাজা অমিত-শৌর্য্যান্বিত, নীতিজ্ঞ, ধনবান তাঁহার নিকট পশুপক্ষীও বশীভূত হইয়া থাকে—মনুষ্যের তো কথাই নাই॥২৮॥

তপস্যা ত্রিবিধ :—সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক। যে রাজা এই ত্রিবিধ তপস্যার মধ্যে যেরূপ তপস্যা আচরণ করিয়াছেন, তিনি তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন নৃপতি হইবেন। অর্থাৎ যিনি সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট তপঃ আচরণ করিয়াছেন, তিনি উত্তম

নৃপতি ; যিনি রজোগুণান্বিত তপস্যা করিয়াছেন, তিনি মধ্যম নৃপতি এবং যিনি তমোগুণবিশিষ্ট তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তিনি অধম নৃপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

সাত্ত্বিকাদি নৃপতির লক্ষণ যথা ;—যে রাজা প্রকৃত রাজধর্ম্মপালনে তৎপর, প্রজাপালক, অশ্বমেধাদি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, শত্রুসমূহেরও শাস্তা, বহুদানশীল, ক্ষমাবান, বীর্য্যসম্পন্ন, এবং বিষয় সমূহে স্পৃহাশূন্য তিনিই সাত্ত্বিক নৃপতি। অন্তে তিনিই মোক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৩০—৩১ ॥ যে রাজা উপরি কথিত রাজগুণের ঠিক বিপরীত গুণাবলম্বী অর্থাৎ যিনি রাজধর্ম্ম-পালন করেন না যিনি প্রজা-শোষক, যজ্ঞানুষ্ঠানে উদাসীন, নীতিহীন, কৃপণ, নির্দ্দয়, মদ্যাদি পানজনিত বিকারে বিকৃত, গর্ব্বোন্মত্ত, হিংসক,সত্য-বর্জ্জিত, তিনিই তামসিক নৃপতি—অন্তে তাঁহার নরকে গতি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ যে রাজা দাম্ভিক, লোভী বিষয়াসক্ত, বঞ্চক ও ধূর্ত্ত এবং যাহার মনে এক প্রকার বাক্যে আর এক প্রকার কার্য্যে অন্য প্রকার, যিনি কলহপ্রিয়, দুর্জ্জনরত (যাঁহার বন্ধুতা নীচ ব্যক্তির সহিত), স্বেচ্ছাচারী, নীতিবর্জ্জিত এবং কপটাচারী, তিনি রজোগুণসম্পন্ন নৃপতি এই রাজার অন্তে পশ্বাদি যোনিতে অথবা স্থাবরত্বে (বৃক্ষাদিরূপে) গতি হয়। অর্থাৎ পরজীবনে হয় পশু নয় বৃক্ষাদিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হয় ॥ ৩৩—৩৪ ॥

যাঁহারা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী তাঁহারা দেবাংশ ভোগ করেন। যাঁহারা তমোগুণান্বিত, তাঁহারা রাক্ষসভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। এবং যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী তাঁহারা মানবের ভোগ্যবস্তু সকল প্রাপ্ত হয়েন অতএব সত্ত্বগুণের সেবা করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ এই উভয়বিধ গুণ যাঁহাদের শরীরে বর্ত্তমান, তাঁহাবা মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়েন। (রজোগুণের সেবাতে মনুষ্যত্ব হয় এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের সংমিশ্রণেও মনুষ্যত্ব লাভ হয়)। অতএব মনুষ্যগণ এই ত্রিবিধগুণের মধ্যে যে গুণের সেবা করিয়া থাকেন, তদনুরূপ ভাগ্য-কর্ম্মাদিও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

সুখ ও দুঃখ অথবা সুগতি ও দুর্গতির একমাত্র কারণ—কর্ম্ম। আচরিত কর্ম্মই আবার প্রাক্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না অতএব মানুষ যখন গুণানুসারে কর্ম্ম করিয়া নিজেই নিজের বিধাতা হয়েন, তখন সত্ত্বগুণের সেবা করাই কর্ত্তব্য ॥৩৭॥

এই সংসারে জাতিতে কেহ কখনও ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ নহেন। গুণ-কর্ম্মেই একমাত্র জাতিভেদ ঘটাইয়া দেয়। অর্থাৎ সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণে ক্ষত্রিয় রজোগুণে বৈশ্য, রজস্তমোগুণে শূদ্র এবং তমোগুণে ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হয়॥৩৮॥ বর্ণ অথবা জনক হইতে কেহ জাতি হইতে পারেন না। যদি এইরূপই হইত, তাহা হইলে সকল জাতিই ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। অতএব স্বীয় অধ্যবসায় ব্যতীত ব্রহ্ম তেজ কখনও লাভ করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মতেজ কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়? তাহা বলিতে-ছেন;—যিনি জ্ঞানের এবং কর্ম্মসমূহের অনুশীলন ও অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মানন্দতৎপর হয়েন, যিনি শান্ত (জিতেন্দ্রিয়) সংযমী এবং দয়াবান্—তিনিই ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ॥৩৯—৪০॥

অতঃপর ক্ষত্রিয়াদির লক্ষণ কথিত হই-তেছে;—যিনি লোক সমূহের রক্ষা বিষয়ে দক্ষ, বলবান, জিতেন্দ্রিয়, প্রতাপশালী, দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ-করণে সক্ষম, তিনিই ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়েন॥৪১॥ যাঁহারা ক্রয় বিক্রয়ে দক্ষ, নিত্যই পণ্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, এবং যাঁহারা পশুরক্ষা ও কৃষিকার্য্যে রত, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হয়েন॥৪২॥ যাঁহারা দ্বিজগণের সেবা ও অর্চ্চনা-দিতে নিরত, বলবান, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, লাঙ্গল কাষ্ঠ ও তৃণ বহনশীল, তাহারাই এই জগতে শূদ্র বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন॥৪৩॥ যাহারা ধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করিয়া নির্দ্দয়, পরপীড়ক, উগ্র-স্বভাব, সর্ব্বদা হিংসাশীল, এবং বিবেকরহিত (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানবর্জ্জিত এবং যথেচ্ছাচারী) তাহারাই ম্লেচ্ছ নামে আখ্যাত হয়॥৪৪॥

মনুষ্য সমূহের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ-বিধায়িনী বুদ্ধি আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। তাহা না হইলে মনুষ্য পাপকর্ম্ম অথবা পুণ্য কর্ম্ম কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হইত না। অর্থাৎ দৈবের অধীনতা বশতই কেহবা পাপকর্ম্মে কেহবা পুণ্যকর্ম্মে রত হইয়া থাকেন॥৪৫॥ মনুষ্যগণের প্রাক্তন-জন্মার্জ্জিত যেমন কর্ম্মের উদয় হয় অর্থাৎ যেরূপ দৈব আসিয়া মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়, বুদ্ধিও তাহার উপযুক্ত হয়। এবং নিয়তির অনুরূপ সহায় ও মানুষ আপনা হইতেই পাইয়া থাকেন॥৪৬॥

এ জীবনে যাহা শুভাশুভ ফলরূপে মনুষ্যগণ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যদি নিয়তি-প্রেরি-তই হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধক উপদেশাবলী ও নীতিশাস্ত্রাদি ব্যর্থ হইয়া যায়। অর্থাৎ কেবলমাত্র দৈবকে বলবান বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে 'পুরুষকার' বলিয়া যে ব্যাপার, তাহার

কোন মূল্যই থাকে না ॥৪৭॥ যাঁহারা বুদ্ধিমান, যাঁহাদের চরিত্র পূজাহ, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন আর যাঁহারা ক্লীব। —উপযুক্ত পৌরুষ প্রয়োগে অসমর্থ, তাঁহারাই জড়ভাবে দৈবের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৪৮॥

ক্রমশঃ

ভ্রান্তি।

(গল্প)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

একটী নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সুহাস ভাবিতেছিল, "কত আশা ক'রেছিনুম শোভাকে নিজের মনের মত ক'রে গড়ে তুলব। নিজের চেয়েও তাকে বেশী ভালবাসব! আমি তাকে যত ভালবাসি সে ত আমায় তত ভালবাসে না। তার হৃদয়ে কি আমার স্থান নেই? আমি কি তার অযোগ্য?"

এমন সময়ে একটী রেকাবীতে খাবার লইয়া শোভা সুহাসের নিকট আসিয়া বলিল, "মা এই জলখাবার দিলেন, খেয়ে নাও।" আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। সুহাস আপন মনে বলিয়া উঠিল, "এত ভালবাসার এই প্রতিদান।" কিছুক্ষণ পরে এক গ্লাস জল ও এক ডিবা পান লইয়া শোভা পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সুহাস খাবার একেবারেই স্পর্শ করে নাই দেখিয়া বলিল, "এখন খাওনি? আজ কি শরীর খারাপ হয়েছে?" সুহাস উদাস ভাবে জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "নাঃ।" শোভা সুহাসের উদাস ভাব দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়া বলিল, "তবে খেলে না যে?" সুহাস সেই ভাবেই বলিল, "আজ ক্ষিদে নেই।" "তবে দুটো পান খেয়ে একটু বেড়িয়ে এস," বলিয়া শোভা টেবিলের উপর পানের ডিবা রাখিয়া চলিয়া গেল। যে দ্বার দিয়া শোভা বাহির হইয়া গেল সেইদিকে চাহিয়া সুহাস মনে মনে বলিল, "এরই নাম কি ভালবাসা?" সুহাস আশা করিয়াছিল—শোভা আরও কিছুক্ষণ তাহার নিকট থাকিবে, আরও কত কি কথা কহিবে। একটী পুস্তক লইয়া সুহাস পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। এখানা সেখানা করিয়া অনেক পুস্তকের পাতা উল্টাইল কিন্তু একখানিও মনোযোগের সহিত পাঠ

করিতে পারিল না। শোভা কিন্তু স্থির হইতে পারিল না। সুহাসের এ ভাব সে আজ ক'দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছে। ইহার জন্য সে নির্জ্জনে অনেক অশ্রু বিসর্জ্জনও করিয়াছিল। কক্ষের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল, "এখন বেড়াতে যাওনি? একটু বেড়িয়ে এস না, শরীরটা হালকা হয়ে যাবে।" সুহাস শোভার হাত ধরিয়া বলিল, "একটু ব'স তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।" শোভা বলিল, "এখন কি বলবার সময়? যা বলবার অন্য সময়ে ব'লো।" সুহাস কিছু না বলিয়া শুধু শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শোভা একটু হাসিয়া বলিল, "কি দেখচ? ছাড়; সংসারের এখন অনেক কাজ পড়ে আছে।" সুহাস বলিল, "কিসের কাজ! তোমায় কাজ কত্তে হবে না।" শোভা সেইরূপ ভাবেই হাসিয়া বলিল, "তাত বটেই—কিসের কাজ! সংসারের কাজ না ক'রে দুজনে মুখোমুখী করে বসে থাক্‌লেই বুঝি পেট ভ'রে যাবে—না?" সুহাস বলিল. "তোমায় দেখলেই ত আমার পেট ভরে যায় শোভা। একটু না হয় আমার কাছে বসলেই; তাতে কোন দোষ আছে কি?" শোভা বলিল, উনুনে মাছ বসিয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে; ছাড়।" সুহাস জিজ্ঞাসা করিল. "মা কি করচেন?" শোভা উত্তর করিল. "কুটনো কুটচেন।" সুহাস বলিল, "তিনিই মাছ দেখ্‌বেন্‌-খন্‌। তুমি একটু আমার কাছে বস।" "তা কি হয়" বলিয়া শোভা ধীরে ধীরে সুহাসের হাত সরাইয়া চলিয়া গেল। সুহাস একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল মাত্র।

(২)

ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে হৃদয়-সাগরে কত রকম ভাবের তরঙ্গ উঠে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। আজন্মকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া দুঃখ কাহাকে বলে সুহাস জানিত না। সে মনে করিত পৃথিবীতে সকলেই তাহার মত সুখী, প্রফুল্ল ও সকলেরই অন্তঃকরণ তাহারই মত সদা আনন্দময়। সুহাসের সংসারে সে এবং তাহার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। কিছুদিন হইল সুহাসের এক পিসী তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আজ দুই দিন হইল তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সুহাস আপন পিসীকে মা বলিয়া ডাকিত। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তিনিই তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। সে 'মা' বলিয়া ডাকিত বলিয়া তাহার স্ত্রী শোভাও মা বলিত।

সুহাসের বিশ্বাস, শোভা তাহাকে ভালবাসে

না—অন্ততঃ সুহাস যতটা ভালবাসে ততটা নহে। এই ভ্রান্তিই হইয়াছিল কাল।

আজন্ম দুঃখের ক্রোড়ে মানুষ হইয়া শোভা সুখ কাহাকে বলে জানিত না। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে সে মাতৃহারা হয়। পিতা পুনরায় দার-পরিগ্রহ করায় শোভার সুখের শেষ ক্ষীণ জ্যোতিটুকুও নির্ব্বাপিত হইল। যাহাদের সৎমা আছে তাহারাই ইহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে;—অবশ্য গোবরেও পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে।

শোভার তের বচ্ছর বয়সে সুহাসের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া শোভার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। এই দীর্ঘ তের বৎসর সে অনেক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই আপনাকে গড়িয়া তুলিয়া ছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শোভারও পিত্রালয় যাওয়া বন্ধ হইল। ইহার কারণ অবশ্য বলাই বাহুল্য।

স্বামিগৃহে আসিয়া সে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবে ভাবিল। মাতৃহারা, পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতা, সৎমা-পিড়ীতা শোভা স্বামীর অগাধ ভালবাসা পাইয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিল, স্বামির প্রেমে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিল—স্বামিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিল।

উভয়ে উভয়কেই ভালবাসিত কিন্তু উভয়ের ভালবাসা ভিন্ন প্রকারের। সুহাস যে শোভাকে ভালবাসিত, তাহা সে প্রতিকথায় ও প্রতি ব্যবহারে জানাইতে চেষ্টা করিত—সে কিছুই গোপন রাখিতে পারিতনা। কিন্তু শোভা—সে স্বভাব-গভীরা, সে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী। তাহার বিশ্বাস প্রেম ও ভালবাসা হৃদয়ের ধন। অতএব উহা যত্ন করিয়া হৃদয়েই গোপন রাখা ভাল। কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া উঠা ভাল নহে।

আপীষ হইতে সুহাসের আসিতে বিলম্ব হইলে শোভা অনিমেষ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত; কিন্তু দূর হইতে সুহাসকে আসিতে দেখিলেই সংসারের কাজ কর্ম্মে নিজেকে ব্যাপৃত করিত। ইহা দেখিয়া সুহাস ভাবিত, শোভা তাহাকে কখনও ভালবাসে না, যদি ভালবাসিত তাহা হইলে তাহার বিলম্ব দেখিয়াও কিরূপে সে একমনে সংসারের কাজ করিতে পারিতেছে। সুহাসের একবার ভীষণ পীড়া হয়; প্রায় সমস্ত ডাক্তারই একরকম শেষ জবাব দ্যায়। সেই সময়ে শোভা তারকেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে "আমার স্বামিকে ফিরিয়ে দাও, আমি বুকচিরে রক্ত দেব।" সুহাস আরোগ্যলাভ করিতেই শোভা তারকেশ্বরে গিয়া বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া আসে। সুহাস তাহাকে তারকেশ্বর যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "ঠাকুর দর্শনে যাচ্ছি।

স্বামির মঙ্গলের জন্য সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যাইতেছে ইহা আর স্বামিকে জানাইয়া তাহাদের লইবার ইচ্ছা শোভার হয় নাই এবং ইহাও সে নিশ্চয় জানিত, বুক চিরিয়া রক্ত দিবার কথা শুনাইলে কখনই সুহাস তাহাকে যাইতে দিত না। কিন্তু প্রেমান্ধ সুহাস মনে করিল, শোভা যদি তাহাকে ভালবাসিত, তাহা হইলে দুর্ব্বল অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া শোভা কখনই ঠাকুর দর্শনে যাইত না। ঠাকুরদর্শনে ত অন্য সময়ে যাইলেই চলিত। কোন কার্য্য বশতঃ সুহাস দেশান্তরে যাইলে শোভা একরকম জলস্পর্শ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিল এবং দিবা রাত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, "হে ভগবান, আমার স্বামী যেন নিরাপদে ফিরে আসেন।" অহোরাত্র তাহার এই প্রার্থনাই ধ্যান হইয়াছিল। কোন স্ত্রীর পক্ষেই ইহা অস্বাভাবিক নহে, যদি সে বাস্তবিক সহধর্ম্মিণী হয়, কেবল মাত্র মন্ত্র পড়া ভার্য্যা না হয়।

সুহাস যখন ফিরিয়া আসিয়া সোহাগ ভরে জিজ্ঞাসা করিবে, "আমার জন্যে তোমার মন কেমন করেনি শোভা? আমার জন্যে খুব ভাবতে?" সুহাস ভাবিয়াছিল শোভা বলিবে, "তা আর ভাবতুম না। এ আবার তুমি জিগেস করচ? আমি ভেবে ভেবে খাওয়া নাওয়া ছেড়ে ছিলাম।" কিন্তু শোভা বলিল, "মন কেমন কর্ব্বে কেন? বেশ খেতুম, বই পড়তুম, শুয়ে থাকতুম।" সুহাস ভাবিল যথার্থই শোভা যদি তাহাকে ভালবাসিত তাহা হইলে কখনই সে এইরূপ উত্তর করিত না।

এই ভ্রান্তিই সুহাসের শান্তি হরণ করিয়াছিল।

দুঃখ কাহাকে বলে সুহাস এত দিনে তাহা জানিল। তাহার যখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, শোভা তাহাকে ভালবাসে না, সে ভাবিল, "তবে আর বাড়ীতে থেকে ফল কি। দেখি যদি বাড়ীর বাহিরে কোথাও শান্তি পাই।" এই বাসনা সুহাসের মনে তীব্র ভাবে জাগিয়া উঠিল। গাছের ফল হাতের কাছে পাইয়া লইতে না পারিলে স্বভাবতঃ মনে হয় যত গাছের দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সুহাসের তাহাই হইল।

সে একদিন আপীস যাইবার নাম করিয়া বাটীর বাহির হইল আর ফিরিল না। একবার ভাবিয়া দেখিল না তাহার অনুপস্থিতে শোভার কি পরিণাম হইতে পারে। সে ভাবিবেই বা কেন? যে তাহার জন্য ভাবে না, সেই বা তাহার জন্য মিছামিছি ভাবিবে কেন।

আগামীবারে সমাপ্য।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী।

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।)

কতরূপে মাগো।
হইয়া উদয়,
মুছাও মোদের
অশুভ কালিমা।
হইয়া কাতর
সুত তরে, কর
কৃপা কত মত
নাহি তার সীমা ॥
অভাবের জ্বালা,
আছে গো জননী
চারিদিকে বেড়
কত শতশত।
তাই বহুরূপে,
আশা বহুবিধ—
মিটাতে, হরষে
ধর রূপ কত ॥
দশভুজারূপ
দেখি' মা তোমার
জ্বালা দশবিধ
গিয়াছে সুদূরে।
দশকরে ধরি
দশ প্রহরণ
দশ দিক হতে
রাখিলি আতুরে ॥
পরে লক্ষ্মীরূপে
আসিয়া নিকটে
অলক্ষ্মী মোদের
করিয়া বিনাশ।
দৈন্য দরিদ্রতা
পূর্ণ হাহাকার
সরাইয়ে, পূর্ণ
করিয়াছ আশ ॥
তারপর, কালী—
করাল বদনা,
ঘোর বিভীষিকা
মাখান মূরতি।
ধরিয়া জননী
নাশিলা সমূলে
পাপ তাপ মৃত্যু
ভীষণ অরাত ॥
এবে জগদ্ধাত্রী।
মরি মরি মরি।
দেখরে এখন
পলক পাসরি।
সিংহস্কন্ধে চাপি
রত্ন বিভূষণে
ভূষিতা জননী
দিক আলো করি ॥
জগত ধরিতে
আসিয়াছ—কি মা
দেখিয়া মোদের
আধার-বিহীন
সাধ মাতৃ-কার্য্য
মনোমত, কিন্তু
মনটুকু পদে
ক'র মা বিলীন।
অর্পিও। মাগো মা,
হাতে কেন ধনুঃ
শর, কেন রাগে
হইলি বিভোর
বড়ই ব্যথিত
হয়েছিস্ কি মা
দেখিয়া সুতের
নয়নের লোর ॥
ভয় করি কারে
তুই নিজে মাগো,
সন্তানের শত্রু
বারিবি যখন।
যা করিবি কর,
তনয়ের কার্য্য—
পূজে সদা মায়ে
করি প্রাণপণ ॥

সকলই মা তোর পূজিব কি দিয়ে
তোর পূজা নিজে কর আয়োজন।
যা বাসিস্ ভাল তোর প্রিয় যাহা
নে মা আমা হতে করি আহরণ॥

আর কিছু আমি চাহি না জগতে,
চাহি মা তোমার শ্রীচরণ সার।
পূজাকালে আসি নিও নিজে পূজা
এ মিনতি তব চরণে আমার॥

ওঁ শান্তিঃ।

ভ্রান্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

স্বামির আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শোভা অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিল "এত বিলম্ব ত কখন হয় না! তবে কি অসুখ করেচে চলে আসতে পাচ্ছেন না?"—ইত্যাদি। আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। রাজপথ দিয়া কত লোকে যাওয়া আসা করিতেছে। শোভা মনে করিল, ঐ বুঝি তাহার স্বামি, পরক্ষণেই তাহার সে ভ্রান্তি দূর হইল, এইরূপে সে অনেক্ষণ বসিয়া রহিল। ক্রমে পথে জনতার হ্রাস হইল আরও একটু পরে নিস্তব্ধতায় পথটী ভরিয়া গেল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল। সমীরণের মৃদুহিল্লোলে শোভার কুঞ্চিত কেশরাশি ধীরে ধীরে উড়িতেছিল। শোভার কোন দিকে লক্ষ্য নাই। সে পলকহীন নেত্রে পথের পানে চাহিয়া রহিল।

৪।

প্রভাত হইল, তখনও সুহাস ফিরিল না দেখিয়া শোভা মনে করিল, বোধ হয় সে কার্য্য-বশতঃ স্থানান্তরে গিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সে শোভাকে সংবাদ না দিয়া কখনও যায় নাই। যাহা হউক শোভা ভাবিল, "বোধ হয়—তিনি খবর দেবার সময় পান নি।"

স্নান করিয়া শোভা ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। গতরাত্রে সে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। আজও এখন কিছু খাইল না। স্বামিকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইবে কিরূপে?

ভাত বাড়িয়া সুহাসের ঠাঁই করিয়া রাখিয়া

দিল। এত অধিক বেলায় বাটী আসিয়া সুহাস নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। সেই জন্য শোভা বাতাস করিবার জন্য পাখা, শয়ন করিবার বিছানা করিয়া রাখিয়া দিল। স্নান করিবার জন্যও তৈল, ঘটী, গামছা প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিল। যাহাতে সে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া কোন কষ্টে না পড়ে। তাহার বিশ্বাস সুহাস অবশ্য ফিরিবে।

কিন্তু বেলা ক্রমেই অধিক হইয়া চলিল, তখনও সুহাসের সম্বাদ নাই। শোভা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; কাহাকে বলিবে কে তাহার কথা শুনিবে। একটা কিছু শব্দ হইলে মনে হয় ঐ বোধহয় সুহাস আসিল। ক্রমে বেলা অবসান প্রায় হইল। এখন পর্য্যন্ত জলস্পর্শ না করায় তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া উঠা সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা করিল, স্বামী ফিরিয়া না আসিলে সে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না। কত কি ভাবিতেছে এমন সময়ে কে দ্বারে আঘাত করিল। শোভা সুহাস আসিয়াছে—ভাবিয়া দ্রুত দ্বার খুলিয়া দিল কিন্তু হায়! সে সুহাস নহে।

পিয়নের হস্ত হইতে পত্র লইয়া শোভার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, আপাদ মস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, পত্রের উপর তাহারই নাম এবং হাতের লেখা সুহাসের। কম্পিত হস্তে পত্র পাঠ করিয়া তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গেল, কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই খানেই পড়িয়া গেল।

পত্রে লেখা ছিল ;—

"শোভা—আমার হৃদয়ের শোভা!

তোমারই মঙ্গলের জন্য আমি গৃহত্যাগী হইয়াছি। আমি প্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসিতাম এবং এখনও বাসি। কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাস না জানিয়া, আমাকে দেখিতে পার না বুঝিয়া, গৃহত্যাগী হইয়াছি। আমার জন্য চিন্তা করিয়া তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করিও না। আমি তোমার অযোগ্য। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। ইহলোকে তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। আমি মাকে পত্র লিখিলাম। তিনি আসিয়া তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবেন। ইতি—

তোমার অযোগ্য

সুহাস।

৫।

গৃহত্যাগী হইয়া সুহাস ভাবিয়াছিল শান্তি পাইবে। কিন্তু সে দেখিল—শান্তি পাওয়া দূরে থাক, দিন দিন সে অধিকতর অশান্তি ভোগ

করিতেছে। সুহাস ভাবিল, গৃহে থাকিলে সে একবার করিয়াও দিনান্তে শোভার দেখা পাইত, অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার কথা শুনিতে পাইত। এই চিন্তাই তাহাকে লতার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিল। সে স্থির হইতে পারিল না—প্রত্যাগমন করাই শেষঃ বিবেচনা করিল। ভাবিল "একবার কেন শোভাকে জিজ্ঞাসা করি নাই—সে আমাকে ভালবাসে কিনা?"

প্রত্যাগমন কালে সুহাস একবার পিসীর বাড়ী হইয়া আসিল। সেখানে শুনিল তাহার পিসী কিছুদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার চিন্তার স্রোত আরও বাড়িয়া গেল। তবে কে তাহার প্রাণের শোভার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছে? সে আর মুহূর্ত্ত কাল নষ্ট না করিয়া নানারূপ ভালমন্দ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন গভীর রাত্রি। দ্বারে অনেকবার করাঘাত করিল কিন্তু কেহই দ্বার খুলিল না দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পাঁচিল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আপনার শয়ন ঘরে যাইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সে দেখিল ঘরের মেঝেতে শোভা শুইয়া আছে—হাতে তাহার লিখিত সেই মর্ম্মান্তিক পত্র "শোভা! শোভা! প্রাণের শোভা আমার"—বলিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। শোভার দেহে হাত দিয়া দেখিল, দেহ যেন পুড়িয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে শোভা বলিয়া উঠিল, "ডাকচ? ডাকচ কেন? আমি ত তোমায় ভালবাসিনা! আমি ত তোমায় দেখতে পারি না। তবে আমায় ডাকচ কেন? দাঁড়াও দাঁড়াও—যেওনা রাগ ক'রনা! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় একলা ফেলে যেওনা। আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও। পৃথিবীতে যে আমার কেউ নাই—তুমিই আমার সব। না, না, আমি তোমায় দেখ্‌তে পারিনা! ভালবাসিনা!"

সুহাস বুঝিল শোভা প্রলাপ বকিতেছে। কাঁদিয়া নিজের চোখের জলে শোভার হৃদয় সিক্ত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া বলিল, "শোভা! শোভা! দেখ আমি ফিরে এসেছি। আর আমি তোমায় ফেলে যাব না!" শোভা বলিল, "আমি ভালবাসিনা! দেখতে পারিনা! ইহকালে আর দেখা হবেনা! উঃ, কি কঠিন প্রাণ!" সুহাস পুনরায় ডাকিল, কোনই উত্তর পাইল না। শোভা আবার বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর জানেন, আমি তোমায় ভালবাসি কি না। সে ভালবাসা মুখে বলা যায় না, তাই কখন বলিনি—উঃ, কি কঠিন! কি নিষ্ঠুর!

স্বামি বিদায় দাও. প্রাণেশ্বর পায়ের ধুলা দাও—তবে আসি—ভালবাসিনা! দেখতে পারিনা! —উঃ।”

সুহাস দেখিল. শোভা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চক্ষুদ্বয়ের কোণ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। শোভা নিশ্চল নিস্তব্ধ অসাড়। শোভাকে আরও দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া সুহাস কাঁদিতে গেল—পারিল না।

সমাপ্ত।

আজকালের বৈদ্যবুড়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী সেন।)

আর্য্যদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম।

জন্মান্তর রহস্য।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি ত্রয়েরই উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে একত্রে গুরু-সন্নিধানে যে আচার ও অনুষ্ঠান শিক্ষার সহিত বেদাধ্যয়নের বিধি আছে, তদনুসারে রহস্য অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদ্ অংশের সহিত সমস্ত বেদই অধ্যয়ন করিতে হয়। যথা—

বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বি-জন্মনা।

মনুসংহিতা; দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে ব্যবস্থার তারতম্য আবশ্যক হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মনু অসমর্থ পক্ষে একখানি মাত্র বেদ সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপনান্তে বিবাহ করিয়া গৃহী হইবার বিধানও দিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥

(মনু ২-৩ অধ্যায়।)

এক বচনান্ত বেদং শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ব্যবস্থার লঘু কল্পটী সূচিত হইতেছে। সকল শ্রেণীর দ্বিজকুমার এই লঘুকল্প আশ্রয়ের অধিকারী। কারণ তৃতীয় অধ্যায়ের উপদেশ তাঁহাদের সকলের নিমিত্তই অভিপ্রেত।

মনু তৃতীয় অধ্যায়ে সকল দ্বিজ সন্তানের স্বয়ং অনুষ্ঠেয় নিত্যক্রিয়া গুলির সাধন প্রণালীর উপদেশ দিয়া অধ্যায়ান্তে তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ ঋষিদিগকে বলিয়াছেন যে, এই তোমাদিগকে পঞ্চযজ্ঞ নামক সকল ধর্ম্ম সাধন প্রণালী উপদিষ্ট হইল; অতঃপর দ্বিজাতিগণের মধ্যে দ্বিজমুখ্যগণ,

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থাশ্রমে যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পঞ্চযজ্ঞ সাধন করিতে সমর্থ থাকিবেন, সেইগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। মনুর বচনটী এই—

এতদ্বোঽভিহিতং সর্ব্বং বিধানং পাঞ্চযজ্ঞিকম্।
দ্বিজাতিমুখ্য-বৃত্তীনাং বিধানং শ্রূয়তামিতি॥

(মনু ২৮৬ ৩অঃ।)

মনূপদিষ্ট নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ যজ্ঞ কি কি, তাহা বর্ত্তমান কালে সকলে অবগত নহেন; অথচ সেগুলির অবগতি এ প্রবন্ধের মর্ম্মবোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। অতএব এ স্থলেই সে গুলির উল্লেখ হইতেছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি নিচয়ের আলোচনা পরেই হইবে।

আর্য্যদিগের পঞ্চযজ্ঞ নামক পঞ্চবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম এই—

প্রথম। আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সাংসারিক সুখদুঃখে অবিচলিত থাকিবার অভিপ্রায়ে একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যাবন্দন সহ বেদানুশীলনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ। ইহার অপর নাম ঋষিযজ্ঞ।

দ্বিতীয়। স্থূলদেহ-বিনির্ম্মুক্ত হইলেও পিত্রাদিবিশেষ অনুগ্রাহক স্বজনবর্গ বিশ্বরূপ বিশ্ব-নিয়ন্তার বিচিত্র দেহে বিদ্যমান ও তদাত্মক বলিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে শোক মোহ অতিক্রম করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অপত্যোচিত কর্ত্তব্য পালনরূপ পিতৃযজ্ঞ।

তৃতীয়। বিজয়, আরোগ্য, সৌভাগ্য প্রভৃতি সাংসারিক অভ্যুদয় কামনায় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই প্রভূত শক্তি ইন্দ্র, ধন্বন্তরি, ভদ্রকালী প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ রূপের আনুকূল্য প্রার্থনায় বহ্নিহোম রূপ দেব-যজ্ঞ। (ভদ্রকালী সত্যযুগেও আরাধিতা।)

চতুর্থ। চুল্লী পেষণী সম্মার্জ্জনী প্রভৃতির ব্যবহার হেতু ক্ষুদ্রভূত কীটাদির অজ্ঞানকৃত-প্রাণবধ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কল্পে গৃহস্থের করুণাকাঙ্ক্ষী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ভূত গ্রাম্য পশু পক্ষীকে আহার প্রদান রূপ ভূত-যজ্ঞ।

পঞ্চম। নিঃস্বার্থ দানে নির্ম্মল প্রীতির অনুভবার্থ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত নিরুপায় অতিথিদিগকে অন্নদান রূপ নৃ-যজ্ঞ।

উপরি উক্ত অনুষ্ঠানগুলি প্রতিপালন করিলে ইহজন্মে প্রতিষ্ঠালাভ, এবং মনোমধ্যে ঐ সকল সৎকর্ম্মের সংস্কারের সঞ্চয় হেতু তৎসাহায্যে দেহান্তে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিই জন্মান্তরবাদ। ইহার অর্থ কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগের জন্য জীবের এক দেহের পতনে দেহান্তর-প্রাপ্তি। পুণ্যের প্রাবল্যে উচ্চগতি; পাপের প্রাবল্যে অধোগতি;

এবং কোনও রূপ প্রাবল্যের অভাব স্থলে মনুষ্যের পুনর্ব্বার মানবত্ব-প্রাপ্তি। এইরূপ যথাযোগ্য ক্ষেত্রে যোজনাই বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষপাত-বিহীন সৃজন-পদ্ধতি। দেহান্তর ধারণের সময়ে এই রূপে কেহ কোনও আত্মীয়ার নিকট নীত হইলে, তিনি আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া স্বকীয় আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেও সমর্থ হয়েন। মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের সংবাদ অনবগতা দূরস্থিতা আত্মীয়ারাও ঐ প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। বাঙ্গালা প্রদেশে যাঁহারা হারাধন বা হারাণচন্দ্র নামে অভিহিত হয়েন, তাঁহারা এইরূপে বিজ্ঞাপন দিয়া পূর্ব্বমাতার গর্ভেই প্রত্যাবৃত্ত। প্রত্যাবৃত্ত অপর আত্মীয় দিগের এরূপ নামের বিশেষত্ব হয় না। পুনরাগত কেহ কেহ বাক্‌শক্তির স্ফুরণের পরেও কোনও কোনও বিষয়ে পূর্ব্ব স্মৃতির পরিচয় দিয়া থাকেন। অনেক পরিবারেই প্রত্যাবর্ত্তন ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার জন্মান্তর-বাদের যদৃচ্ছাগত সুস্পষ্ট প্রমাণ।

পঞ্চ যজ্ঞের নাম শ্রবণেই যথেষ্ট তৃপ্তির অনুভব হয় না। এই নিমিত্ত উহার প্রধান অঙ্গ অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনাও কিঞ্চিৎ হইয়া যাইতেছে। উহা পরবর্ত্তী অধ্যায়-দ্বয়ে দর্শিত হইবে।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব। ব্রহ্ম; জীবাত্মা;—নির্ব্বাণ মুক্তি। ২-৩।

ব্রহ্ম (ব্রহ্‌ম্‌) শব্দ বৃহদর্থক। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই একমাত্র নিত্য বিদ্যমান, এবং চৈতন্য ও আনন্দময় মহাদেবতা। সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু-বহ্নি, সমুদ্র-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা, এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য যাবতীয় প্রাণি-পুঞ্জে পরিপূর্ণ এই বিচিত্র জগৎ সেই মহা দেবতায় ভাসমান। ইহা মহাযোগী উপলব্ধি করিতেছেন। ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে বিশ্বামিত্র ঋষির বদন হইতে যে বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ—

> ভূ-নভ-স্বর্লোক যে দেবে দীপ্ত,
> হই দিব্য তাঁরি প্রভায় তৃপ্ত;
> (ক্রিয়া বুদ্ধি যাঁরি কৃপায় সিক্ত)।

ইংরাজীতে প্রকাশ করিলে ইহা এরূপ হইবে—

Of God, in Whom are the earth, the sky and the heaven, and Who gives activity to our senses, we seek the Holy Light.

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ব্রহ্মময়—চিন্ময়— দেখিয়াছিলেন। একথা তিনি

স্বয়ং ভক্তদিগকে কহিয়াছেন এবং ইহা তাঁহার কথামৃতে উক্ত আছে। সকল জ্ঞানীরই এই প্রকার কথা। জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী শ্রীদয়াল চাঁদ বুঝাইয়াছেন যে জল-মধ্য দিয়া জাল আকর্ষণ করিলে যেমন সেই জালের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সেই একই জল, সেইরূপ মনুষ্যের দেহ থাকিলেও সেই দেহ ব্রহ্ম হইতে কোনই ব্যবধান স্বরূপ নহে; সমস্ত ব্রহ্ম সমুদ্র। পরম জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত যাবতীয় মানবগণের অনুপস্থিত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ও ভক্ত অর্জ্জুনকে কালস্বরূপ স্বকীয় ব্রহ্মদেহে দেখাইয়া দিয়াছেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ জ্ঞানময় ব্রহ্মের লীলা মাত্র। তিনিই জ্ঞেয় বস্তু। বেদে সেই ব্রহ্মের জ্ঞান উপদিষ্ট আছে বলিয়াই উহারও অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের প্রথম বাস ভূমির নামও ব্রহ্মাবর্ত্ত। ব্রহ্মাবর্ত্তের ভাষা, যে ভাষায় ব্রহ্ম বা বেদ উচ্চারিত, সেই প্রাচীন বৈদিক ভাষার নাম ব্রাহ্মী ভাষা।

গম্ ধাতু হইতে জগৎ শব্দ উৎপন্ন; যাহা গমনশীল, অর্থাৎ অনিত্য, নশ্বর, তাহাই জগৎ। চৈতন্যময় ব্রহ্মে জগৎ ও জীবের বিকাশ কি প্রকারে সম্ভবপর হইল, তাহাই বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিবেচ্য বিষয়। জীবের কথা অগ্রে হইতেছে।

যেমন একমাত্র সূর্য্য অসংখ্য জলাশয়ে বিম্ব-সূর্য্যরূপে অবস্থিত, সেইরূপ জ্ঞানানন্দময় এক ব্রহ্ম রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, জ্ঞানগুরু, শত্রু-রাজা প্রভৃতি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আকার ধারণ করিয়াও বিদ্যমান। এই সকল আকার ধারণ কেবল লীলার নিমিত্ত। পূর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মের ঐ সকল আকার ধারণে কোনও দোষ নাই। কারণ, সকলই পক্ষপাত-বিহীন একমাত্র তাঁহারই লীলা। প্রকৃত পক্ষে লীলা করিবার অপর কেহ দ্বিতীয় নাই।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

(গীতা—১৩শ অধ্যায়।)

যেমন বিম্ব-সূর্য্য সকল আধারের চাঞ্চল্যাদি দোষের বশে মধ্যে মধ্যে ঐ সকল দোষে লিপ্ত বোধ হয়; যেমন যাহারা অভিনয়-জীবী তাহারা রঙ্গ-মঞ্চের বাহিরেও আপনাদিগকে কখনও রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি রূপে পরস্পর পৃথক্ বিবেচনা করিতে ও তজ্জন্য হাস্যাস্পদ হইতে পারে; যেমন দীর্ঘ-কাল নৌকাযানে আরূঢ় থাকিবার পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও বোধ হয় যেন যানেই আরূঢ় রহিয়াছি ও শরীর আন্দোলিত হইতেছে; সেইরূপ নির্দ্দোষ ব্রহ্ম

কর্ত্তৃক সকল আকার লীলার অনুরোধে অবলম্বিত হইলেও, আমি রাজা, আমি প্রজা, আমি সুখী, আমি দুঃখী,—এইরূপ লীলাজনিত খণ্ডিত অহংভাব দীর্ঘকাল অনুশীলন হেতু প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে যেন আধার-জনিত দোষে লিপ্ত হইয়া পড়ে। পুনশ্চ সেই সীমাবদ্ধ অহংজ্ঞানের আবির্ভাবে দম্ভ, অভিমান, হিংসা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক ভাব ঘনীভূত হইয়া প্রবল বিকার উৎপাদন করে। এইরূপে বিকারগ্রস্ত হইয়া আপন আপন পৃথক্ অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্ হওয়ায় দুঃখ-শোক-পীড়িত অসংখ্য জীবভূত ব্রহ্মের, অর্থাৎ জীবাত্মার, পৃথক্ অস্তিত্ব স্থায়ী হইয়া যায়। ইহাই চৈতন্যময় ব্রহ্মে জীবের বিকাশ।

তখনও রঙ্গমঞ্চে যবনিকার পতন হয় নাই। সঙ্কীর্ণ অহংভাবের অধীনতায় যাবতীয় অসদ্‌গুণ জীবকে অশেষ অকার্য্যে নিযুক্ত করে। সেই সকল দুষ্ক্রিয়ার ও দুর্ব্বুদ্ধির সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে। কৃত দুষ্কর্ম্ম ও সুকর্ম্ম উভয়ই ফল প্রসব করিবে। ইহাই ব্রহ্মের বিধান। ইহা কেহ অনাবশ্যক বলিতে পারেন না। যাহাতে জীবগণ অশেষ প্রকারের ও অশেষ পরিমাণের সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই ভাবেই পক্ষপাত বিহীন ব্রহ্ম এই সুখ-দুঃখময় বিচিত্র জগৎ হইয়া রহিয়াছেন। সেই নিমিত্ত কোনও কোনও মহাত্মা এইরূপও কহিয়াছেন যে জীবই এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য জন্মান্তরেরও আবশ্যক হয়। পুনশ্চ পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য পাপ-জনিত ফলভোগের সমকালেও, অর্থাৎ কোনও জন্ম বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে নূতন নূতন দুষ্ক্রিয়ার মিশ্র স্রোতও চলিতে থাকে। এই ভাবে জীব অজ্ঞান তিমিরে পতিত থাকিয়া কত জন্মান্তর ভোগ করিতেছে, অপর জীবকে কত যাতনা দিতেছে, ও আপনারা শারীরিক ও মানসিক কত ক্লেশ অনুভব করিতেছে। এই ভাবে হতভাগ্য পাপিষ্ঠ জীব সংসারকে বিষময় করিয়া তুলিতেছে। যখন জগতের সাধারণ বিধান সংসারের বিকৃত ভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অসমর্থ হয়, তখন এই জগৎ যাঁহার লীলাভূমি সেই পূর্ণ জ্ঞান-শক্তির আধারভূত জগৎপ্রভু অসামান্য শক্তিসম্পন্ন দেহ ধারণ করিয়াও অবতীর্ণ হয়েন। ইহা তখন বিশিষ্ট লীলা।

দেবগণ ও মহর্ষিগণ যাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, অতএব স্বয়ং যিনি সৃষ্টির মূলভূত, সেই আদি দেব যখন শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ, তখন তিনি বলিয়াছেন যে কালধর্ম্মে সৃষ্টিকাল সমাগত

হইলে, কর্ম্মবন্ধন-শূন্য, ইচ্ছাদ্বেষ-বিরহিত নির্লিপ্ত ব্রহ্মে যদৃচ্ছাক্রমে সৃষ্টির সঙ্কল্প জাগরিত হয়। যখন জীব-সৃষ্টির সময় উপস্থিত, তখন অগ্রে বিমলমতি মহর্ষিগণ ও মনুগণ দেহবান্ হইয়া মনঃসমষ্টি আদি শরীরী ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়েন। তৎপরে তাঁহাদিগের হইতে সাধারণ জীবগণের সাধারণ নিয়মে উৎপত্তি হয়। যথা :— (ক্রমশঃ)

ক্ষমা-ভিক্ষা।

(শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দে।)

তোমার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি আমি অন্ধ।
কত অপমান সহেছ নীরবে, সহিয়াছ কত মন্দ।
তবু ত অধমে হেরিছ নয়নে, হাসিয়া মধুর হাসি,
তবুত এসেছ মোহন ভঙ্গে, বাজা'য়ে মধুর বাঁশি।
অন্ধ নয়নে হেরিনাক তব উজল মধুর বর্ণ,
পুণ্য রাগিণী পশে না শ্রবণে বধির হয়েছে কর্ণ।
স্তব্ধ বিকল হয়েছে কণ্ঠ, অচল অবশ দেহ,
ঘন অন্ধকার ঘেরেছে আমার শূন্য বিজন দেহ।
দিগভ্রান্ত হয়ে যাব এই ভয়ে ছাড়িতে চাহনা সঙ্গ,
বিনিময়ে তার বিঁধি অনিবার তোমার কোমল অঙ্গ
এত জ্বালা ভুলে তবুত এসেছ মুছাতে নয়নবারি,
যাচি একান্তে চরণ-প্রান্তে ক্ষম হে বংশীধারী।

কোজাগরী পূর্ণিমা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।)

(১)

আশ্বিনের পৌর্ণমাসী কৌমুদী রজনী,
নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র শোভে সমুজ্জ্বল,
সিন্ধুজলে ভাসে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী,
চারিদিকে দেখ তার তারা মুক্তা ফল।

(২)

পঙ্কজ-শোভনা ঋতু শরৎ সুন্দরী,
অতুল বিভূতি লয়ে বিমোহন সাজে,
সৌন্দর্য্য সমুদ্রে যেন শোভার লহরী,
অতি সুমধুর ধ্বনি, চারিদিকে বাজে।

(৩)

চারু চন্দ্রিকায় দীপ্ত অঙ্গ বসুধার,
খুলিয়া গিয়াছে উৎস, যেন বা সুধার,
যেন আজি বসুবাজি যত অলঙ্কার,
বাহিরিছে অমরার শোভার ভাণ্ডার।

(৪)

গগনে পূর্ণেন্দু, সিন্ধু ক্ষিরোদ উথলে
দেখি ইন্দু-সহোদরা ইন্দিরা সুন্দরী,
পদ্মালয়া পদ্মমুখী বসিয়া কমলে
বসুবাজি সঙ্গে যেন, সৌভাগ্য ঈশ্বরী।

(৫)

নিশীথে বরদা-লক্ষ্মী মধুর-ভাষিণী
ইন্দুবিনিন্দিতবর্ণা ইন্দিরা সুন্দরী,
কহিলেন দেবস্থানে সুমধুর বাণী—
কে জাগে জগতে আজি কৌমুদী শর্ব্বরী।

(৬)

নারিকেল চিপিটক করিয়া অর্পণ
পূজে দেব দেবীগণে ভক্তি-ভরে আজি
অক্ষক্রীড়া করি রাত্রি করে জাগরণ
প্রদান করিব তারে বিত্ত রত্ন রাজি।

(৭)

অলস বিলাস-মত্ত বঙ্গবাসী জন,
নানাবিধ মুগ্ধ সুরে গীতি কবিতায়,
গাইছে সঙ্গীত কত রমণী-রঞ্জন,
কিন্তু জাগিলনা কেহ ধনের আশায়।

(৮)

কোজাগর পূর্ণিমায় কে আছ জাগিয়া,
কহিলেন পদ্মালয়া অতি উচ্চস্বরে,
মোহাচ্ছন্ন বঙ্গবাসী অদৃষ্ট লাগিয়া,
নিদ্রাগেল মহাসুখে গৃহ অভ্যন্তরে।

(৯)

শুনিল না বরদার বরদান বাণী,
বুঝিল না কিবা তত্ত্ব লক্ষীর পূজায়,
ভাবিল কমলা শুধু সৌন্দর্য্যের রাণী,
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী নাহি ধারণায়।

(১০)

বঙ্গধামে শূন্য তাই লক্ষীর ভাণ্ডার,
জঠর জ্বালায় আজি কাঁদে বঙ্গবাসী,
চারিদিকে করে সব মহা হাহাকার,
দ্বারে দ্বারে ফিরে ঘোর দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী।

(১১)

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস যাহাদের বাণী,
যাহারা কল্পনা বলে সমুদ্র মন্থন,
করিয়া তুলিল সুধা সৌভাগ্যের রাণী,
তারা সিন্ধুযাত্রা লয়ে করে আন্দোলন।

(১২)

অনুরাগে নাহি জাগে কৌমুদী রজনী,
আর্য্যের উজ্জ্বল চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন হীন,
সিন্ধু বক্ষে নাহি যায় বাণিজ্য তরণী,
তাই ভারতের ভাগ্যে এ হেন দুর্দ্দিন।

(১৩)

শস্যশ্যামা বঙ্গভূমি মরুভূমি আজি,
বশীভূত বঙ্গভূমি ভুলেছে পদ্ধতি,
তাই সে ভাণ্ডারে নাহি মণি রত্ন আজি,
কমলা চঞ্চলা এ যে বিধির নিয়তি।

(১৪)

পরসেবা বাঙ্গালীর সৌভাগ্য সম্বল
কেমনে করিবে তারা বরদা অর্চ্চনা,
হস্তপদে বদ্ধ দৃঢ় লৌহের শৃঙ্খল,
ভাঙ্গিতে পারেনা তাই ভুগিছে যাতনা।

(১৫)

করমের দোষে লক্ষ্মী সতত চঞ্চলা,
অনুরাগে জাগে যারা কৌমুদী রজনী,
তাদের আলয়ে সদা ধনদা অচলা,
সাগরে সাগরে শত বাণিজ্য তরণী।

(১৬)

জগতে জাগিয়াছিল যেই নরগণ,
নিশীথে শুনিয়া সেই সঞ্জীবনী বাণী,
জাগিল উল্লাসে হয়ে আনন্দে মগন,
তাদের দিলেন বর সৌভাগ্যের রাণী।

(১৭)

কোজাগর পূর্ণিমায় বঙ্গবাসীগণ,
কমলার পাদপদ্মে দাও পুষ্পাঞ্জলি,
কৌমুদী রজনী আজি কর জাগরণ,
হয়ো না বিপথগামী আর্য্যপথ ভুলি।

(১৮)

কোজাগর রজনীতে জড়ের মতন,
ঘুমাও'না বঙ্গবাসী হয়ে অচেতন,
মোহনিদ্রা ত্যাগ করি জাগ একবার,
ফিরিলে ফিরিতে পারে লক্ষীর ভাণ্ডার।

(১৯)

ভজনা করহ লক্ষ্মী গুণ বিলাসিনী,
উদ্যোগী পুরুষবরে আপনি আসিয়া,
ঐশ্বর্য্য করেন দান, পঙ্কজ বাসিনী,
কালস্রোতে তৃণসম যেয়োনা ভাসিয়া।

(২০)

ভাগ্যে যাহা থাকে থাক ঘটিবে আপনি,
কর কর্ম্ম, মানবের কর্ম্মে অধিকার,
ত্যজিও না মুগ্ধ হয়ে প্রাচীন শরণি,
কে বলিল ফিরিবে না সেদিন আবার।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ।)

সুরেশ পুরী যাইবার কিছুদিন পরে একদিন সকালে ইন্দু ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া রান্নাঘরের চৌকাঠে বসিয়া আছে, এমন সময়ে ধীরেন আসিয়া বলিল, "শুনেচ বৌদি ?"

ধীরেনের মুখ দেখিয়া একটা কোন অশুভ সংবাদের আশঙ্কা করিয়া ইন্দু বলিল, "কি ঠাকুরপো ?"

"তোমার সুরেশদার যে বড্ড অসুখ।"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া ইন্দু বলিল, "সুরেশদার অসুখ! তোমায় কে ব'ল্লে ঠাকুরপো ?"

"পুরী থেকে আজ একজন ডাক্তার বাবু ফিরে এসেছেন, তিনিই ব'ল্লেন।"

ইন্দু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বলিল, "কি ব'ল্লেন তিনি ?"

"গায়ে নাকি বসন্তও বেরিয়েচে, ব'ল্লেন।"

ইন্দুর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

ধীরেন বলিল, "তুমি সেখানে যাবে বৌদি ?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, আমি যাব। নিয়ে যাবে ?"

"কেন নিয়ে যাব না বৌদি ? সেইজন্যেই তো এখনি তোমায় ব'লতে এলুম। আজ রাত্রেই চল—যাবে ?"

"তাই যাব। সেখানে জ্যাঠাইমা ছাড়া আর কেউ দ্যাখবার নেই।"

"তাহ'লে তৈরী হ'য়ে নিও, রাত্রি দশটায় ট্রেণ!"

ধীরেন বাহিরে চলিয়া গেলে ইন্দুর প্রথম আবেগটা ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল তাহার একান্ত যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, যাওয়ার পথে অনেক বাধা। শাশুড়ী এখানে নাই। তিনি পিত্রালয়ে। কাহাকে বলিয়া যাইবে? দ্বিতীয় বাধা ধীরেন যদি যাইতে না দ্যায়? পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেকটা শোধরাইলেও মাতালের খেয়ালে কিছুই বিশ্বাস নাই।

ভাতের ফ্যান গালিতে গালিতে ইন্দু একটু হাসিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল, "কিছুদিন আগেই অশ্রুকে লিখেছিলুম আবেগের সঙ্গে যুক্তি এলেই সব মাটী হ'য়ে যায়।"

ভাত খাইতে খাইতে ধীরেন বলিল, "তাহ'লে যাচ্চ বৌদি?"

ইন্দু বলিল, "দেখি; এখন ঠিক ব'লতে পারি না।"

আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া ধীরেন বলিল, "সেকি! এই সকালে ব'ল্লে যাবে! আর এখন ব'লচ 'দেখি!' যার কথা ভাবচ? পাছে তিনি বকেন?"

"তিনি এখানে থাকলে তাঁকে ব'লে যেতে পাত্তুম ঠাকুরপো।"

"নাই বা রইলেন এখানে। আমি ব'লচি মা কক্ষণ ব'কবেন না।"

"শুধু মা ব'ল্লে তো হবে না ঠাকুরপো।"

"তবে? আবার কে ব'লবে? ও, দাদার কথা ভাবচ বুঝি?"

অন্য দিকে চাহিয়া ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

"আমি দাদার মত করিয়ে দেব। তোমার ভায়ের অসুখ তুমি যাবে না? এতে দাদার তো কোন অমত করবার কারণ দেখচি না।"

ইন্দু কেবল একটু মুচ্‌কে হাসিল।

"দাদার জন্যে তুমি ভেব না বৌদি। কাপড় চোপড় সব গুছিয়ে নিও। তুমি না গেলে তোমার সুরেশদা'র নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্ট হবে।"

আবার আবেগ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু বলিয়া উঠিল, "তা যদি পার ঠাকুরপো তাহ'লেই আমার যাওয়া হয়। তোমার দাদার মত করাতে পারবে কি?"

"ঈস্, ভারী তো লোক, তার আবার মত, সেই মত আবার নাকি করাতে শক্ত লাগে! তুমি কিছু ভেব না বৌদি'। আজ আমি তোমায় নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু বলিল,

"তোমায় কিন্তু পুরী ষ্টেশন থেকেই ফিরে আসতে হবে ঠাকুরপো। তোমায় আমি সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব না!" ধীরেন হাসিয়া বলিল, "পাছে আমার বসন্ত হয় ব'লে নাকি বৌদি?"

"সে যার জন্যেই হোক্। সুরেশদা'র বাসায় তোমার যাওয়া হ'তে পারে না।"

"সেখানে গিয়ে আমি বুঝবো'খন। তোমায় আর পাকামী ক'ত্তে হবে না।"

আহার শেষ করিয়া ধীরেন একটা কাজে বাটীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় আর একবার বলিয়া গেল, "সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এসে তোমায় যেন প্রস্তুত দেখতে পাই বৌদি।" ইন্দু বলিল, "আচ্ছা।"

কোন এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বীরেন সকালেই চলিয়া গিয়াছিল। এখনও ফিরে নাই!

সন্ধ্যার পর পাছে সময় না হয়, এই ভাবিয়া ইন্দু 'যা' 'যা' লইয়া যাইবে একটী পুঁটলীতে বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। ধীরেনেরও একটী ব্যাগ সাজাইয়া ঠিক করিয়া রাখিল।

সমস্ত গুছাইয়া ইন্দু নামমাত্র একটু খাইতে বসিল। সুরেশের চিন্তায় একটী ভাতও মুখে করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ী উঠিয়া পড়িয়া বাসন কোসন লইয়া পুকুরে মাজিতে চলিয়া গেল। বীরেনের মত হইতে পারে এটুকু ইন্দু একটু একটু আশা করিয়াছিল।

অনেকগুলি কালো কালো মেঘ যখন একত্র হইয়া সমস্ত আকাশটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলে তখন আর মনে হয় না, এ মেঘ বুঝি আবার কাটিবে, আকাশ বুঝি আবার কখন পরিষ্কার হইবে। কিন্তু অনেক ঝড় জলের পর জমাট বাঁধা মেঘের কোথাও একটু সাদা হইয়া যায়, কোথাও বা মেঘ সরিয়া গিয়া একটু নীল আকাশ বাহির হইয়া পড়ে, কোথাও কতকগুলি মেঘ চলাফেরা করে, আবার কোথাও কোথাও জমাট বাঁধিয়া অন্ধকার হইয়াও থাকে। তখন কিন্তু মনে হয়, আকাশ বোধ হয়, এইবার পরিষ্কার হইবে।

বীরেনের সম্বন্ধে ইন্দুরও মনের ভাব অনেকটা এইরূপ। বিবাহের পর জমাট বাঁধা অন্ধকার দেখিয়া সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই বীরেন আবার কখন মানুষ হইবে। তাহারই ধৈর্য্যগুণে হউক বা সাধনার জোরে হউক, কিংবা বীরেনেরই কপালগুণে হউক এতদিনে একটু যেন বীরেন মানুষ হইয়াছে বলিয়া ইন্দুর আশা হইত—বিশেষতঃ যখন সে দেখিত কারণে অকারণে বীরেন হাউ হাউ করিয়া তাহার নিকট

কাঁদিয়া ফেলে, দুই একটা অনুতাপের লক্ষণ দেখায়, সময় সময় ইন্দুকে আন্তরিক যত্ন করে।

কিন্তু প্রবৃত্তির দোষে যখন সে মদ খাইয়া টলাটলি করে তখন ইন্দুর আশা প্রদীপ এক ফুৎকারে যেন নিভিয়া যায়। সুরেশের সম্বন্ধে পূর্ব্বের ভাব অনেকটা হ্রাস হইলেও তাহার নামে বীরেন এখনও মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া যায়। ইন্দুও সেইজন্য সুরেশের নাম আর মোটেই লইত না।

অশ্রুকে লিখিত ইন্দুর সেই পত্রখানি বীরেন লুকাইয়া পড়িয়াছিল। তদবধি ইন্দুর উপর তাহার একটা বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল এবং সুরেশের উপরেও তাহার অনেকটা ভাল ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহের হাত এড়াইতে পারিত না।

তাড়াতাড়ী বাসন কটা মাজিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ইন্দু শুনিল পুকুরের ওদিক্‌কার কোণের ঘাটে কতকগুলি রমণী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মধ্যে নিজের এবং বীরেনের নাম শুনিয়া বাসন কখানা হাতে লইয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া গেল।

ইন্দু শুনিল একটী রমণী কহিতেছেন, "বাগ্‌দীদের ছোঁড়াগুলো বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বড় ছেলেটাকে কি মারটাই মারে!"

ঘড়া মাজিতে মাজিতে আর একজন উত্তর করিলেন, "তা মারবে না পটলের মা! অমন বওয়াটে কি ত্রিভুবনে আছে!"

অপর একজন রমণী হাঁটু পর্য্যন্ত জলে নামিয়া আরও একটু অগ্রসর হইতেছিলেন। হঠাৎ দাঁড়াইয়া ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "কি হ'য়েছিল লা' রামার মা?"

রামার মা চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ওমা, জানিস্ না বুঝি ঠাকুর্ঝী?"

ঠাকুর্ঝী উত্তর করিলেন, "কে আর আমায় ব'লে ভাই!"

রামের মা বলিলেন, "বাগ্দীদের সেই সোমত্ত বিধবা মেয়েটাকে জানিস্ তো? যাকে নিয়ে সেবার অনেক কেলেঙ্কারী হ'য়ে গেল।"

সম্মুখ দিকে আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া ঘাটের উপর উঠিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর্ঝী বলিলেন, তা জানি বৈ কি। সে বারেও তো তার মধ্যে বাঁড়ুয্যেদের ছেলেটা ছিল।"

রামার মা বলিলেন "হাঁ ছিল বৈ কি। আজ কি হয়েছিল জানিস্? আমি ভাই এক ঘড়া জল আনতে গঙ্গার ঘাটে গিছ্‌লুম। দেখি, সেই বাগ্দীর ছুঁড়ীটাও সেখানে নাইচে। তাকে দেখে সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে আমি জল নিচ্ছি এমন সময় দেখলুম বাঁড়ুয্যের বড়

ছেলেটা আর কতকগুলো ছোঁড়া মিলে ছুঁড়িটার সঙ্গে কত কথা, কত হাসি, কত ইসারা—কচ্চে. ওমা, তারপর দেখি কি—ছিঃ! ছিঃ! ভদ্দর লোকের ছেলেও এমন কাজ করে!—ছুঁড়ীটা যেই নেয়ে উপরে উঠলো, আর ছোঁড়াগুনো তাকে না জোর করে ধরে একটা গাড়ীর ভেতর তুলে ফেল্লে। ছুঁড়ীটা বোধ হয় অতখানি আশা করেনি, নইলে কি এমন ক'রে চ্যাচায়?"

রামার মা বোধহয় একটু হাঁপাইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি চুপ করিতেই ঠাকুর্ঝী বলিয়া উঠিলেন, হাঁলা থামলি কেন? বল্ না শুনি!"

রামার মা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দাঁড়া বাপু, সে দৃশ্যটা মনে হ'লে এখনও আমার গা কাঁপে। তখন গা আমার পা দুটো কাঁপছিল ঠাকুর্ঝী! কি বলব।"

ঠাকুর্ঝী আরও অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, আঃ—মর্, বল না তারপর কি হ'লো। গাড়ীতে তুল্লে, ছুঁড়ীটা চীৎকার কত্তে লাগলো, তারপর?

রামার মা বলিলেন, "বাগ্দীদের কতকগুলো ছোঁড়া টের পেয়েছিল। ওরা তা দেখতে পায় নি। তারা না কোত্থেকে এসে ছোঁড়া গুনোকে খুব মাত্তে আরম্ভ ক'ল্লে। অন্য গুলো তো সব পালিয়ে গেল। বাঁড়ুয্যেদের বড় ছোড়াটা খুব মদ খেয়েছিল; তাই পালাতে পাল্লে না। তাকেই সবাই মিলে খুব ঠ্যাঙ্গাতে লাগলো।"

ঠাকুর্ঝী তখন কৌতুহলের চরম সীমায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন বলিলেন, "আর ছুঁড়ীটা?"

রামার মা বলিলেন, "সেটা তো বাগ্দীদের ছোঁড়াগুলো এসে প'ড়তেই পালিয়ে গিছ্‌ল।"

আবার জলে নামিতে নামিতে ঠাকুর্ঝী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বাপু দিনের বেলায় ও রকম করা কেন? রাত্ত বেরেতে হ'ত তাও না হয় একটা কথা ছিল। দিনের বেলায়, গঙ্গার ঘাটে—

ইন্দু আর শুনিতে পাইল না। তাহার সমস্ত মাথাটা ঘুরিতেছিল। তাড়াতাড়ী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এক বার মনে হইয়াছিল আর বাটী যাইয়া কাজ নাই। এই পুকুরের জলেই ডুবিয়া মরে।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ইন্দু দেখিল, ধীরেন তাহার কতকগুলি বন্ধুর সাহায্যে বীরেনকে ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইতেছে, ইন্দু সেইখানেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো!"

ঘরের ভিতর বীরেনকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া ধীরেন বাহিরে আসিয়া বলিল, "মাথায় একটি জল পটী দিয়ে হাওয়া করগে যাও বৌদি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি। এখন

বড়দার জ্ঞান হয়নি।"

ডাক্তার আসিয়া, ধীরেনকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "ভয় করবার কোন দরকার নেই বেশী চোট লাগেনি। বড্ড মদ খেয়েচেন ব'লে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েচেন।"

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া ঘরে ঢুকিয়া ধীরেন বলিল "এখনও ভিজে কাপড় ছাড় নি বৌদি? আমি দাদার কাছে বস্‌চি। তুমি যাও কাপড়টা ছেড়ে এস।"

"ডাক্তার বাবু কি বলে গেলেন ঠাকুরপো?"

"শুন্‌লে তো বৌদি, তোমার সামনে বলে গেলেন ভয়ের কারণ কিছু নেই। ভিজে কাপড় পোরে থেক না। অবটা বাড়লে কে দেখবে?"

এবারেও উঠিবার কোন লক্ষণ না দ্যাখাইয়া ইন্দু বলিল, "কোথায় তুমি দেখতে পেলে ঠাকুরপো?"

"রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়েছিলেন। ভিড় দেখে কাছে গিয়ে দেখলুম একজন মুখে জল দিচ্ছে আর একজন হাওয়া ক'চ্ছে। তারা দুজনেই আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। বড়দাকে তারা চেনে। তাদেরই সঙ্গে একটা গাড়ী ক'রে বড়দাকে নিয়ে এলুম। যাও, বৌদি' কাপড় ছেড়ে এস।"

"হাঁ যাই" বলিয়া ইন্দু অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধীরেন বলিল, "শিগ্‌গির ক'রে এস। আমায় এখন আবার দিদিকে আনতে যেতে হবে।"

ধীরেনের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ইন্দু বলিল, "সেখানেই আগে যাও ঠাকুরপো। ঠাকুরঝীকে নিয়ে এস। আমি একলা বোধ হয় পেরে উঠবো না।"

"তুমি আবার কি পারবে বৌদি! তুমি তো আজ আমার সঙ্গে পুরী যাবে। দিদিকে নিয়ে আসি, সেই দাদাকে দেখবে এখন।"

"তোমার দাদাকে এ স্থানে ফেলে আমি পুরী যাব কি ক'রে ঠাকুরপো?"

"দাদার তো বেশী কিছু হয় নি বৌদি, এরকম মদ খেয়ে তিনি প্রায়ই তো কেলঙ্কারী করেন। এতো তার নতুন নয়। কালকেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পুরী যাবে বৈকী।"

"না ঠাকুরপো, তা হয় না। সুরেশদার কাছে যাওয়ার চেয়ে আমার এখানেই এখন থাকার দরকার বেশী। বরং আমি অশ্রুকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্চি; এক্ষুণি সেটা ডাকে ফেলে দিয়ে এস। সে-ই পুরী যাবে।"

মুখের দৃঢ়ভাব এবং স্বরের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ধীরেন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

সেই রাত্রেই ইন্দুর আদেশে ধীরেন জননীকে আনিবার জন্য মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। তাঁহাকে আনিয়া তারপর হেমলতাকে আনিবে —এইরূপ ঠিক হইল।

ইন্দুর ভিজা কাপড় দেহেতেই শুকাইয়া গেল। একবারের জন্যও স্বামীর নিকট হইতে উঠিল না।

অনেক রাত্রে মদের নেশা ভাল করিয়া কাটিয়া গেলে, বীরেনের চেতনা ফিরিয়া আসিল। চক্ষু মেলিয়া ইন্দুকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "ইন্দু, তারা আমায় বড্ড মেরেচে।"

অনেক কষ্টে কান্না চাপিয়া ইন্দু বলিল "ডাক্তার বলে গ্যাচে, কোন ভয়ের কারণ নেই।"

"জান ইন্দু, তারা কেন মেরেচে?"

মুখ নীচু করিয়া ইন্দু বলিল, "জানি।"

উঠিতে উদ্যত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বীরেন বলিল, "জান? ইন্দু! জান, কেন তারা মেরেচে?"

বীরেনকে শোয়াইয়া দিয়া ইন্দু বলিল, "অমন ধারা ক'চ্চ কেন? কষ্ট হবে যে। চুপ ক'রে শুয়ে থাক।"

"ইন্দু! সব জেনে শুনে তুমি আমার সেবা ক'চ্চ? ক'তে পাচ্চ? তোমার ঘেন্না ক'চ্চে না? আমায় ছুঁতে তোমার ঘেন্না ক'চ্চে না! ইন্দু, ইন্দু, বল সত্যি ক'রে বল।"

বীরেন আবার কাঁদিয়া উঠিল।

অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ইন্দু বলিল, "ঘেন্না ক'রবে কেন?"

"ইন্দু, আমি মাতাল, আমি বেশ্যাসক্ত, আমি তোমার অযোগ্য। আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়োনা ইন্দু। তুমিও তাহ'লে আমার মত অপবিত্র হ'য়ে যাবে।"

ইন্দু তখনও কান্না চাপিয়া বলিল, "অত ব'ক না; যন্ত্রণা বাড়বে।"

বীরেন বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমায় তারা একেবারে মেরে ফেল্লে না কেন ইন্দু? তাহ'লে এ মুখ আর তোমায় দেখতে হ'ত না। কেউ যাকে ছোঁয় না, সবাই যাকে ঘেন্না করে, তুমি তাকে এত যত্ন কর কি ক'রে ইন্দু? সত্যিই কি তবে তুমি আমায় ঘেন্না কর না? সত্যিই ভালবাস?"

ইন্দু প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না; মনে মনে বলিল, "তোমায় ভালবাসব না? তুমিই যে আমার সব। আমি তো একদিনের জন্যও তোমায় ঘেন্না ক'রিনি।"

ইন্দু নিস্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া বীরেন

আবার বলিল, "ইন্দু আমার নরকেও স্থান হবে না, চিরকাল তোমায়—"

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, "বেশী কথা ব'লো না—ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরেন পুনরায় বলিয়া উঠিল, "ইন্দু, ইন্দু।"

ইন্দু পাশেই ছিল, বলিল, "কি ?"

ইন্দুর একখানি হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া ধীরেন বলিল, "আমার কাছ থেকে উঠে যেও না ইন্দু, তুমি চ'লে গেলে আবার তারা মারবে।"

"আমি কাছে থাকতে তোমায় কেউ মারতে পারবে না—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও।"

"তুমি কি এমনি ক'রেই আমায় চিরকাল আগলে থাকবে ইন্দু ? কখন ছেড়ে যাবে না ?"

পাছে তাহার কান্নাটা প্রকাশ পাইয়া যায় বলিয়া ইন্দু কোনই উত্তর করিল না। পূর্ব্বের মত মনে মনে বলিল, "যতদিন বাঁচব এমনি ক'রেই তোমায় বুকের কাছে ধ'রে রেখে দেব।"

বলিয়াই ইন্দু যেন শিহরিয়া উঠিল। সে তো আর বেশীদিন ধীরেনকে এরূপে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। যে রোগে ইন্দু আক্রান্ত হইয়াছে তাহাতে সে যে দিন দিন খুব দ্রুত-বেগেই মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে !

পরদিন সকালে জননীকে পৌঁছাইয়া দিয়া, ধীরেন ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া আসিয়া বলিল, "আবার একটা মুস্কিল হ'ল যে বৌদি !"

"কি ঠাকুরপো ?"

ইন্দুকে নিভৃতে লইয়া গিয়া ধীরেন বলিল, "সেই বাগ্দীর ছোঁড়াগুলো ব'লচে নালিশ ক'রবে।"

ইন্দুর ফ্যাকাসে মুখ আরও ফ্যাকাসে হইয়া গেল। বলিল, "নালিশ। তারা নালিশ ক'রবে কেন ঠাকুরপো ?"

"কেন আর এটা বুঝতে পাচ্চ না বৌদি ? টাকা আদায় করবার মৎলব। কিছু পেলেই থেমে যাবে, নইলে নালিশ মোকদ্দমা ক'রে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে।"

ধীরেনের হাত ধরিয়া ইন্দু বলিল, "মাকে যেন কিছু ব'লো না ঠাকুরপো। তিনি তাহ'লে রসাতল কাণ্ড ক'রবেন এখন।"

"মাকে না ব'ল্লেই বা উপায় কি বৌদি ? তুমি টাকা পাবে কোত্থেকে ?"

"যেখান থেকে পারি দেব। মাকে তুমি ব'লো না ঠাকুরপো দোহাই তোমার। আমার এখনও একজোড়া বালা আছে, একটা হার আছে, আর একটা আংটী আছে। এগুলোকে বিক্রী ক'রে যা টাকা হবে, তাই দিয়ে তাদের

মুখ বন্ধ ক'রে এস ঠাকুরপো। আমি হ'তে পায়ে ধ'রে তাদের বুঝিয়ে ব'লবো।"

অবাক্ হইয়া ধীরেন বলিল, "কি, ব'লচ বৌদি!, দাদার দোষে সব কটা গিয়ে ঐ দুটীতে এসে ঠেকেচে। একটাও বেচে ফেলবে? না বৌদি, তা হবে না।"

"হোক্ গে ঠাকুরপো। আমিই তো সব বিক্রী ক'ত্তে ব'লেছিলুম। তোমার দাদা তো কিছু বলেন নি।"

"বলেন নি বৈকী। তিনিই তো জোর ক'রে সব বিক্রী ক'রেচেন। আমি সব জানি বৌদি। এ গয়না কটা বিক্রী করা হ'তে পারে না। আমি যেখান থেকে পারি টাকা যোগাড় ক'রে আনব।"

"জানতো ঠাকুরপো, আর কেউ আমাদের ধার দেয় না। কার কাছে তুমি হাত পাত্তে যাবে?"

"সে যেখান থেকে হয় আমি আনব।"

"না ঠাকুরপো, উপায় থাকতে পরের কাছে তোমায় হাত পাত্তে দেব না। কাজেই যদি না লাগাবে, তা'হলে গয়না থেকে লাভ কি?"

ইন্দু আর কথা না বাড়াইয়া বাক্স হইতে শেষ গহনাগুলি বাহির করিয়া দিল। ধীরেনও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

সমস্ত শুনিয়া বীরেন একদিন বলিল "আমার জন্যে তোমার শেষ গয়না কটাও বিক্রয় করে ফেল্লে! আমার তো জেলে যাওয়াই উচিত ছিল ইন্দু। তা'হলেই আমার ঠিক শাস্তি হত। কেন তুমি আমায় বাঁচালে ইন্দু?"

"জেলেই যদি তুমি যাবে তাহ'লে অমন গয়না তো আমার না থাকাই ভাল।"

"থাকলে ভবিষ্যতে তোমারই কাজে আসতো ইন্দু।"

"বর্ত্তমানে সে তো আমারই কাজে এল। আগে বর্ত্তমান তার পর তো ভবিষ্যত।"

তখনও বীরেন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। মারের দু একটী দাগ তখনও শুকায় নাই। জ্বরও সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বীরেন বলিল, "সুরেশের নাকি বসন্ত হ'য়েচে?"

ঘায়ে মলম লাগাইয়া দিতে দিতে ইন্দু বলিল "হ্যাঁ।"

"যে দিন আমি অজ্ঞান হ'য়ে যাই, সেদিনই তোমার যাবার কথা ছিল না?"

"হ্যাঁ"।

"কেন গেলে না? ধীরেন তো৷ শৈলদিকে হয়ত আমার কাছে রেখে যেত।'

ইন্দু কোন উত্তর করিল না।

"এখন যাওনা কেন ইন্দু। বীরেন তোমায় রেখে আসুক্। যাবে ?"

ইন্দু মলমের বাটীর মুখ বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "তুমি ভাল ক'রে সেরে ওঠো। তোমার সঙ্গেই যাব।"

তাকের উপর বাটীটি রাখিয়া আসিয়া ইন্দু দেখিল, বীরেন অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

পাগলের কথা।

(শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

কি আনন্দের দিন! সারা দেশটার উপর দিয়ে একটা আনন্দের স্রোত ব'য়ে গেল। দেশ-বাসী যেন এই স্রোতের জলে অবগাহন করে সমস্ত বৎসরের দুঃখ মলিনতা ধুয়ে মুছে ফেলে কত না তৃপ্তি, কত না শান্তি অনুভব করিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে এ আনন্দ-ছায়াপাত স্পষ্ট দেখা যায়। সবাই যেন কি একটা অননুভূত আনন্দে বিভোর—চঞ্চল, কিন্তু নৈরাশ্যময়, অট্টহাস্যশূন্য, উন্মাদনাহীন। যে হাসে সে যেন চুরি করে হাসে; যেন ভয় হয় পাছে কেউ শুনতে পেলে আর সাধের হাসিটুকু কেড়ে নিয়ে ফেলে। তবুও এ হাসির মধ্যে প্রাণের আবেগময় আনন্দের ভাতি—অন্ধকারে বিদ্যুতের মত চকিত-দীপ্তি ফুটাইয়া তোলে। পূর্ব্বেও তো এই দেশ, এই মানব, এই বাতাস, এই আকাশ, এই সব একভাবেই ছিল। তখন তবে এ আনন্দ স্রোত কোন অজানা পর্ব্বতের গুপ্ত-কন্দরে লুকিয়ে থেকে মরুভূমির তপ্ত বালু-রাশীর কৃতান্তক্রীড়ার প্রশ্রয় দিতেছিল? আর এখনকার আহ্বানে হাওয়ার মত ছুটে এসে এক সময়ে সমস্ত দেশটাকে ক্ষণিকের তরে প্লাবিত করে দিয়ে গেল? বুঝি মহাশক্তির আহ্বানে। আজ মহাশক্তি জেগে উঠে মূর্ত্তিমতী হয়ে আমাদের সম্মুখে। তাই এতকালের ঘুমন্ত ক্ষুদ্র শক্তি-গুলি নিদ্রিত শিশুর স্বপ্নশীহরণের মত তাঁর আগমনের পদশব্দে একবার চমকিত হয়ে নড়ে উঠেছে; কিন্তু আবার নির্জীব, অসাড়, অচেতন। কোথা থেকে, সে চঞ্চলা! নাচতে নাচতে সে এসে এ শ্মশানের কঙ্কাল গুলাকে টেনে তুলে ক্ষণিক আনন্দে মাতোয়ারা করে আবার নাচ্‌তে

নাচ্‌তে নাচ্‌তে কোন অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে চলে গেলি মা! হায় দেশবাসী! বুঝ্‌তে পার্‌লে না এ শক্তির আগমনী,—এ জননীর আগমনী, তাঁকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লে না? তোমাদের এই ইষ্টক-প্রস্তর নির্ম্মিত পূজার দালানে শুধু তাঁর মৃন্ময় মূর্ত্তিকে জাঁকজমকের সহিত ষোড়শো-পচারের পরিবর্ত্তে ষোড়শ অনাচারে পূজা করেই যদি ক্ষান্ত না থাক্‌তে, যদি তাঁর বরাভয়-প্রদায়িনী অথচ অসুরদলনী মূর্ত্তিকে নিজেদের হৃদয়-মন্দিরে পূর্ণ-নির্ভরতার সহিত স্থাপিত কর্‌তে পার্‌তে, তা'হলে হয়ত কুণ্ডলিনী চির-কালের জন্য সজাগ হয়ে থাক্‌তো; পূত উন্মাদনায় তোমাদের শূন্য বুক, রিক্ত-হস্ত, অসার-অন্তর ভোরে উঠ্‌তো। কি কর্‌লে, কি কর্‌লে!

মা, তবে কি সত্যই তোকে হারালেম? তুই কি তবে সখের মা? তুই কি তবে সন্তানের লালনপালনের ভার ধাত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে স্বীয় স্ফূর্ত্তিতে মেতে বেড়াস? না—হাল-ফ্যাসানী রোজগারী বাবুদের শ্রীমতীদের মত ছুটীর বাজারে দেশ পরিভ্রমণ তথা হাওয়া বদলানর বাপদেশে ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসে দিন-কতক নিরিবিলিতে দু'শ মজা লুটে গেলি? তা মা, ছেলে হ'য়ে কোন মুখে আর বলি,—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—হয়ে তুইতো খেমটা সুন্দরীদের মতই ধিঙ্গি হয়েছিস্। কর্ত্তা কাচ্চাবাচ্চা আদি করে সদলবলে যর্নি (journey) কর্‌তে বেরিয়েছিস্। তবে,—পোড়ার মুখে বল্‌তে কি, তুই যদি মা, এই সময়ে ৮।৯ মাস অন্তঃসত্ত্বা হতিস্, বেচারা পরমগুরুটি যদি আধাবয়সিও হত, তাহ'লে যর্নিটা বড় জমকাল রকমের হত। ভাল হাওয়া খেয়ে খেয়ে পেটের শিশুটীও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠ্‌তো, আর লোকেও জান্‌তো যে, সুন্দরীর এখনও বয়স যায় নি।

ধন্যি তোর বুকের পাটা। অন্য সময়ে তো পুরুষ দেখলেই সাড়ে সতের হাত ঘোমটা টানিস্, আর এই ষ্টেসনের মধ্যে নর-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতর ভদ্রের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হওয়াটা কি লজ্জার পরিচয় না অপচয়?

সে যাই হউক, যর্নি করা চাই, নৈলে প্রাণটা যে stagnate (একঘেয়ে) মেরে যাবে। একঘেয়ে সংসার করা কি enlightened (সইভ্যা) ছুরিদের ভাল লাগে? তাতে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। যায় যাগ, বেটি কিন্তু ঘরে বাইরে মিলিটারী। এদিকে ভাতের হাঁড়ি নামাতে হলে কোমরে ফিক্‌-ব্যথা লাগে, কিন্তু নথনাড়ার ঠেলায় কর্ত্তাটি হতভম্ব মেরে গেছে, রাস্তাঘাটেও লোকে সমঝে যায় যে একখানা মেয়ে বটে। যদি আমাদের উপর দয়ামায়া নেই তবে একটা খোসখেয়ালের বশে

ঘরের পয়সাগুলো খরচ করিস্ কেন? সমস্ত বৎসর গাধার খাটুনী খেটে মিনসে রোজগার করে। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েদের খাওয়া পরা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা রীতিমত হয়ে উঠে না। তার উপর বুড়ো বয়সেও কর্ত্তাটির ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য আর গোলাপী মোজ না হ'লে বিক্রিয়েসন হয় না। মাঝে মাঝে তোমায় সোণাতোলা রূপাতোলা'টা দেওয়া চাই। নচেৎ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিতে কর্ত্তার মুখে ছাই পাঁচুড়ে দিয়ে বাপের বাড়ী যাবার জন্য সিংহবাহিনী হবে। ভক্তিতে না হোক, ভয়েও তোমায় সন্তুষ্ট করতে হবে। কারণ, যেদিন রসরাজের রসের উৎস শুকিয়ে আস্বে, যেদিন হতে ক্রমে ক্রমে তেজ দন্ত লোপ পেয়ে পর-মুখাপেক্ষী হতে আরম্ভ হবে, সেদিন সন্তান আর স্ত্রী ভিন্ন যে গতি নাই, সেদিন বিক্রিয়েসন দাত্রীরা পুষ্পান্তরের অনুসন্ধানে উড়ে যাবে। এ সবের পরও যদি শুধু হাওয়া খাওয়ার জন্য একরাশী টাকা বাজে খরচ করতে হয়, তাহলে শূন্য তহবিল পূর্ণ হয় কেমন করে। এ অবস্থায় যতই রোজগার করনা কেন, মেয়ের বিয়ে, সুখ অসুখ ইত্যাদিতে কর্জ্জ না করিলে চলে না। বাইরের চাল বাড়িয়ে দিলে ভিতরের চাল বাড়ন্ত হবেই। রোজগারী কর্ত্তাটি শিঙে ফুঁকলেই পাওনাদাররা নিলাম ইস্তাহার জারী করে বসল, আর হাওয়া খেকো ঠাকরুণরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, "এমনটা হবে তা' আগে জানা যায় নি। কর্ত্তাওতো একদিনের জন্য একথা বলে নি।" মনে করেছিলে এমনি দিন বুঝি চিরকাল থাক্‌বে। ভেবেছিলে মিন্‌সেকে "নিত্য বনে পাঠিয়ে দিয়ে পর্‌বে কত সোণাদানা।" এখন তোমাদের যা হবার তা'ত হ'লই। নিরপরাধ ছেলেমেয়ে গুলা তোমাদের সংস্পর্শে এসে কষ্টভোগ করতে লাগল্। তোমরা যদি এমনি করে মাতাপিতার কর্ত্তব্য পালন কর, তাহলে সন্তানরাও এমনি করে তাদের কর্ত্তব্য পালন করতে শিখবে না কেন? সন্তানের শিক্ষা তো মাতাপিতার কাছে। তাঁদের দৃষ্টান্তে, তাঁদের আদর্শে তাঁদের স্বভাবে সন্তানের চরিত্রগঠন হয়ে থাকে। অতএব তাদের ইহকাল পরকাল রক্ষা করিবার জন্যও কি একটু সমঝে চল্‌তে নাই। নিজেরা সন্তান-সন্ততিদের কচি মাথাগুলি চিবিয়ে খেয়ে নিজেরাই বল, ওরা কবন্ধ। সন্তান যখন শিশু, সে যখন তোমাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত,— যখন নিজস্ব বলে কিছুই ছিল না, তোমরা যা' দেবে তাই তার নিজস্ব হবে, তখন থেকে তাকে

কি দিয়েছ মনে করে দেখ। এখন তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তোমাদের দেওয়া স্বভাব চরিত্র নিয়ে বান চাল্ হয়েছে বলে, তোমাদের প্রাপ্য তারা দেয় না বলে, তাদের উপর অভিমান কর। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাদের যা প্রাপ্য তা তোমরা কতটুকু দিয়েছিলে। মনে কর কি সন্তানকে খাওয়ান পরান আর আদর করলেই তোমাদের দায়িত্ব শেষ হল, না ইহাতে তোমাদের মহত্ত ও পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখান হল। বুঝি,—তোমরা যে ঠিক সন্তান কামনা করে ছিলে তা-নয়। স্বাভাবিক নিয়মে সন্তানের জন্মলাভ ঘটে পড়েছে। যখন ঘটে পড়েছে, তখন মাতাপিতার দায়িত্বও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের উপর বর্ত্তেছে। সন্তানের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যথারীতি লালন পালন ও প্রকৃত মানুষ করে তুল্‌তে তোমরা দায়ী হয়েছ। আর যদি বল, আজ কাল দুর্ম্মূল্যতার বাজার। স্বল্প আয়ে খাওয়া পরাই একপ্রকার কষ্টকর, তার উপর সন্তান সন্ততিকে যথারীতি লালন পালন করা কষ্টসাধ্য। যাদের এমন অবস্থা তাদের কি উচিত নয় যে যাহাতে সন্তানের মাতা পিতা হতে না হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া; স্ফূর্ত্তির দিকে মনঃসংযোগ না করে, বিলাস লালসা চরিতার্থ করবার ইচ্ছায় একটা কামিনী গ্রহণ না করে যাতে স্ত্রীপুত্র পরিবারের যথোচিত ভার গ্রহণ করিতে পারা যায়, সেই দিকে বেশী মনঃসংযোগ করাই কি সজ্ঞান মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে? প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া ভাবা উচিত প্রতিজ্ঞা যথোচিত পালিত হওয়া সম্ভব কিনা। যৌবনের খেয়ালে আপাতরম্য সুখের মরীচিকায় ভ্রান্ত না হয়ে চিরস্থায়ী সুখো-দ্যান রচনা কর্‌তে সচেষ্ট হওয়াই শ্রেয়ঃ।

জগজ্জননি! তোর আগমনে অভাগা দেশের বহুকালের লুপ্ত আনন্দ ফিরে এসেছিল। আনন্দের আস্বাদে আমাদের অসাড় প্রাণ আবার নেচে উঠেছিল। কিন্তু হায়, সে আনন্দ অন্ধকারে বিজলী চমকের মত একবার মাত্র অন্তরে দেখা দিয়ে মনটাকে অধিকতর অবসাদে আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। আবার কবে এদিন ফিরে আস্‌বে—এ জীবনে আস্‌বে কিনা কে জানে! অহো, আমি কি মহান্ধ মূঢ়! মা যে সনাতনী আবহমান কাল আমাদের অন্তরে বাহিরে এমনি সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিতে বিরাজ কর্‌-ছেন। তিনি যে এতগুলা সন্তানের মা। তিনি তো আর সুখ-সোহাগী শ্রীমতীদের মত মা নহেন যে, সন্তান কোথায় কেঁদে আকুল হয়ে পড়ে আছে, মা কিন্তু আপনার তালে শিল্পকাজে বা নাটক নভেলে মনোনিবেশ করে একনিষ্ঠ

সাধকের মত বিভোর হয়ে আছেন। তিনি আমাদের উপর সদাই নিবদ্ধদৃষ্টি; সকল সম্পদ বিপদে আমাদের পরিচর্য্যা কর্‌চেন। আমরা এমনি ক্রীড়ামত্ত যে, মার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিনা। তাই তিনি মাঝে মাঝে এই রকম একটা উৎসবের অবতারণা করে আমাদের চমক ভেঙ্গে দেন। আমরা মনে করি, মা বুঝি আজ আমাদের দেখতে এলেন। তাই আমরা আনন্দে আটখানা হয়ে মাতৃচরণে অঞ্জলি দিবার আয়োজন করি। তাই আমরা মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন সকলে মিলে উৎসব করি। সবাই মিলে মায়ের দেওয়া পরমানন্দ ভোগ করেনি।—তাই নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে।

আমরা এমনি অন্তঃসারশূন্য, এমনি শক্তি-হীন যে, এমন প্রাণমাতান আনন্দের দিনেও আমাদের প্রাণ স্বতঃই নেচে উঠে না। তাকে stimulate করবার জন্য গ্লাস কত তরলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হবেই তো। স্বভাবজাত আনন্দ অনাবিল। তাতে শয়তান জাগে না। শয়তানী স্ফূর্ত্তি যদি চাগাড় না দিলে, তাহলে ভুতুড়ে মায়ের পূজার মেলা মানায় কেমন করে! চেয়ে দেখ ঐ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রতি। তারা কেমন আনন্দে বিভোর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি শক্তিতে তারা এত মাতোয়ারা? তাদের আনন্দ-কোলাহল, তাদের হর্ষ-কৌতুক, তাদের উন্মাদ-নৃত্য, তাদের নয়ন-ভোলান সতেজ মুখশ্রী, এসব দেখেও কি পাষণ্ড, তোমার আত্ম-ধিক্কার হয় না? তারা যে নিষ্পাপ-স্বভাব শিশু। অমল স্তনদুগ্ধই তাদের পানাহার, আর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী মূর্ত্তিই তাদের ধ্যান-জ্ঞান ধারণা। তারা সত্য সত্যই শক্তির সন্তান, জগতের সন্তান। তাই আজ জগতের আনন্দ-যজ্ঞে তাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। আর তোমরা? শয়তানের সন্তান, তোমাদের নিমন্ত্রণ হয় Gardenparty, না হয় বারাঙ্গনার গোলক-ধাঁদায়। ওরা আজ নির্ব্বিবাদে বীরের মত আনন্দ-পসরা মাথায় করে নিয়ে গেল; তোমরা অপরাধীর মত অবসাদ কালিমা-মাখা মুখখানা লুকিয়ে বেড়ালে। একেই বলে কাপ্তেনী মৌতাত।

মা! তোর পাগল ছেলে গরীব ছেলে,নাচার ছেলে, এরা তোকে কি দিয়ে পূজা কর্‌বে? তাদের যে অর্থও নাই স্বার্থও নাই। তারা তো দিবারাত্র দীর্ঘশ্বাসের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে 'মাগো মাগো' বলে ডাক্‌ছে, আর কপালের ঘাম পায়ে ফেলে দিনমজুরী কর্‌ছে। তাদের কাছে কি তুই আস্‌বি না? তুই কি তবে

রোজগারী ছেলেরই পক্ষপাতী? না না। প্রাণ তো এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। তুই ভাল মন্দ সবাকার। তবে শুনেছি, তুই নাকি ভক্তি-ডোরে বাঁধা থাকিস্? আর যারা ভক্তি-হীন, তমোভাবাপন্ন, তাদের কি তবে ত্যজ্যপুত্র করিস্? না। যাদের হৃদয়ে ভক্তি আছে, তারা মায়ের স্পর্শ অনুভব কর্‌তে পাবে, আর যারা তমোগুণী, তারা তমসাচ্ছন্ন হয়ে তোকে দেখ্‌তে পায় না, তোর ডাক শুন্‌তে পায় না, তোব স্পর্শ অনুভব কর্‌তে পারে না। তারা আসল ভুলে নকল নিয়ে মেতে থাকে। তাই তাদের ঠাকুর-দালানের অত কারিগোরি, তাদের প্রতিমার অত বাহার, তাদের গিন্নীর নাকে মজাদার নত আর বেনারসীর পাড়ে অত চুম্‌কির ছটা, তাদের গুরু-পুরোহিতের অত উচ্চকণ্ঠে (উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে) মন্ত্রোচ্চারণ—ভাবগদগদ ভঙ্গিমা—পূজার উপচার ও উপকরণের দিকে লোলুপ অথচ গুপ্ত দৃষ্টি—মধ্যে মধ্যে হ য ব র ল করিয়া জড়িত স্বরে দীর্ঘমন্ত্র সংক্ষেপ করণ। তাই কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ংই গোলাপী মৌজে ভরপুর। ভক্তির উদ্গার স্বরূপ 'মা মা' বলে চীৎকার কর্‌চেন আর চেলীর জোড় পরে ধনী ও মানীদের আপ্যায়িত করে বেড়াচ্চেন। সঙ্গে সঙ্গে চাটুকারের দল, হুকাহস্তে সরকরাদি করে বেড়াচ্চে। হায়! গরীব, নাচার, অনাহূত, তাদের দিকে তো কেউ চায় না। তারা খেলে কি না খেলে, তৃপ্ত হয়েছে কি না সে সংবাদ তো কেউ রাখে না। যাদের অভাব নাই, যারা তোমার প্রত্যাশী নয়, যারা তোমার নিমন্ত্রণে (বদারেশন ভেবে) বরং বিরক্ত, তাদের তেলা-মাথায় তেল দেবার জন্য তোমার বদান্য হস্ত সদাই মুক্ত। হাঁরে নীচান্তঃকরণ, ঐ শোন কবির জীমূতমন্দ্র বিষাণ রব :—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে।
অহঙ্কার ত পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের,
রিক্তভূষণ দীন-দরিদ্র সাজে,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায়, সঙ্গিহীনের ঘরে
যেথায় আমার হৃদয় নামে নাচে,
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে।"

হে ধনী, শুধু আপন আপন সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, ধনী মানী প্রভৃতিকে পর্য্যাপ্ত আহার ও পরিধেয় দিলেই মাতৃপূজা সম্পন্ন হয় না। এ কামিনী-কাঞ্চনের পূজা নহে বা 'ধর্ম্মাধিকরণে' মামলা চালান নয়। এ

জগজ্জননীর পূজা—যে সন্তান অক্ষম, নাচার, মা তাকেই বেশী স্নেহ করে। তাকে যে ভালবাসে, সেই মার যথার্থ পূজক। মা তোমায় অর্থ দিয়েছেন, তোমার স্ফূর্ত্তির অনলে আহুতি দেবার জন্য নহে; অনাথ, আতুর, অক্ষম, এদের সাহায্য কর্‌বার জন্য। তা যদি তুমি না কর তবে তুমি চোর, পরস্বাপহারী। হে ধনী, হে মানী, মা তোমাদের বড় করেছেন—ছোটদের তোমাদের ছায়াতলে আশ্রয় দেবার জন্য। তোমরা সংসার-কাননে বনস্পতিস্বরূপ। মা তোমাদের অতুল সম্পদ-সম্ভারে ভূষিত করেছেন বলেই ছোটরা তোমাদের প্রত্যাশী। তোমরা তাদের নিরাশ করে পদদলিত ক'র না। এমন আনন্দের দিনে সমস্ত আনন্দটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাও! দীনহীন অধম যারা তারা কি এ দুনিয়ার কেউ নয়? তোমাদের প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এক কণা করে যদি তাদের দাও তাহলেই যে তারা আপনাদের কৃতার্থ মনে করে,—অথচ সেটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য,—এতে কৃপণতা করে কি তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু বেশীরকম সুবিধা হবে মনে কর।

মাতৃ-উৎসব ফুরিয়ে গিয়াছে। আমরা আবার উৎসাহহীন কোমর-ভাঙ্গা-বুড়োর মত হয়ে পড়্‌ছি, একঘেয়ে রকমের হয়ে আস্‌ছি। কেবল হাহাকার, অফুরন্ত অভাব, অরণ্যে অভিযোগ এই নিয়ে আকুল-ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্চি। না—তা হবে না। রণচণ্ডীর পূজা করে কি শেষে এই ফল লাভ হল। কোথায় স্ফীত-বক্ষে, বীরদর্পে কার্য্যে অগ্রসর হব, না ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচওয়ালী মেকী লাজুক যুবতীদের মত জড়সড় হয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে পরপুরুষেরই ঘাড়ে পড়ে যাব? দুর্গোৎসবের কালে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বেচারা ছাগশিশুগুলাকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করে রসনার তৃপ্তি-সাধন করা হল। এইবার নিজেদের অন্তরের ভীরু মেষগুলাকে মায়ের চরণে বলি দিয়ে মাভৈঃ রবে তাণ্ডব নৃত্যে মাতোয়ারা হও দেখি ভাই! আগুপাছু না চেয়ে, শুধু মায়ের ইঙ্গিতে ছুটে চল। কোলের খোকাটির মত মায়ের জানু ধরে ধরে, কাছা খুলে পাছা দুলিয়ে, টেরি উড়িয়ে গদাইলস্করি চালে আর চল্‌বে না। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবার দিন আর নাই। এখন অদম্য উৎসাহ নির্ভীক হৃদয় আর কঠোর পরিশ্রম, এই মাত্র মানুষের অবলম্ব্য। এই সম্বল নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে নেবে দাঁড়াও; আর স্বর্গাদপি জননী মূর্ত্তি স্মরণ করে শুভকার্য্য আরম্ভ কর। যখনই বাধা পাবে তখনই তারস্বরে ঈশ্বরকে

ডেকে বলুবে :—

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না করি যেন ভয়।
দুঃখে তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা।
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।"

কেরাণী-স্তুতি।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।)

কেরাণী, তোমায় নমস্কার। কে বলে তুমি ঘৃণ্য, কে বলে তুমি হেয়, কে বলে তুমি অনুদার? যে তোমার স্বরূপ দেখেছে, তোমারে বুঝেছে সেই তোমার গুণে মুগ্ধ। সর্ব্বগুণের গুণমণি কেরাণী তুমি, তোমায় নমস্কার। তুমি কোথায় নাই? জাহাজে তুমি, রেলে তুমি, আদালতে তুমি, সওদাগরী অফিসে তুমি, স্কুলে তুমি, কারখানায় তুমি, ব্যাঙ্কে তুমি, হোটেলে তুমি, সরকারী দপ্তরে তুমি, শ্মশানে তুমি, হে সর্ব্বব্যাপিন্ তোমায় নমস্কার। চন্দ্র সূর্য্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি থাকা যদিও সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তুমি—কেরাণী ব্যতিরেকে আমাদের এই অপ্রতিহত-শক্তি-সম্পন্ন ইংরাজ-রাজ, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বণিক-রাজ বুঝি বা একদিনও তিষ্টিতে পারে না। উদার-হৃদয় পরদুঃখ-কাতর কেরাণী, তুমি পরের মুখ-চেয়েই দুঃখ-কষ্টে চিরজীবন অতিবাহিত করিতেছ। শুধু কি তাই, তোমার ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্যই তোমায় পুত্রের প্রয়োজন, তাহার বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা। হে পরার্থরূপ কেরাণী, তোমায় নমস্কার। আজ যদি তুমি কেরাণী তোমার ঐ লেখনীরূপ মোহন অস্ত্র পরিত্যাগ করে, সহর-বাস ছেড়ে তোমার পল্লী-মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লও—তোমার পিতৃ-পিতামহের 'ভিটা' খুঁজিয়া লও—সেখানে চাষ আবাদ কর, চরকায় সূতা কাট—অনাবাদী বাগান পুষ্করিণী আবাদ কর—গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপনা ও পরিচালনা কর—যজন-যাজন কর—ঔষধাদি প্রস্তুত কর—চিকিৎসা

কর, তাঁত বোনো, কুম্ভকারের কার্য্য কর, ছুতোরের কার্য্য কর, কর্ম্মকারের কার্য্য কর, তোমার দুবেলা দুমুঠা অন্ন জোটে, পরণে ১০হাত কাপড়ও জোটে এবং স্ত্রী-পুত্রাদির অন্ন বস্ত্রালঙ্কার ও ঔষধাদির জন্য কষ্টও হয় না। কিন্তু দয়াল-হৃদয় তুমি কেরাণী, তাত তুমি পার না। তুমি ভাব—কাতর হ'য়ে ভাব, তোমা বিনা সহর টলমল করিবে সহরে সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যা উপস্থিত হইবে, ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবে, সওদাগরী বন্ধ হইবে, সওদাগরী অফিস বন্ধ হইবে, তোমার "বড় সাহেব" চটিবে—আহা বড় বিপদে পড়িবে—তাহার চিঠি "টাইপ" হ'বে না, রিপোর্ট লেখা হ'বে না, চাপরাশীরা কাজ পাবে না, মক্কেলরা মকর্দ্দমা করিতে পারবে না, "জাঁদাপেটা" উকীলেরা ফী পাবে না—আহা তাদের মোটর চড়া বন্ধ হবে—জজেরা রায় লিখে উঠতে পারবে না—খপরের কাগজ বেরুবে না, হকারেরা হাঁকবে না—সরকারী কাগজপত্র বেরুবে না, জন্ম-মৃত্যু রেজেষ্টারী হ'বে না—এই রকম আরও কত কি যে অনর্থ ঘটিবে—তা তুমি কেরাণী দিব্য-চক্ষে দেখতে পাও—আর চাকরী ছাড়বার নামে তাই তুমি শিউরে উঠো। তুমি বেশ বোঝো কেরাণী—তুমি যদি তোমার কলম ছেড়ে "হন্নমুখো" হও এই এতবড় সরকার বাহাদুর একদিনে আসন্ন হয়ে পড়ে, আর বড় বড় কর্ম্মচারী সব বাধ্য হ'য়ে 'হোমে' যাত্রা করেন। কারণ হাত পা অসাড় হ'লে ত শুধু মাথায় দেহ রক্ষা কর্‌তে পারে না। কিন্তু এতটা অনর্থ তুমি কি করে ঘটতে দিতে পারো? তাই তুমি কেরাণী তোমার মনীবদের মঙ্গল চেয়ে নিজে অর্দ্ধাশন বা অনশন-ক্লিষ্ট হইয়াও তোমার এই মঙ্গল-অনুষ্ঠান করে চলেছ। পরম কারুণিক কেরাণী তোমায় নমস্কার। নিঃস্বার্থতার অবতার কেরাণী তোমায় নমস্কার।

সাধু কেরাণী তোমায় নমস্কার। তুমি কত অল্প-মাহিনায় সন্তুষ্ট হয়ে জীবনযাপন করিতেছ, তুমি কখনও "দুটী ঠোঁট" এক করিয়া বেশী মাহিনা চাহিতে জান না। তুমি ভাব, তোমায় বেশী দিলে তোমার মণিবদের চলিবে কিরূপে? সর্ব্বত্যাগী কেরাণী তোমায় নমস্কার—তোমার কোন সখ নাই, সৌখিনতা নাই, ভাল 'খাবার-দাবারে' তোমার স্পৃহা নাই। নেশার মধ্যে—তোমার পান ও বিড়ী বা সিগারেট। তুমি ক্ষুধার সময় 'গরম চা' খাইয়া শরীর রক্ষা কর। পয়সা প্যাকেট "মদনানন্দ-মোদক" খাইয়া তুমি মাদক সেবনের সাধ মিটাও। তুমি "দেশী ও বিলাতী" আন্দোলন বোঝ না। যা সস্তা তাই কিনে তোমার দেশ-ধর্ম্ম রক্ষা কর। তুমি

তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্র লইয়া কি অল্প-মাহিনায় ও কত কষ্টে কাল কাটাও! সহিষ্ণুতার অবতার কেরাণী তুমি তোমায় নমস্কার। তুমি প্রায়ই কালকাতার ২০ ক্রোশ দূর মধ্যে অবস্থান কর। তুমি "প্রতিদিনের বাবু" অতি প্রত্যুষে দুটী "আধ-ফুটন্ত" ভাত পোড়া পেটে ঠাসিয়া মরণ পণ করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে গলদ্‌ঘর্ম্মে আসিয়া ট্রেণ ধর এবং সমস্ত দিন মনিবদের মন যোগাইয়া সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী ফের। তুমি কখনও বা দল বাঁধিয়া কলিকাতায় মেসে বা বোর্ডিংয়ে আশ্রয় লইয়া অবস্থান কর এবং সপ্তাহান্তে শনিবার পাইলেই ঘরে যাও। হে "শনিবারের বাবু" কেরাণী তোমায় নমস্কার। সোমবার আসিলেই তুমি আবার কলিকাতায় আস এবং আবার শনিবারের প্রতীক্ষায় এই কয়টী দিন প্রত্যহ ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কি খাটুনিই না খাট। একটী দিন যদি তুমি দেরীতে আস—লেট হও তোমার বড় সাহেব রক্ত-রাগ-চক্ষু লইয়া তোমার প্রতি তাকায়। কার্য্যে যদি কোন "গলদ্" হয় বদ্‌নামের বোঝা তুমিই ঘাড়ে কর—আর যদি কোন "খোসনাম" বেরোয়—সেজন্য "বড় সাহেব"ই বাহবা পায়। হে নেমকের গোলাম কেরাণী, তোমায় নমস্কার।

তোমার পোষাকের কোন পারিপাট্য নাই। ময়লা ধুতি ময়লা সার্ট বা কোটের উপর চাদর বিলম্বিত মূর্ত্তি যখন দেখি তখনই বুঝি এ আর কেহ নহে—এ যে আমাদের কেরাণী।

হে চাদর-নিশানধারী কেরাণী, তোমায় নমস্কার। কখন তোমায় দেখি—তুমি হ্যাট-কোট পরিধান করিয়া, যথাসম্ভব সাহেব সাজিয়া, মনিবের মন ভুলাইতে চলিয়াছ। কিন্তু হায় "হলে না তার মনের মত সাধিলে এত।" তুমি খবরের কাগজ পড়ো না, কোন ভাল বই পড়ো না। তুমি সমাজ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি কোন নীতিরই ধার ধার না। তোমার বড় সাহেবের বাক্য গুরুবাক্য জ্ঞানে তাহার নীতিই অবাধে মানিয়া চল। তুমি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সনে বড় সাহেবের কথা কহিতেই মশগুল হইয়া থাক। তুমি অবসর সময়ে তোমার বড় সাহেবের কুকুর ঘোড়ার কথা ভাবিয়াই বিভোর হইয়া থাক। হে আপন-ভোলা কেরাণী, তোমায় নমস্কার। তোমার কোন স্বাধীন মত নাই, থাকিলেও প্রকাশ করিবার হুকুম নাই। বড় সাহেবের অপ্রিয় মত প্রকাশ করিলে গোপনে তোমায় কাণমলা দেন। তুমি নিরীহ কেরাণী, তাহা নীরবে পকেটস্থ করিয়া বাহিরে প্রকাশ কর—তুমি সাহেবকে

কি শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছ। সাহেবের নিতান্ত কাতর মিনতি ও তাহার অফিস অচল হইবে জানিয়া তুমি কেবল চাকরী ছাড়িবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে। নীলমণি কেরাণী, তোমার মঙ্গল হউক। বড় সাহেব তোমায় সোণার চক্ষে দেখুন। তোমায় নমস্কার।

শুক্রনীতি সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।]

এই সংসারে দৈবের উপর ও পুরুষকারের উপর যাবতীয় শুভাশুভ সমস্তই নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ যাহা কিছু দৈবাধীন ভোগ্যবস্তু তৎসমুদয় পুরুষকার ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। এই ভোগ্যফল দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মরূপ দৈব, অপরটী ইহজন্মনিষ্পাদ্য পুরুষকার ॥৪৯॥ প্রবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে প্রবলই দুর্ব্বলের প্রতিকারী। অর্থাৎ প্রবল দুর্ব্বলের উপকারী অথবা অপকারী হইয়া দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। পুরুষকার প্রবল হইলে দৈব অবনমিত হয় এবং দৈব প্রবল হইলে পুরুষকার ব্যর্থ হইয়া যায় ॥৫০॥ প্রত্যক্ষ কারণের দ্বারা ফললাভ দৃষ্ট হয় না। যেহেতু তাহা প্রাক্তন কর্ম্মাধীন— অতএব ইহার অন্যতম নাম অদৃষ্ট ॥৫১॥ অথবা সামান্যমাত্র পুরুষকার প্রয়োগেই মনুষ্যসমূহ যে মহৎ ফললাভে সমর্থ হয়, তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। কোন কোন মনীষিগণ বলেন, সেই প্রভূত ফল প্রাক্তন ও ঐহিক কর্ম্মের মিশ্রণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥৫২॥

ইহ জন্মার্জ্জিত ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যগণের পৌরুষ উৎপন্ন ফললাভ হয়—ইহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কেন না, পুরুষকাররূপ প্রযত্নাতিশয্যে স্নেহবর্ত্তি-সমন্বিত জাজ্জ্বল্যমান প্রদীপকে বায়ু হইতে রক্ষা না করিলে তাহা যেমন শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ প্রযত্নাভাব বশতই দৈবও ফলোপধায়ক হইতে সমর্থ হয় না ॥৫৩॥ যাহা অবশ্যম্ভাবী দৈব, তাহার যদি প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি ও বলের (শারীরিক চেষ্টার) সহায়তায় অপকারী রোগাদির প্রতিকার না করাই উচিত ॥৫৪॥

অতএব রাজা প্রতিকূল অনুকূল ফলের দ্বারা

এবং ঈষৎ মধ্য ও অধিক ফলের দ্বারা দৈবকে ত্রিধা চিন্তা করিবেন। অর্থাৎ ঈষৎ প্রতিকূল এবং ঈষৎ অনুকূল—এক প্রকার; মধ্যবিধ অনুকূল ও মধ্যবিধ প্রতিকূল—দ্বিতীয় প্রকার এবং অতিশয় অনুকূল ও অতিশয় প্রতিকূল—তৃতীয় প্রকার ॥৫৫॥

উদাহরণ—রাবণ রাজার একটী মাত্র বানর 'হনুমান' কর্ত্তৃক মধুবন-ভঙ্গাদিতে এবং ভীষ্মাদি রাজগণের একটী মাত্র নর 'অর্জ্জুন' কর্ত্তৃক বিরাট গোমোচনে রাবণ ও ভীষ্মাদির পক্ষে দৈব প্রতিকূল—ইহা অনুমেয় ॥৫৬॥ রামের ও অর্জ্জুনের কালানুকূল্য ইহাতেই স্পষ্টীকৃত। অর্থাৎ যখন দৈব অনুকূল হয় তখন সামান্য মাত্রও অনুষ্ঠান বহুতর সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ যখন দৈব প্রতিকূল হয় তখন মহতী সৎক্রিয়াও অনিষ্ট-জনয়িত্রী হইয়া যায়। যেমন প্রভূত দান করিয়াও বলি ও হরিশ্চন্দ্র বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥৫৮॥ সৎক্রিয়া দ্বারা ইষ্ট লাভ হয় এবং অসৎ-ক্রিয়া দ্বারা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা কোনটি সৎ এবং কোনটি অসৎ ইহা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া অসৎ ত্যাগপূর্ব্বক সদনুষ্ঠানে রত হইবে। ৫৯ ॥

রাজা কালের কারণ। অর্থাৎ রাজা যখন সম্যক্‌রূপে সদসৎ বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করেন, তখন সত্যযুগ। যখন সামান্য ভাবে করেন তখন ত্রেতাযুগ। যখন কার্য্যের বিচার করেন না তখন দ্বাপর যুগ আর যখন নিদ্রা যান তখন কলিযুগ। রাজাই একমাত্র সৎ ও অসৎ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। অতএব রাজা সদনুষ্ঠান ও দণ্ড দ্বারা প্রজাবর্গকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন ॥৬০॥

রাজ্যের সাতটী অঙ্গ। স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষাগার রাষ্ট্র দুর্গ ও বল। ইহার মধ্যে স্বামী অর্থাৎ রাজা মস্তক, অমাত্য চক্ষুঃ, সুহৃৎ কর্ণ, কোষাগার মুখ, বল অর্থাৎ সৈন্য মনঃ, দুর্গ হস্তদ্বয় এবং রাষ্ট্র পাদদ্বয় ॥ ৬১-৬২ ॥ এই সপ্তাঙ্গের সর্ব্বদা শুভপ্রদ গুণসমূহকে ক্রমশঃ বলিতেছি। যে গুণসমূহে ভূষিত হইলে রাজগণ উন্নতিশালী হইতে পারিবেন ॥ ৬৩ ॥ সুবিজ্ঞ প্রাচীনতম ব্যক্তির মতানুবর্ত্তী রাজা এই জগতের উন্নতির একমাত্র হেতু এবং চন্দ্র যেরূপ নয়নানন্দ-বর্দ্ধক, রাজাও তদ্রূপ লোকসমূহের নয়নাহ্লাদ-জনক। ৬৪ ॥ রাজা যদি সম্যক্‌রূপে কার্য্যদর্শী না হয়েন, তাহা হইলে সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় প্রজাগণ বিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

ক্রমশঃ

রঘুর সুমেরুতুল্য হিরণ্যদান।

রঘুর সুমেরুতুল্য হিরণ্যদান।

(শ্রীকিশোরীমোহন চৌবে-সেন লিখিত।)

বিশ্বজিৎ যাগে ক্ষিতীশ দানে
নিঃশেষ করিল যেমন ধনে,
গুরু দক্ষিণার অর্থের আশে,
বরতন্তু-শিষ্য কৌৎস আসে। ১

হিরণ্ময়াভাবে মৃণ্ময় পাত্র,
অর্ঘ্যের নিবেশ করিয়া তত্র,
যশে দীপ্ত, বিদ্যা-দীপ্তের প্রতি-
উদ্গমন করে উৎসাহে অতি। ২

বিধিজ্ঞ নৃপতি যেমন বিধি
মানধন, তপো-ধনে আরাধি',
সমীপে আসনে বসায়ে হেন,
করযোড় করি' বলে বচন। ৩

বেদমন্ত্র-দর্শী মহর্ষি যত,
তব গুরু তাঁদে প্রধান খ্যাত;
ওহে তীক্ষ্ণ-মতি কুশাগ্র-জিনি,
কহ, কুশলেত আছেন তিনি?

প্রাপ্ত তুমি জ্ঞান যাঁ' হ'তে এত
ভানু হ'তে লোক আলোক মত। ৪

উপবাস বেদ-পঠন জপে
সতত সঞ্চয় করেন তপে,
তাহাতে বাসব পাইয়া ভয়,
ব্যাঘাত বাধায়ে না করে ক্ষয়? ৫

আধার-বন্ধন প্রভৃতি করি,'
সুতের অভেদে যতন ধরি',
আশ্রমে যে সব পাদপ পাল,
শ্রম তা'রা দূর করেত ভাল?

উপদ্রব তাদে নাহি ত আসে,
বাত-ঝঞ্ঝা দাব-অনল বেশে? ৬

দর্ভ আহরণ ক্রিয়ার তরে,
তাহাও যদিও কামনা করে,
মুনিরা বৎসল তাদেরে এত,
বাসনা সবার না হয় হত;
অঙ্কে দশ দিন শয়নে রয়,
নাভি-নাল তথা পতিত হয়;

"রঘুর সুমেরুতুল্য হিরণ্যদান", মহাকবি কালিদাস-বিরচিত রঘুবংশ কাব্যের পঞ্চম সর্গ দর্শনে রচিত।

২। রাজভাণ্ডারে এখন স্বর্ণপাত্র নাই। যশোদীপ্ত রঘু: বিদ্যাদীপ্ত কৌৎস।

৬। ঝঞ্ঝা—ঝড়বৃষ্টি।

হেন সে হরিণী-শাবক গণে,
শ্বাপদ পশুরা নাহি ত হানে ? ৭
নিয়মিত যাহে ত্রিকালে স্নান,
তর্পণ অঞ্জলি যা' হ'তে দান,
পুলিনে বিকীর্ণ যাহার রাজে
উঞ্ছের ষড়্ ভাগ দেয় যা' রাজে,
স্রোতো বারি সেই পাবন তব,
নাহিত ক্রুটিত তাহার শিব ? ৮
সহজে উৎপন্ন যে সব ধান্য,
নীবার শ্যামাক প্রভৃতি বন্য,
যা' হতে ত্বদীয় শরীর-স্থিতি,
যাহাতে সময়ে সেব অতিথি,
তাহারা যখন সুপক্ব হয়,
গ্রাম্য পশু আসি' করে না ক্ষয় ? ৯
মহর্ষি সম্যক শিক্ষার দানে
অনুমতি ত হে প্রসন্ন মনে,
গৃহী হইবারে তোমায় কৈল ?
দেখিতেছি তব বয়স হৈল,
দ্বিতীয় আশ্রম গ্রহণ তরে,
সর্ব্ব প্রাণি-হিতে শক্তি যা' ধরে। ১০

তুমি হে সেবার প্রকৃত পাত্র,
তৃপ্ত নহি তব আগমে মাত্র ;
কিছু হে নিয়োগ করিবে তুমি,
পালনে প্রফুল্ল হইব আমি ;
গুরুর নিদেশে অথবা স্বতঃ
আপ্যায়িতে মোরে হ'লে আগত ? ১১
অর্ঘ্যের পাত্রেতে সূচিত হয়,
রঘুর সর্ব্বস্ব হয়েছে ব্যয়,
এ হেতু তাঁহার উদার ভাষা,
শুনেও দুর্ব্বল হইল আশা ;
বরতন্তু শিষ্য তাই সে তাঁরে,
এ হেন প্রকারে উত্তর করে। ১২
জানিও রাজন্ মোদের ভব,
করিছে বিরাজ বিষয়ে সব ;
যখন তুমি হে রহেছ নাথ,
কেমনে প্রজার বিপদ-পাত ?
দৃষ্টি কি লোকের আবরে আসি'
ভানু বিদ্যমানে তিমির-রাশি ? ১৩
ভক্তি-প্রদর্শন পূজ্যের প্রতি,
চিরাগত তব কুলের রীতি ;
ওহে মহাভাগ তাহায় পুনঃ
পূর্ব্বতন গণে তুমি যে জিন ;

৭। দভ—কুশ। আত্মরক্ষায় অসমর্থ নবপ্রসূত হরিণ-শাবকদিগকে ঋষিরা রাত্রিকালে দশ দিন আপনাদিগের শয্যায় রাখিয়া রক্ষা করিতেন।

। নৃপতিরা ঋষিদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লইতেন না। ঋষিরা লব্ধ ধান্যের সেই ষড়ভাগ নদীতীরে বিকীর্ণ করিতেন পক্ষীরা তাহা খাইয়া যাইত।

১৩। ভব—মঙ্গল।

অর্থি-ভাব কিন্তু আমি যে ধরি',
সময় সম্পূর্ণ অতীত করি',
হইনু আগত তোমার ঠাঁই,
উপজে বিষাদ হৃদয়ে তাই। ১৪
সুপাত্রে বিভব তাবত দিয়া,
রয়েছ ধরিয়া কেবল কায়া;
ইহাতে নরেন্দ্র তুমি হে শোভ,
স্তম্ব-অবশেষ নীবার নিভ;
আরণ্যকগণ সকল ফলে
চয়ন করিয়া লইয়া গেলে। ১৫
সার্ব্বভৌম হ'য়ে ধরণী-পরে,
যজ্ঞে অর্থ-জাত ব্যয়িত ক'রে,
অকিঞ্চন ভাবে এই যে রও,
অধিক গৌরবে অন্বিত হও;
পর্য্যায় করিয়া দেবতাগণে,
অই যে বিধুর সুধার পানে,
কলার তাঁহার করয়ে ক্ষয়,
বৃদ্ধি হ'তে শ্লাঘ্য তাহাতে হয়। ১৬

১৬। বর্ণনা আছে যে পৌর্ণমাসীর পর প্রথমা কলা বহ্নি পান করেন, দ্বিতীয়া কলা রবি, তৃতীয়া বিশ্বদেবগণ, চতুর্থী বরুণ, পঞ্চমী বষট্কার, ষষ্ঠী কলা ইন্দ্র, সপ্তমী দিব্যর্ষিগণ, অষ্টমী ব্রহ্মা, নবমী যমরাজ, দশমী বায়ু, একাদশী উমা, দ্বাদশী পিতৃলোকগণ, ত্রয়োদশী কুবের, চতুর্দ্দশী মহাদেব ও পঞ্চদশী কলা প্রজাপতি দক্ষ পান করেন।

গুরুর দক্ষিণা সংগ্রহ তরে,
অতএব অন্য বদান্য-বরে
সন্ধান করিতে আমি হে যাই,
অন্য কার্য্য কিছু আমার নাই;
শুভ তব হ'ক, চাতক যেবা
মেঘ-বারি বিনা করেনা সেবা,
নির্গলিত-জল শরত-ঘনে,
সে ও ত যাচেনা সলিল-দানে। ১৭
এই বলি সেই চলিয়া যায়,
নিবারি' নৃপতি শুধান তাঁয়;
'ওহে বিদ্বান্ গুরুরে দেয়
বস্তুটি তব কি, কি পরিমেয়'। ১৮
যজ্ঞে যথাবৎ সাধন কারী,
গর্ব্বের লেশেরো নহে যে ধারী,
চতুর্বিধ যাহা আশ্রম বর্ণ,
রক্ষে যে নিয়মে তাহা সম্পূর্ণ,
কহে তবে তাঁয় প্রকাশ করি',
সুধী সে কষায় বসন ধারী। ১৯
বিদ্যা চতুর্দ্দশ সমাপ্ত ক'রে,
গুরু দক্ষিণার স্বীকার তরে
বিজ্ঞাপিনু আমি ঋষিরে যবে,
'দক্ষিণা কি আর তুমি হে দিবে,

১৯। কষায়—গৈরিক (গেরুয়া)।

আদি হ'তে এই তাবত কাল
ভক্তি অস্খলিত ধরিয়া' ভাল,
ক'ন তিনি, 'সেবা করিয়া এলে,
তাহাই জানিনু দক্ষিণা ব'লে। ২০
নির্ব্বন্ধে হইনু আমি আরূঢ়,
হৃদি রোষ তাঁ'রে হইল রূঢ় ;
বলেন গুরু সে কোপের, ভরে
অর্থের কৃশতা মম না স্মরে,
বিদ্যা চতুর্দ্দশ তুমি ত পাও,
বিত্ত চৌদ্দ কোটি আনিয়া দাও। ২১
বুঝিনু দেখিয়া পূজার পাত্র,
প্রভু নাম শেষ রেখেছ মাত্র ;
তাই অনুরোধ তোমায় করি,
এ হেন উৎসাহ ধরিতে নারি ;
বিদ্যার নিষ্ক্রয় আবার যাহা,
স্বল্প হ'তে বহু অন্তরে তাহা। ২২
আবেদিলে বেদ-বিৎ এরূপে
দ্বিজ, দ্বিজরাজ-স্বরূপ রূপে,
দরিত হইতে বিরত-মতি
ভণে পুনঃ তাঁয় ভুবন-পতি। ২৩
শাস্ত্র সাগরের দেখিয়া পার,
গুরুরে দক্ষিণা দিবে যা' তা'র

২১। নির্ব্বন্ধ—জিদ্ ; রূঢ়—সঞ্জাত।
২২। নিষ্ক্রয়—মূল্য। স্বল্প হইতে বহু অন্তরে—স্বল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত ; অর্থাৎ পরিমাণে অত্যন্ত অধিক।

আশায় রঘুর সকাশে এ'সে
বিফল, অপর দাতার পাশে,
বিপ্র গত এক,—এ অভিনব,
অপবাদ আমি হ'তে না দিব। ২৪
প্রশস্ত অনল-আগারে মম,
তুমি হে চতুর্থ অনল সম,
দুই তিন দিন করহ বাস,
চেষ্টা করি তব পূরাতে আশ। ২৫
রঘুর প্রতিজ্ঞা,—অমোঘ সেত-
শ্রবণে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রীত,
তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করে ;
ধরা আত্তসারা এদিকে হেরে,
কুবের হইতে লইতে ধন,
অতীন্দ্র-বিক্রম করিল মন। ২৬
বশিষ্ঠ সিঞ্চিত সমন্ত্র-পয়
রথ করে তাঁর প্রভাবময় ;
ভূধরে সাগরে আকাশে চলে
যথা মেঘ সখা বায়ুর বলে। ২৭
অস্ত্র শস্ত্র আগে সজ্জিত রে'খে,
আরোহণ রথে রজনী-মুখে ;
কৈলাস-নাথেরে জিনিবে রণে,—
সামন্ত-সমানে তাহারে গ'ণে,
ভাবনা অন্তরে নাহিক লেশ,
প্রযত, নিদ্রায় নিশার শেষ'। ২৮

প্রভাতে যেমন ছুটিবে রথ,
কোষাধ্যক্ষ গণ জুড়িল পথ ;
'কোষাগারে বৃষ্টি হিরণ্ময়,
সবিস্ময়ে সবে, 'হয়েছে' কয়।' ২৯
যা' সনে সমর করিতে চলে,
সেই সে কুবের হইতে মিলে ;
এ হেতু তাবৎ কনক-রাশি,
বজ্রে ভিন্ন যেন পড়েছে খসি',
সুমেরু গিরির কতক কায়া,
দিল দ্বিজবরে না করি' মায়া। ৩০
তাঁদের উভের ব্যাপার হে'রে,
তখন মোহিত প্রজারা পুরে,
অর্থী অর্থ দিবে গুরুরে যাহা,
তাহার অধিকে না করে স্পৃহা ;
অথচ নৃপতি তাহা না শুনে,
প্রার্থনা-অধিক দিবেন দানে। ৩১
অশ্বতরী-শতে শতেক উটে,
সে ধন বহন করায়ে পিঠে,
স্থিত নরপতি আনত-শিরে ;
তখন পরশি তাঁহার করে,
মহর্ষি কৌৎস প্রস্থান-পর,
বলেন বচন প্রীতি-অন্তর। ৩২
যে যে প্রজাপতি ন্যায়ানুসারে,
অর্জ্জন বর্দ্ধন পালন ক'রে,
সুপাত্রে অর্থের করয়ে দান,
বসুমতী যদি তাদের মান,
অভীষ্ট প্রসব করিয়া রাখে,
তাহাতে বিচিত্র কিছু না থাকে ;
তব কিন্তু বল বুঝিতে নারি,
স্বর্গ হ'তে ইষ্ট দোহন-কারী। ৩৩
প্রার্থনীয় শুভ ইহ যা' আছে,
সকলি বিরাজে তোমার কাছে ;
আশীর্ব্বাদ যাহা করিব অন্য,
পুনরুক্তি ভাবে হইবে গণ্য ;
গুণে আত্ম সম তনয় লভ,
যেমন তোমায় জনক তব। ৩৪
রাজায় এ হেন আশিস্ দানে,
চলে কৌৎস নিজ গুরুর স্থানে ;
আশীর্ব্বাদে রঘু লভেন সুত,
ভানু হ'তে লোক আলোক যত। ৩৫
মহিষী কুমার কুমার-কল্প
প্রসবে অরুণ উদিলে অল্প ;
সে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সময় ধরি,
ব্রহ্মার নামের পর্য্যায় স্মরি,'
"অজ'নাম যাহা সহজ অতি,
আত্মজে রাখেন জগত-পতি। ৩৬
শরীর সুন্দর তাঁহারি মত,
তাঁহারি সমানে শূরত্ব-যুত,

উন্নতিও পুনঃ তাঁহার সম,
দীপ হ'তে জাত প্রদীপোপম,
কুমার স্বকীয় জনক হ'তে,
না ধরে প্রভেদ কোনও মতে। ৩৭

গুরুগণ হ'তে বিধান মত,
বিদ্যা নিধি হয় সঞ্চিত যত ;
যৌবন বিকাশে দেহের শোভা,
হইল অধিক মনোজ্ঞ কিবা ;
রাজলক্ষ্মী তদা তাঁহার প্রতি,
মনেতে যদিও বাসনাবতী,
রহিল গুরুর অনুজ্ঞা আশে,
কন্যা ধীরা যথা পিতার পাশে। ৩৮

এমন সময়ে বিদর্ভ-পতি
ভোজ ভগ্নী স্বীয় যে ইন্দুমতী,
স্বয়ম্বর তার হইবে ব'লে
করিল প্রেরণ রঘুর স্থলে
প্রত্যয় ভাজন জনেক দূতে,
আনিতে তদীয় যুবক সুতে। ৩৯

তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ইনি
স্পৃহনীয় বলি' মনেতে গণি'
দেখিয়া পুত্রেরো হইয়া এল
বিবাহ-ক্রিয়ার উচিত কাল,
সসৈন্যে তাঁহায় প্রেরণ ক'রে
বিদর্ভ-রাজের সমৃদ্ধ পুরে। ৪০

সুন্দর শিবির সকল সজ্জে,
শোভিছে সে সবে অশেষ রঙ্গে,
শয়ন আসন বসন ভূষা ;
উপহার কত সর্ব্বত্র আসা ;
রাজেন্দ্র সূনুর পথেতে স্থিতি,
উদ্যানে বিহার সম প্রতীতি। ৪১

ধূলায় ধূসর হয়েছে কেতু,
দেহ ক্লান্ত পথ লঙ্ঘন হেতু ;
এ হেন সেনায় নর্ম্মদা-তীরে,
নরেন্দ্র-কুমার নিদেশ করে ;
শীকরে শীতল সমীর খেলা,
করে নক্তমাল পাদপে ভালা। ৪২

উপরে ভ্রমর ভ্রমণ ক'রে
সূচিছে প্রবেশ করেছে নীরে,
—হেন তদা এক আরণ্য গজে,
সরিত হইতে উঠিল তেজে ;
গিয়াছে ধুইয়া মদের ধার,
গণ্ড ভিত্তি এবে অমল তা'র। ৪৩

গৈরিকাদি যদি ক্ষালনে অস্ত,
পাষাণে কুণ্ঠিত হ'য়েছে দন্ত ;

৩৯। বিদর্ভ—বিদর (বিরার)।

৪২। নক্তমাল (নক্তম্ + আল)—যে তরু নক্তম্ অর্থাৎ রাত্রিতে আলোকময় হয়।

নীল রেখা পুনঃ ভাতিছে তা'য় ;
সে যে ঋক্ষবান্ গিরির গায়,
শিলা উৎপাটনে করেছে খেলা,
এখনো সহজে যায় তা' বলা। ৪৪
তীর-অভিমুখে আসিছে ক'রে
সঙ্কোচ প্রসার কি দ্রুত ক'রে ;
তরঙ্গ সকলে করিছে চূর্ণ,
ধ্বনিতে বধির হ'তেছে কর্ণ ;
প্রবৃত্ত যেন সে করিতে ভগ্ন
অর্গল, বন্ধন-আগারে লগ্ন। ৪৫
আয়তনে যেন সে এক শৈল,
বক্ষে বদ্ধ কত শৈবাল হৈল ;
তটেতে আসিতে পিছু সে পড়ে
আশু স্রোতোবারি যাহা সে পীড়ে। ৪৬
জলাবগাহনে একাকী তা'র,
কপোল-ভিত্তির মদের ধার,
ক্ষণ মাত্র যদি অদৃশ্য ছিল,
গ্রাম্য গজ যেই নয়নে এল,
অমনি আবার তখনি ফুটে ;
ফুৎকার সমানে সবেগে ছুটে। ৪৭

সপ্তপর্ণতরু-ক্ষীরের প্রায়,
উগ্র গন্ধ তা'র প্রসার পায় ;
অসহ্য সে ঘ্রাণ আঘ্রাণ করি'
আছিল যতেক সমর করী,
যুগপৎ সবে ফিরায় মুখ,
না গণি' অঙ্কুশ-তাড়নে দুখ। ৪৮।
যুগ্য পশু যত বন্ধন ছিন্ন
করিয়া পলায় ; শিবির শূন্য ;
যুগের কীলক টুটিয়া গেল,
রথ বিপর্য্যস্ত কোথা বা হ'ল ;
বীরেরা ব্যাকুল হইল মনে,
বিপদে রক্ষিতে রমণীগণে ;
সে সেনা-নিবেশ ক্ষণেক কালে,
করী সে তুমুল করিয়া তুলে। ৪৯
লক্ষ্মীকামী নৃপ করীর প্রাণ,
রণে বিনা নাহি করিবে হান ;—
শাস্ত্রের একথা করিয়া মান্য,
সম্মুখীন সেই দ্বিরদে বন্য,
নিবৃত্ত করায়ে দিবার তরে,
ধনু না অধিক নমিত ক'রে,
কুমার শায়ক মোচন কৈল ;
গণ্ডস্থল তা'য় আহত হৈল। ৫০

৪৪। ঋক্ষবান্ গণ্ডোয়ানা দেশে ; উহা বিন্ধ্য পর্ব্বত-শ্রেণীর অন্তর্গত।
৪৫। করে অর্থাৎ শুণ্ডকে।
৪৮। সপ্তপর্ণ—ছাতিম।
৪৯। যুগ্য পশু—অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষ।

যেমন বাণের আঘাত পায়,
নাগরূপ তা'র ছুটিয়া যায় ;
স্ফুরন্ত প্রভার মণ্ডল মাঝে,
কান্ত ব্যোমচর বপুতে রাজে ;
ব্যাপারে বিস্ময়ে মগন সুখে,
সৈনিকেরা স্থির হইয়া দেখে। ৫১

কল্প তরু জাত কুসুম ভার
সমীপে আগত প্রভাবে তা'র ;
বরষি, তা' সব কুমার 'পরে ;
বক্ষের উজল মুকুতা-সরে
দশন-প্রভার মিলন করি',
বলে বাগ্মী হেন বচন ধরি'। ৫২

আমি হে গন্ধর্ব্ব-পতির সুত,
হই প্রিয়ম্বদ নামেতে জ্ঞাত ;
প্রিয়-দরশন পিতার নাম ;
আবাধিতে আসি' শিবের ধাম,
দুর্ব্বিনয়ে মম মতঙ্গ মুনি,
ঘটাইল শাপে মতঙ্গ-যোনি। ৫৩

শাপ শুনি' সেই পড়িনু পায়,
অমনি মৃদুতা আসিল তাঁয় ;
সলিল স্বভাব শীতল ধরে,
ভানু বহ্নি তায় তাপিত করে। ৫৪

কহে তপোনিধি তখন মোরে,
কুম্ভ তব ভেদ করিবে শরে,
ইক্ষ্বাকু বংশীয় মগন অজ,
পাইবে গন্ধর্ব্ব-শরীর নিজ। ৫৫

পোষিয়া ত্বদীয় দর্শন-আশা,
ধরি' কত কাল এ হেন দশা,
তোমা হ'তে শাপে হইয়া মুক্ত,
ওহে রূপ-গুণ-বিক্রমে যুক্ত,
প্রতিপ্রিয় তব যদি না করি,
বৃথা পুনঃ এই স্ব-পদ ধরি। ৫৬

লও সখি মম গান্ধর্ব্ব-বাণ,
ত্যাগে এক মন্ত্র সংহারে আন ;
সংমোহন নাম বাণ সে ধরে,
সে অস্ত্র প্রয়োগ যে জন করে,
অরি-হিংসা তা'র কিছু-না হয়,
করতল-গত অথচ জয়। ৫৭

লজ্জা মম প্রতি ছাড়িয়া দাও,
ক্ষণ যা' প্রহার ক'রেছ, তাও
সেধেছ করুণা-ভাবে যে কত,
প্রার্থনায় তুমি আমার অতঃ ;

৫১। ব্যোমচর—আকাশে গমনশীল।

৫৭। সংহারে—পুনর্ব্বার আনিবার জন্য। আন—অন্য, অর্থাৎ ভিন্ন।

প্রতিষেধ রূপ বিরূপ বাণী,
প্রয়োগ করোনা ওহে নৃ-মণি। ৫৮
এতেক শ্রবণে তথাস্তু ব'লে,
শুদ্ধ সোমোদ্ভবা রেবার জলে,
আচমন ক'রে উত্তরে আসা,
সোমের সদৃশ শোভন-দৃশ্য
শাপমুক্ত দেব-যোনি সে হ'তে,
অস্ত্র-মন্ত্র ল'ন উৎফুল্ল-চিতে। ৫৯
পথে এ প্রকারে দৈবের বশে,
যে দোঁহে অ-হেতু সখ্যতা আসে,
চৈত্ররথে এক চলিল তা'র,
সুশাসনে রম্য বিদর্ভে আর। ৬০
নগর উপান্তে অজ আগত,
ইহাতে আনন্দ প্রচুর জাত ;
বিদর্ভপতি সে প্রহর্ষ-ভরে,
প্রত্যুদ্গম তাঁর সদলে করে ;
প্রবৃদ্ধ কল্লোল-ঘটা প্রকাশি',
উর্ম্মিমালী যথা উদিলে শশী। ৬১
নম্রভাবে অগ্রে থাকিয়া তাঁয়,
নগর-ভিতরে লইয়া যায় ;
ছত্র চামরাদি রাজশ্রী যাহা,
প্রেমে সেবে তাঁয় প্রদানি' তাহা ;
সমবেত লোক ইহাতে বুঝে,
অজে গৃহপতি আগন্তু ভোজে। ৬২
ভোজ-পরিচর নতি পুরঃসর
দিল যা' নির্দ্দেশ করি',
প্রবেশ দুয়ারে বেদির উপরে
পূর্ণ কুম্ভ শোভে বা'সি,
মণ্ডপী বিচিত্র অভিনব তন্ত্র
বাস কিবা অজ করে,
যথা ফুলবাণ করে অধিষ্ঠান
দশা, যা' বাল্যের পরে। ৬৩
শয়নে নিশায় থাকিয়া তথায়
ধেয়ান হিয়ায় এই,—
কমনীয়া কন্যা রূপে গুণে ধন্যা
স্বয়ম্বর বসি' সেই,
রাজ লোক এত করিল মেলিত
দিবে কি না মোরে মালা ;
সে ভাব বুঝিয়া নিদ্রা যেন দুয়া
বিলম্বে আসিল বালা। ৬৪

৫৮। অতঃ—অতএব। বিরূপ—প্রতিকূল।

৫৯। নর্ম্মদা নদীর অপর দুইটী নাম রেবা ও সোমোদ্ভবা।

৬০। উত্তর দিকে কুবেরের সুরম্য উদ্যানের নাম চৈত্ররথ। আর—অপর।

৬৩। ফুলবাণ—কন্দর্প। দশা যা' বাল্যের পরে—বাল্যের পরবর্ত্তী দশা—যৌবন।

৬৪। দুয়া—দুর্ভগা অনাদৃতা স্ত্রী।

কর্ণ-আভরণ করে নিপীড়ন
স্থূল অংস দেশ কত,
শয্যা-আস্তরণে বহু বিমর্দ্দনে
কৃশ অঙ্গরাগ যত ;
সুপ্রবোধ বরে প্রবোধিত করে
উষায় ধরিয়া গান,
উদার বচনে সূত-সূত গণে
বয়সে তাঁর সমান !—৬৫
গত যে যামিনী ওহে গুণমণি !
শয়নে না বহ আর,
বিধাতা দ্বিভাগে রেখেছে বিভাগে
জগতের গুরু-ভার :
জনক তোমারি সুপ্তি পরিহরি'
তায় এক অঙ্কে ধরে,
অপরাস্ত-ভার হয় যে তোমার,
তোমার অপেক্ষা করে। ৬৬
তব প্রতি মন, তুমি দীর্ঘ ক্ষণ
নিদ্রার মায়ার ফাঁদে,
উপেক্ষিয়া তাহা, হেরে লক্ষ্মী আহা,
তুয়া মুখ-ছায়া চাঁদে ;
পশ্চিম গগনে এখন গমনে
শশীরো সে শোভা যায়,

তাই অসহায় গণে নিরুপায়,
শরণ বিতর তা'য়। ৬৭
তদাশ্রয়-ভূত শোভা সমন্বিত
যুগপত উন্মীলনে,
প্রাপ্ত হ'ক ভালা পরস্পর তুলা
দু'টি বস্তু এইক্ষণে ;—
তাবকা অন্তরে চঞ্চলে বিহরে
নয়ন হেন তোমার,
অন্তরে ভ্রমর বিচরে সুন্দর
এমন কমল আর। ৬৮
দেখহ কেমন প্রভাত-পবন
তরুর শিথিল ফুলে
বৃন্ত হ'তে হরে ; সঙ্গ গিয়া করে
নব-ফুল্ল পদ্মে জলে ;
পর গুণ হেন করে আহরণ
যেন সে মনন ধরে,
স্বতঃ সুরভিত নিশ্বাস মারুত
তব অনুকার করে। ৬৯
তরু-কিশলয় রক্তিম আশয়
পতিত তাহার রয়,
স্বচ্ছ সুবিমল যেন শুক্তিফল
শিশির শীকর চয় ;

৬৫। অংস দেশ—স্কন্ধ দেশ। সূত—স্তুতি পাঠক।

৬৬। সুপ্তি—নিদ্রা।

৬৭। তুয়া—তব। চন্দ্র রাজবদন ও পদ্ম—এই তিনটী লক্ষ্মীর প্রধান নিবাস-স্থান।

৬৮। তদাশ্রয়-ভূত—পদ্মালয়া লক্ষ্মীর আশ্রয় ভূত।

আধারে এমন আপের এ হেন
রূপ কি মোহন হরে,
দন্ত কান্তি-যুত যেন লীলা-জাত
স্মিত তব ওষ্ঠাধরে। ৭০

প্রতাপে পূরিত ভানু সমুদিত
হ'বার না রাখি' কালে,
তনয় তাঁহার অরুণ আঁধার
বিনাশ করিয়া ফেলে;
সমরে অগ্রণী বীর-শিরোমণি
তুমি হে যখন হ'লে,
জনক তোমার আপনি আবার
নাশিবে কি রিপুদলে? ৭১

আবদ্ধ আলানে তব করী গণে
ফিরিয়া উভয় পাশ,
সুপ্তি-ভোগ ক'রে শয্যা পরিহরে,
শব্দে কর্ষে লোহ-পাশ;
দশন-কুট্মল তা'দের সকল
তরুণ-অরুণ—ভায়
হইল রঞ্জিত, যেন বা ধর্ষিত
স-গৈরিক গিরি গায়। ৭২

দীর্ঘ শ্রেণী এই বাস-বাসে যেই
বনায়ুজ বাজী গণ,
ওহে বনজাক্ষ হইতেছে লক্ষ,—
নিদ্রা করি বিসর্জ্জন
করিবে লেহন বলিয়া লবণ
খণ্ড যাহা সিন্ধু জাত
স্কন্ধ সম্মুখেতে, বদন-মারুতে
মলিন তা' করে কত। ৭৩

পুষ্প-উপহার এবে ম্লানাকার,
রচনা সবার বিরল হয়;
প্রদীপ-শিখার প্রভূত প্রসার
হারায়ে বিস্তার সুতনু রয়;
তোমার স্বপন বিভঙ্গ কারণ
এই যে স্তবন আমরা গাই
শুনি' অনুকারে তব ও পিঞ্জরে
শুক কি মধুরে বলিছে তাই। ৭৪
এহেন বচন করিয়া রচন
বন্দিসুতগণ বন্দিল;

৭০। আধার—পাত্র। শুক্তি কল—মুক্তা। স্মিত—মৃদুহাস্য।

৭২। লোহ-পাশ—লোহ-শৃঙ্খল। কুট্মল—মুকুল; রক্ত-পুষ্প মুকুলের ভাবযুক্ত বলিয়া, রক্ত বাচক শব্দের সহিত মুকুল বাচক শব্দের একযোগে প্রয়োগ করণ। আভ—আভায়।

৭৩। বনায়ুজ—পারস্য দেশ-জাত। বনজাক্ষ—কমল-লোচন, (বন শব্দের এক অর্থ জল)
প্রাতে সেনা দমনের জন্য অশ্বদিগকে লবণ প্রদত্ত হয়। লবণের মধ্যে শূল নিবারক সৈন্ধব লবণ শ্রেষ্ঠ।

৭৪। পুষ্প শুষ্ক হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়ায় পুষ্পহার সকল মলিন ও হীনাঙ্গ হইয়াছে।
সু-তনু—অতি ক্ষীণ।

কুমার তখন বিগত-স্বপন
অমনি শয়ন ত্যজিল ;
মধু মদকলে মরাল সকলে
আরামে জাগালে যেমন,
সুর-তটিনীর সৈকত সুতীর
সুপ্রতীক ধীর বারণ। ৭৫

৭৫। সুপ্রতীক—দিগ্‌গজগণের মধ্যে ঈশান কোণের হস্তী।

মহাকবি দেশ ও পাত্র বিবেচনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সহিত প্রভাত বর্ণনা সমাপ্ত প্রায় করিতে করিতেই, তাঁহার উপমার মহাভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল।

চারু-আঁখি তখন উথানে,
বিধি যাহা দিবা-আগমনে,
সে সকল করে সমাপন ;
অনন্তর প্রসাধক গণ,
বিশেষ কুশল যা'রা ছিল,
অনুকূল বেশ রচি' দিল।
স্বয়ম্বর-স্থলে সেই বেশে,
ক্ষিতিপতি-সভা অজ পাশে। ৭৬

৭৬। প্রসাধক—বেশকারী।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ।

২৩।

পুরী হইতে ফিরিয়া আসার পর অশ্রু যেন কেমন একটু হইয়া গিয়াছিল। মনের যে সজীবতা, প্রফুল্ল ভাব, সপ্রতিভ আচার ব্যবহার আর তাহার ছিল না। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কত কি ভাবিত, একটা কাজ করিতে আর একটা কাজ করিয়া ফেলিত। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিত। আহারে রুচি ছিল না, আলাপে শান্তি পাইত না, বিশ্রামে তৃপ্তি ছিল না।

কিরণময়ী একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোর কি হয়েচে অশ্রু? আজ কাল আর তেমন হাসিস্ না, কথা ক'স না, সদা সর্ব্বদা যেন কি ভাবিস্! কি হয়েচে তোর?" অশ্রু বলিত, "কিছু হয়নি ত মা।" কিন্তু কিরণময়ীর মন ইহাতে আরও খারাপ হইয়া যাইত। কত দিন তিনি তাহাকে লইয়া বিন্দুবাসিনীর বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলেন। অশ্রু যায় নাই। অনেক করিয়া কিরণময়ী যখন ধরিয়া বসিতেন, তখন বলিত, "তুমি যাও মা; আজ আমার শরীর

ভাল নেই, কাল যাব' খন।" প্রত্যহই প্রায় সে এইরূপ একটা না একটা ওজর আপত্তি করিত। কিরণময়ী আর ইদানী যাইবার জন্য বিশেষ জিদ্ করিতেন না। কতবার রামটহল আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সুরেশের এবং বিন্দু-বাসিনীর নাম করিয়া সে অশ্রুকে লইয়া যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু অশ্রু যায় নাই। যাইবার জন্য তাহার সমস্ত বাসনা একত্র হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত সে প্রত্যহ ভাবিত আজ কিরণময়ী যাইতে বলিলে কিংবা রামটহল লইতে আসিলে নিশ্চয় যাইবে আজ আর কোন মতেই 'না' বলিবে না। কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে 'হ্যাঁ' বলিতে গিয়া 'না' বলিয়া ফেলিত। কেন যে এমন হইত অশ্রু নিজেই তাহার কারণ বাহির করিতে পারিত না। একটা কিসের শূন্যতা, কিসের অভাব সে প্রায়ই হৃদয়ে অনুভব করিত। যেন অতীতের ভয়ানক কিছু একটা এতদিন পরে ছুটীয়া আসিয়া বর্ত্তমানে অশ্রুকে নিষ্পেষিত করিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারে তাহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য টানাটানি করিতেছে। সেই অন্ধকারের একটা ছায়া, একটা আভাস, একটা প্রতিধ্বনি যেন সে কয়েক দিন হইতে বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইতেছে, শুনিতে পাইতেছে, বুঝিতে এবং অনুভব করিতে পারিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক সে যে কি তাহার বিন্দুবিসর্গও অশ্রু বুঝিতে পারিতেছিল না।

এইরূপ মনের অবস্থায় যখন সে বিন্দু-বাসিনীর একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেই রাত্রে কিরণময়ীর সহিত সুরেশদের বাটী গেল তখন অন্যবারের মত সেখানেও সে সুখ পাইল না, আনন্দ পাইল না, একটু স্বস্তিও পাইল না। অত দিন পরে ইন্দুর সাক্ষাৎ পাইয়া কোথায় হাসিয়া কথা কহিবে, ইন্দুর সৌভাগ্যে তাহাকে ধন্যবাদ দিবে। তা' না করিয়া নিভৃতে যাইয়া যত বিষাদের কথায় সময় কাটাইয়া দিল। সে রাত্রে সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই। একটা কথাও কহে নাই। সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সুরেশও করিয়াই ছিল। বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিরণময়ীর সহিত কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া অশ্রু একেবারে নিজের ঘরে যাইয়া খিল দিয়াছিল। সুরেশের সহিত সেই অপরিচিতার মত ব্যবহারে সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। শয্যায় শুইয়া উপাধানে মুখ গুঁজিয়া অশ্রু শুধু তাহাই ভাবিতেছিল। কখন যাহা করে নাই, আজ তাহা কেন করিয়া ফেলিল। এত দিন পরে আজ হঠাৎ সে একি করিয়া ফেলিল! কত

কাঁদিল। কত ভাবিল। সে রাত্রে অশ্রু মোটেই ঘুমাইতে পারিল না।

দুই দিন পরে যখন শুনিল সুরেশ গিরিডী চলিয়া গিয়াছে, সমস্ত অভিমান কালো মেঘের মত তাহার হৃদয় আকাশে ঘনাইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে কত ঝড় বৃষ্টিও হইয়া গেল। সে না হয় সে দিন কথা কহে নাই; তা' বলিয়া সুরেশ যাইবার সময় সাক্ষাৎ করিয়া গেল না কেন? তবে কি সে অশ্রুর উপর রাগ করিয়াছে? অশ্রুর তো কোন দোষ নাই। সে তো কথা কহিবার জন্য সেদিন অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। পারিল না তো সে কি করিবে? আবার অশ্রু ভাবিল দোষ তো তাহারই। যাইবার আগের দিন সুরেশ আসিয়া কতক্ষণ কিরণময়ীর সহিত কথা কহিয়াছে। একটী বারের জন্যও অশ্রু সেদিন ঘরের বাহির হয় নাই। কিরণময়ীর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে সুরেশ অনেক অনুরোধ করার পর অশ্রু ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল। কিন্তু সে ত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে নাই। সুরেশ আগেকারই মত হাসিয়া, ঠাট্টা করিয়া, কতরকম ভাবে অশ্রুর সহিত কথা কহিল কিন্তু অশ্রুর জিহ্বা সেদিন যেন কে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কাজে কাজেই সুরেশ যাইবার সময় একটু অভিমান করিয়াই বলিয়াছিল, "তাহ'লে তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কবে না অশ্রু? তা বেশ।" অশ্রু তখনও কোন উত্তর করে নাই। সুরেশ চলিয়া গেলে অশ্রু ঘরের ভিতর আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং চক্ষের জলে সমস্ত উপাধানটীকে ভিজাইয়া ফেলিল। তখন তাহার মনে হইল দৌড়াইয়া গিয়া সুরেশের পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনে, চক্ষের জলে তাহার সমস্ত অভিমান ধুইয়া ফ্যালে। একবার মনে করিল রতনকে পাঠাইয়া সুরেশকে ডাকিয়া আনুক, আবার ভাবিল নিজে যাইয়া সুরেশের কাছে ক্ষমা চাহিয়া আসুক। কিন্তু যখন কোনটাই সম্ভব হইয়া উঠিল না তখন শুধু কাঁদিয়াই সময় কাটাইয়া দিল।

সুরেশ গিরিডী চলিয়া গেলে ভাবিল বোধ হয় তাহারই পূর্ব্বদিনের এবং সেদিন রাত্রের ব্যবহারে সুরেশ বিরক্ত হইয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। কিন্তু বেচারা আবার ভাবিল ইহাতে তাহার দোষ কি! কি যেন একটা আজকাল তাহাকে সব কাজেই বাধা দিতেছে—হাসিয়া কথা কহিতে গেলে মুখ চাপিয়া ধরে, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলে কশাঘাত করে, কিছু একটা আশা করিলে তখনই নিরাশ করিয়া দেয়। সে যে আজকাল

সম্পূর্ণ সেই অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত, অচিন্তিত, এভাবের শক্তিতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার দোষ কি!

অশ্রুকে দেখিলেই কিরণময়ীর মুখ ভার, রতনের ভ্রূকুঞ্চন অশ্রুকে আরও সেই শক্তির কবলে শৃঙ্খলিত করিয়া দিত। তাঁহাদের পরিবর্ত্তনই তো অশ্রুর পরিবর্ত্তনের কারণ। অশ্রুর মুখে সুরেশের নাম শুনিয়া কিরণময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন, রতন বলিত, "ওসব কথায় কাজ কি দিদিমণি" ইত্যাদি। ইহাতে অশ্রু আও অশুভ চিন্তায় আরও কেমন হইয়া যাইত। কেন তাঁহারা আজকাল অত করিয়া অশ্রুকে সাবধান করেন। কিরণময়ী তো পূর্ব্বে এত চিন্তা করিতেন না; এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছেন। অশ্রুর প্রতি তাঁহার স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, যত্ন যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা এবং দীর্ঘশ্বাসের মাত্রাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি তো পূর্ব্বে এত চক্ষের জল ফেলিতেন না, অশ্রুকে এত চোখে চোখে রাখিতেন না। অশ্রু এই সব পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং সেইজন্যই সে আজকাল আরও কেমন হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত ভুলিয়া গিয়া নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে কে যেন তাহাকে সর্ব্বদাই বলিয়া দিত। ইহাতে সে যেন সুখ পাইবে—শান্তি পাইবে—তৃপ্তি পাইবে—ইহাও যেন কে বলিয়া দিত।

কিরণময়ীর নিজের চিন্তাও আছেই। উপরন্তু কন্যার চিন্তাক্লিষ্ট বদন, চোখের জল তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সুরেশের যাইবার একমাস পরেই তিনি রোগে পড়িলেন। রোগে পড়িয়াও তিনি অশ্রুকে কত বুঝাইয়াছেন কত সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহার হাসি হাসি মুখখানি দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইহাতে একেবারেই সফল হইতে পারিলেন না। অশ্রুকে বুঝাইতে গিয়া নিজেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন! তাহার চক্ষের জল মুছাইতে গিয়া নিজেরই চোখের জলে আঁচল ভিজাইয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার রোগ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। বুকের বেদনাটাও খুব বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারে বলিয়া গেল, "বেশী ভাববেন না। অধিক উত্তেজনায় হার্ট ফেল হয়ে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে।" কিন্তু কিরণময়ী সেদিন যেন তাঁর কিছুই চাপিতে পারিলেন না। এতদিন যাহা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, হৃদয়ের যে কথাটা হৃদয়েরই ভিতরে যত্নে চাপিয়া আসিয়াছেন, যাহার আভাস চোখের জল এবং

কথাব ইঙ্গিতে ভিন্ন আর কিছুতেই প্রকাশ পায় নাই এত দিন পরে সেটী যেন জোর করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তারদেব শেষ জবাব শুনিয়া অশ্রু বলিল, "মা. গিরিডীতে একখানা তাব কবে দেব?" কিরণময়ী বলিলেন, "না মা. তাব করে আব কি হবে। মিছি মিছি তাদের ভাবিয়ে দরকার নেই।" অশ্রু অনেক বাব বলিল, কিন্তু কিরণময়ী সেই একই কথা বলিলেন, "কি দরকার মা!"

কিছুক্ষণ পরে অশ্রুব একটী হাত নিজের বুকেব উপর রাখিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "মা, অনেক দিন থেকে তোকে একটা কথা বোলব মনে কচ্চি কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। আজকে আর না বলে থাকতে পাচ্চিনা। সেটা আমারি জীবনের একটা ইতিহাস।" কিবণময়ী কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অশ্রু বলিল, "আজ থাকনা মা। একটু ভাল হয়ে ওঠ। তারপর বোলো খন।" কিবণময়ী অশ্রুকে আরও কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "না মা সে কথা আজই বলতে হবে। যদি আর না বাঁচি। কাঁদিসনি অশ্রু। কাঁদতে এখন তোকে অনেক হবে। যেদিন তোকে আমি পেটে ধরেছিলুম সেই দিন থেকেই জানি, আমার জন্যে তোকে অনেক কষ্ট কত্তে হবে। এত দিন তুই ছোট ছিলি কিছু বলিনি। এখন বড় হ'য়েচিস্ আর ত তোকে না ব'লে থাকতে পারা যায় না।" সহসা অশ্রুর দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, সে কথা শুনলে আমায় ঘেন্না করবিনি! আমার অভিশাপ নিবিনি! যখন ভাববি আমারই দোষে, আমারই পাপে, তোব যত কষ্ট যত লাঞ্ছনা, তখন আমার ওপর বাগ করবিনি! বল, অশ্রু বল। এখন যেরকম ভক্তি করিস্, শ্রদ্ধা করিস্, ভালবাসিস্ আমি মরে গেলে আমার ইতিহাস শুনে আমায় এমনি ভাবেই ভালবাসবি?" অশ্রু বলিয়া উঠিল, "ওসব কি বলচ মা! মরবার কথা কেন বলচ?" অশ্রু আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। কান্না আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিরণময়ী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কারুব কাছে কখন দয়ার আশা করিস্নি মা। কারুর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করিস্নি যেন। আমি মরে গেলে রতন ছাড়া তোর আর আপনার বোল্‌তে কেউ থাকবে না। অশ্রু আমাদের সবাই তাড়িয়ে দিয়েচে—সমাজ তাড়িয়ে দিয়েচে, আত্মীয় স্বজন তাড়িয়ে দিয়েচে, নিজের বাপ মা পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েচে। কেন জানিস্? সে আমারই দোষে, আমরই পাপে।"*

অশ্রু এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়া কেবলমাত্র চক্ষের জল ফেলিতেছিল। মায়ের শেষ কথা শুনিয়া সে যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওকি কথা বলচ মা! সমাজ আমাদের তাড়িয়ে দেবে কেন? আমরা তো তাদের কিছু করিনি।"

কিরণময়ী বলিলেন, "করেচি বইকি মা, সমাজের চোখে আমরা অনেক পাপই করেচি। পাপ করিনি কিন্তু ভগবানের চোখে। হ্যাঁ অশ্রু ঠিক কথা, ভগবানের চোখে আমরা কক্ষণ পাপ করিনি।"

কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কেহই আর কোন কথা কহিল না। প্রায় মিনিট পনের পরে কিরণময়ী বলিলেন, "মা সে কথা আমি তোকে মুখে ব'লতে পারব না। তাহ'লে তুই আর আমায় 'মা' ব'লে ডাকবিনি; আমায় অভিশাপ দিয়ে এখান থেকে উঠে যাবি। অশ্রু, মা আমার, তোর মায়ের শেষ অনুরোধ মনে রাখিস্ মা—কখন যেন আমায় ঘেন্না করিস্‌নি, যেন কখন অশ্রদ্ধা করিস্‌নি। সমাজ না বল্লেও, আমি তোর মা। অশ্রু, আমি তোর মা। আমায় যেন কখন অবজ্ঞা করিস্‌নি। আর, অমনধারা করিস্‌নি মা, অমন ক'রে চাস্‌নি, আমি আজ সব কথাই তোকে বলে যাব আর একটা কথা শুনবি মা? যার, যার ঔরসে—"

কিরণময়ী হঠাৎ থামিয়া গেলেন দেখিয়া অশ্রু বলিয়া উঠিল, "মা, মা, ওমা মা, চুপ ক'রে আছ কেন কথা কও।" ধীরে ধীরে কিরণময়ী বলিলেন, "বুকের বেদনাটা বড্ড বেড়েছিল অশ্রু। কে যেন এসে নিশ্বেস্ বন্ধ করে ধরেছিল।" অশ্রু বলিল, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা করনা মা। বেশী কথা কইতে ডাক্তাররা যে মানা করে দিয়ে গ্যাছে।" কিরণময়ী বলিলেন, "আর কার জন্মে চুপ ক'রে থাকব অশ্রু? আর ত তার দরকার নেই। মরবার আগে সবই যে তোকে বলে যেতে হবে।" অশ্রু বলিল, "কেন খালি খালি মরবার কথা বলচ মা? তুমি মরে গেলে আমায় কে দেখবে? আমায় কার কাছে রেখে যাচ্চ মা?" কিরণময়ী বলিলেন "যিনি তোমায় পাঠিয়েছিলেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে যাচ্চি মা। মানুষ যাকে তাড়িয়ে দ্যায়, সমাজ যাকে পরিত্যাগ করে, ভগবান ছাড়া কে আর তাকে দ্যাখে মা।" অশ্রু বলিল, "মা আমায় ছেড়ে তুমি যেও না। আমার যে আর কেউ থাকবে না মা।" কিরণময়ী বলিলেন, "অশ্রু মরবার সময় আমায় একটু শান্তিতে মরুতে দে-মা। রতনকে রেখে গেলুম। সে আমার চাকর নয় অশ্রু, সে আমার পেটের ছেলে

তোর সহোদর ভাই। তাকে কখনও অবজ্ঞা করিসনি মা। আর দ্যাখ, কোন বিপদে আপদে পড়লে দিদির কাছে যাস্, সুরেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াস্। তারা মানুষ নয় অশ্রু। তারা স্বর্গের দেবতা। সবাই যদি তোকে তাড়িয়ে দ্যায়, তারা কখনও তাড়'বে না। তবে, তবে তারা আমার ইতিহাস শুনে—না, না, তা তারা পারবে না, তারা তোকে কখন ফেলতে পারবে না। অশ্রু তুই কখন দিদির কাছে মায়ের অভাব বুঝতে পারবিনি, সুরেশের কাছে কখন স্নেহের অভাব পাবিনি। উঃ অশ্রু আবার সেই বেদনাটা বেড়ে উঠেচে, উঃ উঃ উঃ! মা!"

অশ্রু বলিয়া উঠিল, রতনদাদা রতনদাদা মা কেন অমন ধারা কচ্চেন? মা, মা, ওমা মা! একটু সামলাইয়া লইয়া কিরণময়ী বলিলেন, "অশ্রু, ঐ বাক্সটার ভেতর একটা চিঠি আছে, আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকব সেটাতে হাত দিস্‌নি। আমি মরে গেলে তাকে ফেলে দিস্। ঠিকানা লিখে রেখেচি। ঠিক যায়গাতেই যাবে। আর আর ঐ সিন্দুকটার মধ্যে একটা লালরঙের খাতা পাবি। আমি মরে গেলে সেটা পড়ে দেখ্‌বি তাহলেই বুঝতে পারবি আমার কিসের বেদনা কিসের জ্বালা, কিসের অশান্তি! অশ্রু একবার 'মা' বলে ডাক্ শুনে যাই, ঐ নামই শুনতে শুনতে চলে যাব। বল্ অশ্রু আবার বল্, আবার আমায় মা ব'লে ডাক্। মা, মা, মা, অশ্রু আমি তোর মা। পৃথিবীর চোখে, মানুষের চোখে, সমাজের চোখে আমি যতই কেন পাপী হই-না, দোষী হই-না, খারাপ হই-না, অশ্রু তোর কাছে আমি তোর মা। ডাক্, অশ্রু, আবার একবার 'মা' বলে ডাক্—যদি আর 'মা' বলে না ডাকিস্, যদি আমায় ভুলে যাস্, আমায় ভাবতেও যদি ঘৃণা বোধ করিস্।" অশ্রু কিরণময়ীর বুকের উপর মুখ লুকাইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, মা, ওকথা বলচ কেন মা? তুমি যে আমার মা। যাই কেন তোমার ইতিহাস থাক না। লোকে যতই কেন তোমায় ঘৃণা করুক না, তুমি ত চিরকালই আমার মা' থাকবে মা। আমার কাছে তুমি যে সকলের চেয়ে পবিত্র, সকলের বড় মা।" কন্যাকে জড়াইয়া কিরণময়ী বলিয়া উঠিলেন, "আর, আর, অশ্রু, যাঁকে তুই কখন দেখিস্‌নি, যাঁর নাম তুই কখন শুনিস্‌নি, যাঁর তুই মেয়ে, তাঁকে কখন ঘৃণা করিস্‌নি, অবজ্ঞা করিস্‌নি। তিনি তোর পিতা, তিনি আমার চেয়ে পবিত্র, আমার চেয়েও বড়।" কিরণময়ী আর কিছু বলিলেন না। দুইহাতে অশ্রুকে নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন অশ্রুও নিস্তব্ধভাবে সেইখানে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিল।

হঠাৎ কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া অশ্রুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং কিরণময়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রতন পায়ের কাছে বসিয়াছিল, বলিল "কাকে ডাকচ দিদিমণি! মা যে অনেকক্ষণ আমাদের ছেড়ে চ'লে গ্যাছেন!" অশ্রু অস্ফুটস্বরে একবার শুধু 'মা' বলিয়াই জননীর বক্ষের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ

জীবে প্রেম।

(শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী)

জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক হউক বা ঈশ্বরের অংশই হউক—জীবে প্রেম ঈশ্বরেই প্রেম। যে জীবকে ভালবাসে না, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে ভাল বাসে না। জীবে জীবে একত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। জীবকে ঈশ্বর বোধই পরাভক্তি।

জীবকে যদি ঈশ্বরের অংশ ভাব, তাহা হইলে এক একটি বৃক্ষকে স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিয়া যেমন বনের ধারণা করা যায়; সেইরূপ এক একটি জীবকে ভালবাসিতে পারিলে পরিণামে সেই ভালবাসাই উৎকর্ষতা লাভ করিয়া অহেতুক প্রেমে পরিণত হয়। জীবভাবে প্রেম ব্যষ্টিভাবে, ঈশ্বর রূপে প্রেম সমষ্টিরূপে ইহাই পার্থক্য। কেহ ব্যষ্টিভাবে কেহ বা সমষ্টিভাবে প্রেমের অনুশীলন করিবে। এ বিষয়ে অধিকারিভেদে পৃথক্ ব্যবস্থা।

আর জীবকে ঈশ্বর হইতে যদি পৃথক্ ভাব, তবে জীবকে সন্তান ঈশ্বরকে পিতা; কিম্বা জীবকে দাস ঈশ্বরকে প্রভু এইরূপ একটি সম্বন্ধ মনে করিতে হইবে। জীব যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন জীবকে ভালবাসিলে, জীবের দুঃখ দূর করিলে সন্তান-বৎসল পিতার আনন্দ হইবেই। কোন্ স্নেহময় পিতারই বা না হয়; ঈশ্বর যখন জীবের প্রভু; জীবের ভালমন্দের দায়ী তখন, সেই জীবকে ভালবাসা, জীবকে দেখা, জীবের উপকার করা তাহারই কার্য্য। আদর্শ প্রভু দাস স্থানীয় জীবের কষ্টে কষ্ট পাইবেন। ঈশ্বর আদর্শ প্রভু।

জীব-প্রেম ঈশ্বর প্রেমেরই বহির্বিকাশ। জীবের দুঃখে যিনি কাঁদেন, জীবের হাহাকার যিনি উপশম করিবার চেষ্টা করেন, জীবের উপকারের জন্য যিনি মনপ্রাণ নিযুক্ত রাখেন, তিনিই মহাত্মা, তিনিই দেবতা।

জীব সাধারণতঃ স্বার্থপর, কামনার দাস। নিজের স্বার্থের জন্য যেটুকু আবশ্যক ততটুকুই সাধারণতঃ জীব জীবকে ভালবাসে। জীব যদি জীবকে যথার্থ ভালবাসিত, তবে শ্রীভগবানকে আর জীব-প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য কষ্ট করিয়া অবতার গ্রহণ করিতে হইত না। জীব জীবের প্রতি উদাসীন বলিয়াই শ্রীভগবান্ মধ্যে মধ্যে নিজের বিভূতি দিয়া এক একটি মহাপুরুষকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরের কার্য্য জীবেরই করা উচিৎ। শ্রেষ্ঠ জীব বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের না করিলেই প্রত্যবায় ধর্ম্মের লক্ষণ জীবহিত—ইহা মহাভারতের উপদেশ, বুদ্ধের মত। জীব, নারায়ণ। সকল জীবের মধ্যেই নারায়ণ বাস করেন—ইহা সাধারণ চলিত কথা। "আহা কৃষ্ণের জীব"—মেয়েমানুষেও সচরাচর এই কথা বলিয়া থাকে। যেখানে স্নেহ মমতা স্বার্থ সেই খানেই "আহা কৃষ্ণের জীব"—ইহা জীবপ্রেমের কথা নহে।

জীব যাহাতে ঈশ্বরলাভজনিত সুখশান্তি লাভ করিতে পারে, সে আনন্দরসাস্বাদ পাইয়া তৃপ্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত;—সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা)। ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে না। প্রাণ নিশ্চল, অকারণে পুড়িতৎ নাড়ীতে অবস্থিত আছে। মন ও নিজের চিন্তা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ইন্দ্রিয় মন প্রাণে একতান। মন প্রাণ পরমাত্মায় একতান। জীবাত্মাকে যাঁহারা পরমাত্মা হইতে পৃথক মানেন, তাঁহাদের মতে মনপ্রাণ জীবাত্মায় বিলীন আর জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন থাকে।

সুষুপ্তিকালেই জগতের সকল জ্বালার বিরাম—সুষুপ্তিতেই এক শান্তি। সুষুপ্তিকালেই ব্রহ্মানন্দ লাভ। তবে সে আনন্দ অজ্ঞানে অনুভব হয়। এই জীবের উপর ভগবানের এমনই দয়া। প্রত্যহই তাহাদিগকে অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দ সুখ দান করিতেছেন। সেই দয়াময় শ্রীভগবানের জীব-প্রীতি দেখিলে মনে হয় না কি, জীবে প্রেম না করা মানবের কত বড় অন্যায়। শ্রীচৈতন্য জীব প্রেমের যে প্রবাহ বহাইয়া গিয়াছেন—তাহা এবিশ্বে অতুল্য।

"মেরেছো কলসীর কানা
তা বলে কি প্রেম দিব না?"

রামানুজ স্বামী সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ হইবে জানিয়াও মন্ত্রদান করিয়া জীব প্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। এইখানেই মহাপুরুষত্ব।

শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া যাহা

বিতরণ করিয়া গেলেন, মহাপুরুষের জীবনে যাহা দেখাইয়া গেলেন, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাহার মাহাত্ম্য নানাপ্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন—সেই জীবপ্রেম যে মানবের একমাত্র বড় ধর্ম্ম তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? "জীব শিব"। "তত্ত্বমসি ব্রহ্ম"।

ভক্ত বলেন, জীবপ্রেমই—ভগবৎলাভের উপায়। পরম ভক্ত বলেন, জীব প্রেমই—ভগবৎ প্রেম। জ্ঞানী বলেন-যে সর্ব্বজীবে দয়াময় সেই প্রকৃত সমদর্শী।

পঞ্চমকার তত্ত্ব।

(কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর রায়)

পঞ্চ মকার বলিতে আমরা কি বুঝি? মৎস্য মাংস, মদ্য, মুদ্রা মৈথুন। তন্মধ্যে মৎস্য—জলজ-প্রাণীবিশেষ, যাহা জালিকগণ বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে। মাংস—খেচর, ভূচর ইত্যাদি প্রাণীর প্রাণ হনন করিয়া রসনার তৃপ্তির নিমিত্ত যাহা সংগৃহীত হয়। মদ্য মাদক দ্রব্যবিশেষ, বর্ত্তমানে যাহা শৌণ্ডিকগণ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মুদ্রা—টাকাকড়ি বা খাদ্যদ্রব্যবিশেষ যাহাকে আমরা চাট্ বলিয়া থাকি। মৈথুন—স্ত্রীসহবাস বা রমণ, ইহাই বুঝিয়া থাকি, ইহার অধিক আমাদের আর শিক্ষা নাই, পিতৃ পিতামহের নিকট এই শিক্ষাই করিয়া আসিতেছি। লোকসমাজে ইহাই পঞ্চমকার নামে অভিহিত। সুতরাং আমাদের ধ্রুববিশ্বাস এই প্রকার পঞ্চমকার একত্রে চেষ্টিয়া করিতে পারিলে পরমার্থ বা মোক্ষলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ কোনরূপে একটা কালী বা অপর কোনরূপ দেবতার প্রতিমা খাড়া করিয়া কতকগুলি ছাগ মেষ মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর প্রাণহনন ও কিঞ্চিৎ মদ্য পান করিয়া বুলিতে পারিলে আর মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত কোন সৎক্রিয়ারই প্রয়োজন নাই। ইহাই হইল অবাধে বৈকুণ্ঠ যাইবার চরম পন্থা। আজ আমাদের এরূপ বিপরীত বুদ্ধি না হইলে এত অধঃপতন কেন? এত পরপদ লেহনই বা করিতে হইবে কেন?

যত্র বিবেকবুদ্ধিবিহীনা মানবাঃ তিষ্ঠন্তি তত্র তে কথং পরপাদহতা ন ভবেয়ুঃ।

যেখানে বা যে দেশে বিবেকবুদ্ধিবিহীন বিচারশক্তিশূন্য মানবগণ বাস করে, সেখানে তাঁহারা কেন পরপদ লেহন না করিবে।

যখন বৈদিক বা উপনিষদের যুগ ছিল, লোকে বিচারশক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন না, ছাপ্পান্নগণ্ডা সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই, এই ভারতবাসী বিজ্ঞানের চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন কি গৃহী কি বাণপ্রস্থী সকলেই কিছু না কিছু বিজ্ঞান চর্চ্চা বা যোগ অভ্যাস করিয়া থাকিতেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ইহা এক প্রকার অঙ্গের ভূষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুশাস্ত্র বা কুসংস্কার আসিয়া একবারে আস্ত আঁটি সমেৎ গিলিয়া ফেলিতে পারে নাই, চাতুর্ব্বর্ণ্য সংস্থান সত্বেও একতা ছিল, পরস্পর হিংসা দ্বেষ বড় একটা করিতেন না। জাতি-ভেদ তুলিয়া দিয়া এখনকার মত একতা বন্ধনের জল্পনা কল্পনা করিতেন না। এক কথায় বলিতে গেলে ভারত তখন সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন ছিল। কুশাস্ত্র বা কুসংস্কারের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না কাজেই তৎকালীন তাঁহাদের বিচারশক্তি অন্তর্দ্ধিত হইতে পারে নাই, এই হেতু শাস্ত্র বলিতেছেন যে কুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানীদিগেরও জ্ঞানাপত্তি ঘটিয়া থাকে।

যদুক্তং কুর্ম্মে—

কুশাস্ত্রাভ্যাসযোগেন মোহয়ন্তীহ মানবান্।
ময়া সৃষ্টা ন শাস্ত্রাণি মোহায়ৈষাং ভবান্তরে॥

২২৯ ১২ অ।

কুর্ম্মপুরাণ বলেন—যে সকল কুশাস্ত্রের দ্বারা মানবগণ মোহিত হন তাহা অসুরদিগের মোহের নিমিত্ত মৎকর্তৃক ইহজগতে সৃষ্ট হইয়াছে।

তথাচোক্তম্—

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপাতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥

(১৪৪পৃঃ পরাশরভাষ্য)

স্বয়ং বিষ্ণু ও শিব উভয়ে পরামর্শ করিয়া কাপাল, নাকুল বাম, ভৈরব, পূর্ব্বপশ্চিম, পাঞ্চরাত্র, পাশুপাত, প্রভৃতি অন্যান্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যজ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবপাশুপতাদিকং।
তথাপি যোহংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোহংশঃপ্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্।

ঐ ১৪৫পৃঃ।

হে দেবি! যে সকল মোহশাস্ত্র শ্রবণমাত্রেই জ্ঞানীদিগেরও জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, তন্মধ্যে প্রথমেই মৎকর্তৃক শৈব-পাশুপাত প্রভৃতি কয়েকখানি মোহশাস্ত্র প্রস্তুত হয়। তাহা হইলেও এই সকল শাস্ত্রে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে তাহা কোন কোন

অধিকারিদিগের পক্ষে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, অতএব হে আর্য্যগণ, আপনারা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন্? আজ আমরা কুশাস্ত্রের দ্বারা মোহিত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া আসুরিক ধর্ম্মকে স্বধর্ম্মবোধে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি বা করিয়া থাকি নতুবা দ্বিজগণের ইহা ধর্ম্ম নহে, হইতেও পারে না। আর্য্য বা অনার্য্যের ধর্ম্ম কোন শাস্ত্রেই এক বলিয়া উক্ত হয় নাই, এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ বা উপবঙ্গ ব্যতীত কোন স্থানেই দ্বিজগণ শূদ্রের ন্যায় প্রাণীহিংসা করিয়া ধর্ম্ম যজনা করিয়া থাকেন না এবং মৎস্য মাংস ভোজীও নহেন। এমন কি, দ্বিজবিশেষে ধর্ম্ম বা কর্ম্মেরও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। যদুক্তম্—

কর্ম্ম বিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥
দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ।
বার্ত্তা শূদ্রস্য শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্মচ॥
ময়ৈব ধর্ম্মোঽভিহিতঃ সংস্থিতো যত্রবর্ণিনঃ।
বহুমানমিহপ্রাপ্য প্রয়ান্তি পরমাং গতিং॥

অত্রিসংহিতা।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ম্ম, তন্মধ্যে যজন দান অধ্যয়ন এই তিনটি তপস্যা বা ধর্ম্ম। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপনা ও যাজন, এই তিনটী জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের ৫টী কার্য্য যজন, দান, অধ্যয়ন, এই তিনটী ধর্ম্ম। অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণীরক্ষা, এই ২টি জীবিকা। বৈশ্যের—যজন দান অধ্যয়ন এই তিনটী ধর্ম্ম; বার্ত্তা, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, শুল্ক-গ্রহণ এই ৪টী জীবিকা। এই তিন প্রকার দ্বিজের ত্রিবিধ ব্যবস্থা শাস্ত্রকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শূদ্রের দ্বিজসেবাই ধর্ম্ম, শিল্পকার্য্যই জীবিকা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে রত থাকিলে ইহলোকে বহুমান ও পরলোকে পরম গতি লাভ করেন। মহর্ষি অত্রি বলে—মৎকর্ত্তৃক এই চারি বর্ণের ধর্ম্মের কথা বলা হইল।

পাঠক! আমরা কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আসুন্ এক্ষণে গন্তব্যপথ অনুসরণ করিয়া দেখি—প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক, না জানিয়া না বুঝিয়া আমরা শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছি।

যদুক্তং তন্ত্রে।—

ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু সভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥
মাশব্দে রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদাযোভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীস্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মতত্ত্বৈব দেবেশি ; কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটী প্রতীকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলম্।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্॥
মুদ্রাতত্ত্বমিতি জ্ঞেয়ং স এব মুদ্রাসাধকঃ।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্॥
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

যোগশাস্ত্রে বলিতেছেন—ঈড়া দক্ষিণনাসা পিঙ্গলা বামনাসা, এই উভয় নাসাপুটে সর্ব্বদা যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হইতেছে তাহাই মৎস্য নামে অভিহিত। যে যোগী যোগক্রিয়া দ্বারা তাহা স্থির করিয়া সুষুম্না পথে বায়ু চালনা করিতে পারেন, তাঁহাকেই মৎস্য সাধক বলে। হে দেবি মা-শব্দে রসনা (জিহ্বা) বলিয়া জানিবে অংশ শব্দে রসনার প্রিয়বস্তু (বাক্য) বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি সাধনা দ্বারা তাহা সর্ব্বদা ভক্ষণ (সংযম) করেন, তাঁহাকেই মাংস-সাধক বলে। হে শঙ্করি প্রাণিগণের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে প্রতিক্ষণ যে সোমধারা ক্ষরণ হইতেছে তাঁহাই মদ্যনামে অভিহিত।

যে যোগী তাহা পান করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহাকেই মদ্যসাধক বলিয়া জানিবে। হে ঈশানি! দেহের মধ্যে সহস্রারে যে মহা-পদ্ম আছে তাহাতে যে কর্ণিকা মুদ্রিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন তাহা আত্মতত্ত্ব বলিয়া কথিত। হে দেবি! উহা পারদের ন্যায় তরল ও কোটী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, কোটী চন্দ্রের তুল্য সুশীতল এবং উহা অতীব কমনীয় ও মহাকুণ্ডলিনীর সহিত সংযুক্ত, ইহাকেই মুদ্রাতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যে যোগী এই মুদ্রা বিষয় অবগত আছেন তাঁহাকে মুদ্রাসাধক বলে। মৈথুনই পরম তত্ত্ব ইহাই সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের কারণ, এই দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ মৈথুন (পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় মিলন) হইতেই সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনকেই মৈথুন, বলে, নতুবা ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাকে প্রকৃত মৈথুন বা রমণ বলে না। "মৈথুনং সঙ্গতৌ রতে" ইত্যমরঃ। মৈথুন শব্দে মিলন ও রমণ বুঝায়। "রমতীতি রামঃ" যিনি রমণ করেন তাঁহাকে রাম বলে। যদুক্তং—

রেফস্তু কুঙ্কুমাকারং কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাজনস্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারোহংসমারুহ্য একতা চ যদাভবেৎ।
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুনিশ্চিতম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মরামস্তদুচ্যতে।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্॥

মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥

হে প্রিয়ে রেফ অর্থাৎ রকারটি কুঙ্কুম আকার-বিশিষ্ট, ব্রহ্মকুণ্ডে অবস্থিত। মকারটি বিন্দু সদৃশ, মহাজন বা সিদ্ধ যোগিগণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। আকারটি হংস (যিনি সার গ্রহণ করেন) নামে অভিহিত। যৎকালীন যোগী বা সাধকগণ সাধনাদ্বারা ইহাদিগকে এক করিয়া লন, তৎকালীন নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহানন্দ লাভ করেন। আত্মাতে যিনি রমণ করেন বা মিলিত হন, ঋষিরা তাঁকেই আত্মারাম বলিয়া থাকেন, সুতরাং রামনামটী তারক ব্রহ্মনামে অভিহিত হইয়াছে। হে মহেশ্বরি, মৃত্যুকালে যিনি এই দুই অক্ষর বিশিষ্ট রামনামটী স্মরণ করেন বা করিতে পারেন তিনি সমূহ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ংই ব্রহ্মময় হইয়া যান। তথাহি—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মোঽভিধীয়তে॥

(ইতি পদ্মপুরাণম্)

যোগিগণ সিদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দরূপ পরমাত্মাতেই রমণ করিয়া থাকেন একারণ এই রাম শব্দে সেই পরব্রহ্মকেই অভিহিত করা হয়।

যোগ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমেই ষড়ঙ্গ পূজার বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। একারণ এইস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল, তদ্যথা—

আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্য মনুলেপনং॥
জপোহি রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ময়াগোপ্যং মমপ্রাণাধিকাপ্রিয়ে॥
ষড়ঙ্গপূজনাদ্দেবি; সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি॥

(মহার্ণবতন্ত্র ও পঞ্চদশী)

ন্যাসকেই কেহ কেহ আলিঙ্গন করা বলে। ধ্যানই চুম্বন বলিয়া কথিত। দেবতার আহ্বানকেই শীতকার এবং অনুলেপনকে নৈবেদ্য বলে। জপই (জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন করাকেই) রমণ বলে। রেতঃপাতই দক্ষিণা নামে অভিহিত। "রেতঃপাতঞ্চ তন্ময়ম্" ইতি নির্ঘণ্ট। ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হইয়া যাওয়াকেই রেতঃপতন বলে! হে প্রিয়ে হে প্রাণাধিকে; সর্ব্বদা ইহা আমি গোপন করিয়া থাকি অর্থাৎ মানবগণ সহজে এই প্রকার ষড়ঙ্গ পূজার বিষয় অবগত হইতে পারেন না। হে দেবি; এই প্রকার ষড়ঙ্গ পূজার দ্বারাই সর্ব্বমন্ত্র সিদ্ধ হয়। এখন বোধ হয় সকলে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন পঞ্চমকার জিনিষটা কি? এবং ইহা কিরূপ করিয়াই বা সাধন করিতে হয়। এই প্রকার পঞ্চমকার সাধন করিতে পারিলে পরমার্থিক লাভ হয় নতুবা আমাদের কুসংস্কার

বশতঃ কুশাগ্রাঙ্কুরূপ অথবা কতকগুলি প্রাণির প্রাণ হনন বা মদ্য পান ইত্যাদি কার্য্য করিয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে পরমতত্ত্ব লাভ হয় মনে করা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরন্তু ইহাতে নরকের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য।

(শ্রীসন্তোষকুমার দাস, এম্‌-এ।)

Ruskin বলিয়াছেন "সমগ্র জাতির মনীষা ও শ্রদ্ধা শিল্পোৎকর্ষের নিদান।" সুতরাং প্রাচীন ভারতের শিল্পের রসাস্বাদন করিতে হইলে, প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণের মনীষা ও শ্রদ্ধা স্বভাবতঃ কোন্ পথের অনুসরণ করিত, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। আমরা জানি বৈদিক সভ্যতা অন্তর্মুখ এবং বৈদিক আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ পারত্রিককর্ম্মপর ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের মনীষা চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পের পরিপুষ্টিসাধনে বিশেষ কোনও সহায়তা করিয়াছে এমন মনে হয় না। তখন পল্লীসকল অসংশ্লিষ্ট ছিল। প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক জেলা, এমন কি প্রতি গ্রাম স্ব স্ব উৎপন্নের উপর নির্ভর করিত। তখনও জাতি বিভাগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই সকলকেই কিছু কিছু শিল্পকর্ম্ম করিতে হইত।

ক্রমে কতকগুলি পল্লী লইয়া রাজ্য সংস্থাপিত হইল বর্ণভেদে বৃত্তি-ভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু রাজারা পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় বাণিজ্য শিল্পের ভাগ্যে তত উন্নতিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। যতদিন একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত না হইয়াছিল ততদিন বাণিজ্য শিল্প প্রসার লাভ করে নাই। খণ্ডরাজ্যগুলিকে অধিকার পূর্ব্বক একচ্ছত্র সাম্রাজ্য সংস্থাপন মহারাজ নন্দের পূর্ব্বে কেহই করেন নাই।

নন্দবংশ নাশের পর মগধেই মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটগণের অভ্যুদয়। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নানাস্থানে পল্লী, নগর ও জনপদ শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইল। বাণিজ্যসম্ভার ও পণ্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণার্থ যাতায়াতের পথ নির্ম্মিত হইল।

রাজধানী মগধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মগধ ভারতের শিল্পবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইল। সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মাগধগণ ঐহিক

কর্ম্মনিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাদের সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান সভ্যতার ন্যায় বহির্ম্মুখ ছিল বলিয়া, তাঁহারা বাণিজ্যশিল্পে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল। ভারত শিল্পেতিহাসের দ্বারদেশেই মৌর্য্যসম্রাট অশোকের মহিমময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি শিল্পিকুলকে সাতিশয় উৎসাহ দান করিতেন। তখন কৃষিই লোকের প্রধান শিল্প ছিল। জলবায়ুর গুণে ও ভূমির উর্ব্বরতায় কৃষকেরা প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত। রাজধানী পাটলিপুত্রে ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী নগর ও পল্লীসমূহের সূক্ষ্ম কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রে, কারুকার্য্য শোভিত পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার ও ধাতুতৈজস দেশে সর্ব্বত্রই নির্ম্মিত হইত। স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কারের মধ্যে কঙ্কণ, অঙ্গুরীয়, মেখলাদিকটিসূত্র, নূপুরাদি পাদাভরণ, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। সিংহল, যাভা ও চীনদেশের সহিত সমুদ্র পথে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত। ভারত হইতে কারুকার্য্য শোভিত রৌপ্যের ও কার্পাস নির্ম্মিত পরিচ্ছদ, চাউল, হীরক প্রভৃতি সকলদেশে রপ্তানি হইত। সিংহল হইতে ভারতে মুক্তা আমদানী হইত।

এই সমুদ্র-বাণিজ্যের ফলে ভারতের কূলে কূলে সাহসী নাবিকগণের পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল। তমলুক তখন শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। কিন্তু মৌর্য্যশিল্পের মধ্যে ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, দারু ও প্রস্তর তক্ষণই শ্রেষ্ঠ ছিল। মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের আদেশানুসারে নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ ও সভামণ্ডপগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন (৫০৯ খৃঃ অঃ)—"দানবগণ (spirits) এমনভাবে পাষাণের উপর পাষাণ বিন্যস্ত করিয়া প্রাচীর তোরণগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং কমনীয় কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্য সম্পাদিত করিয়াছিল, যাহা পৃথিবীর কোনও মানুষশিল্পী সম্পাদন করিতে পারিত না।"

মধ্যযুগে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে, ভারতীয় বণিকেরা মুরসিদাবাদ ও চন্দ্রকোণার কার্পাস বস্ত্র, কাশ্মীরের শাল দোশালা, ঢাকার মসলিন, বারাণসীর নানাবিধ কারুকার্য্য শোভিত পরিচ্ছদ, কটকের স্বর্ণ ও রৌপ্যতারের জড়োয়া কাজ (filigree work), দক্ষিণভারতের হীরক ও মুক্তা, হিমালয় প্রদেশের মৃগনাভি, মরিচ ও বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্য আরব বণিকদিগকে বিক্রয় করিত। এতদ্ভিন্ন কাশী ও মোরাদাবাদের ধাতু তৈজস, আহম্মদাবাদের দারু-তক্ষণ, শিলং, মহীশূর ও কানাড়ার চন্দনকাষ্ঠশিল্প, সুরাটের শুক্তি শিল্প ও ভিজাগাপাত্তানের দ্বিরদশিল্প পৃথিবীতে কিরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল তাহা

অনেকেই জানেন। ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে এই সকল পণ্য-দ্রব্য ইউরোপীয় বণিকদিগের নিকট অধিকতর মূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রেতার সংখ্যা ও লাভ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল।

একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলেন "যেখানে শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসায়ের প্রসার লক্ষ্য করিবে সেখানেই জানিবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আগত প্রায়। আর যদি কোথায়ও দেখ স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িতেছে, সেখানেই বুঝিবে, জনগণের আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন জাতি অন্নকষ্টে মরে না। আবার অন্নকষ্ট দূর হইলে, পরাধীনতাও পলাইয়া যায়। তাহা সমাজ চরিত্রের স্বাভাবিক গতি। যখনই মানুষ ধনসম্পদের অধিকারী হয়, তখনই সেইগুলি রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এইগুলি রক্ষা করিবার এবং বংশানুক্রমে ভবিষ্য সমাজের জন্য সঞ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য আবশ্যক। কাজেই ঐশ্বর্য্য-শালী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা (স্বাধীনতা) পাইতে চায়।"* ভারত সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বাধীন হইতে পারিত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিবাদ ও সংগ্রাম ভারতের ক্ষমতা বিকাশের অন্তরায় ছিল। † এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই অসংখ্য দলাদলি ও গৃহবিবাদ ছিল। ভারতের এই অনৈক্য দেখিয়া বিদেশীয়গণ বিরোধ ও গৃহ-বিবাদ বাড়াইয়া দিতে চেষ্টিত থাকিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ভারতের নানা-প্রদেশ আক্রমণ করিয়াও বসিতেন। সুতরাং অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন-শক্তি সত্ত্বেও ভারত স্বাধীন হইতে পারে নাই।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানের অনতি-পূর্ব্বে East India Company ভারতে এক-চেটিয়া ব্যবসায় স্থাপনে সচেষ্ট হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সে একাধিপত্যের বিলোপ সাধিত হয়। কেহ বলেন—ইংরাজাধিকার হইতে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য-শিল্পের যে অমিত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এরূপ ইতঃপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। অপরপক্ষ বলেন—ভারতে মুসলমানের পর ইংরাজের আগমন হইতে ভারতের শিল্পকলা লোপ পাই-তেছে। উভয়পক্ষের বক্তব্যেই কিছুনা কিছু সত্য নিহিত আছে। বস্তুতঃ ইংরাজরাজত্বের সূচনাবধি ভারত-শিল্পের একপক্ষে যেমন উন্নতি অপর পক্ষে তেমনই সমূহ অবনতিই সাধিত হইয়াছে। বন্দরাদি স্থাপন, রেলপথ নির্ম্মাণ, জলপথ

* ফ্রেডারিক লিষ্ট।

† c.f. ইতালী।

নির্ণয়াদি দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। সুয়েজ খাল খনন দ্বারা আমদানী রপ্তানী উভয়েরই বিশেষ সুবিধা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতে জগদ্বিখ্যাত শিল্পের অবনতি ঘটিল কিরূপে?—প্রধানতঃ তিনটী কারণে ইহার অবনতি ঘটিয়াছে। সে কারণ গুলি এই:—

(১) পূর্ব্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সুলভ বলিয়া সাধারণলোকের অর্থ উদ্বৃত্ত হইত। তদ্দ্বারা দেশসম্ভব ভোগবিলাসের বহুমূল্য শিল্প পণ্যাদি ক্রয় করিয়া শিল্পিকুলকে উৎসাহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য মহার্ঘ্য হওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে লোকে শিল্পপণ্য ক্রয় করিতে পারে না।

(২) বর্ণভেদে বৃত্তিভেদনীতি শিথিল হওয়ায় সকল বর্ণই সর্ব্ববিধ বৃত্তিতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে অনেকানেক বর্ণগত শিল্প বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

(৩) জাতীয়তার শৈথিল্যে এদেশীয় শিল্প-বিশেষের যেমন অবনতি ঘটিল, বিজাতীয়গণ সেই সুযোগে তাহাদের দেশজাত কল-কব্জার সাহায্যে প্রস্তুত সুলভ পণ্য প্রচলনে সচেষ্ট হইলেন। লোকের সুলভ প্রীতিও কল-কব্জা-প্রস্তুত বিদেশীয় পণ্যবিস্তারের সহায়তা করিল। আবার বিদেশীয় সুলভপণ্যের বহু প্রচলনে এতদ্দেশজাত শিল্প পণ্য বিলুপ্তপ্রায় হইল।

যাহা হউক এক্ষণে কর্ম্মপ্রবণ ইংরাজের ও অন্যান্য পাশ্চাত্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারত ক্রমে কল-কারখানার দিকে নজর দিতেছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের বহির্বাণিজ্য শনৈঃ শনৈঃ প্রসার লাভ করিতেছে। ১৯০৪-৫ সালে আমাদের রপ্তানী ১৭৪ কোটী টাকার এবং আমদানী ১৭৩ কোটী টাকার ছিল; কিন্তু ১৯১৩-১৪ সালে সেই রপ্তানী ২৫৬ কোটী টাকায় এবং আমদানী ২৩৪ কোটী টাকায় গিয়া পৌছাইয়াছে।

ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্যের একটু বিশেষত্ব আছে। আমাদের এখানে মজুর সস্তায় পাওয়া যায় এবং দ্রব্যোপকরণ আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। অথচ ভারত পাশ্চাত্যজাতিগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহার কারণ আমরা এখনও কলকারখানায় অভ্যস্ত হইয়া উঠি নাই। ভারত গ্রীষ্মপ্রধানদেশ। অল্প পরিশ্রমেই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি। Outdoor work এবং কলকারখানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনী আমাদের ধাতে সহ্য হয় না। তাহা ছাড়া বহির্বাণিজ্য করিতে গেলে Exchange Bank এর নিতান্ত প্রয়োজন। বাহিরে Credit

না থাকিলে মহাজনেরা ধারে জিনিষ পত্র ছাড়িতে চাহেন না। সুতরাং ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি সাধন বর্ত্তমান অবস্থায় বড় কঠিন ব্যাপার, আমরা এখন সমগ্র পৃথিবীকে কেবল কাঁচা মাল (Raw materials) রপ্তানি করি এবং তাহার পরিবর্ত্তে তৈয়ারীমাল (manufactured articles) গ্রহণ করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতে তুলা উৎপন্ন হয়, আর সেই তুলা বিদেশে বস্ত্রে পরিণত হয়; সেই বস্ত্র ভারতে আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে। আমাদের দেশের চামড়া বিলাতে জুতায় পরিণত হইয়া আমাদের শ্রীপদে বুটাকার ধারণ করে। এই-রূপে আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যই বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বে আমরা আমাদের তাঁতে প্রস্তুত কাপড় পরিধান করিতাম। কিন্তু বস্ত্রবয়নের কলের আবিষ্কারের পর হইতে Manchester আমাদের তাঁতের ব্যবসায়ে ঘা দিয়াছে। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়িগণ কাপড়ের ব্যবসায়ে বিদেশীয়গণের সহিত সমকক্ষতা করিতেছেন। ভারতের ২৬৮টী কাপড়ের কলের মধ্যে ১৭৮টী বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। এক্ষণে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য Manchester হইতে সুতার আমদানী কম হওয়ায় কলওয়ালাদের বিপদ ঘনীভূত হইয়াছে। ইহাদিগের রক্ষা করিবার জন্য Government তিনটী Presidency Bank কে আদেশ দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পাট বাঙ্গালার প্রধান কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য; পাটের উপকারীতা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় নীলের চাষ ছিল। তাহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালায় রেশম উৎপন্ন হইত। চীন ও জাপান যখন বাঙ্গালার রেশমের কাজ এবং জার্ম্মানী নীলের কাজ গ্রাস করিয়া বসিল, তখন ভগবান্ বাঙ্গালাকে পাটের একচেটিয়া কারবার দেন; যুদ্ধের জন্য এক্ষণে জার্ম্মানী হইতে নীল আর রপ্তানী না হওয়ায় ভারতে আবার উহার চাসের কথা উঠিতেছে। ভারতে পাটেরকল ৬৫টী ও পাট পিষিবার কল ১২০টী। ৬৫টী পাটের কলের মধ্যে ৬২টী বঙ্গদেশে অবস্থিত।

ভারতে লৌহ কারখানাও আছে। তন্মধ্যে Tata Ironworks at Kalimati প্রাসিদ্ধ, ইহা German experts দ্বারা পরিচালিত। জয়পুরের এনামেলের কার্য্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আমরা অল্পপরিমাণে কাগজও উৎপন্ন করি।

শ্রীরামপুরের কল প্রমুখ কাগজের কল ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯টী। এখনও কাশ্মীর ও পেশবারে শাল আলোয়ান, ধলিদা প্রভৃতি শীতবস্ত্র উৎপন্ন হয়। ভারতে পশমের কল ৭টী।

যদিও কল কারখানার দিকে আমরা মনঃসংযোগ করিয়াছি, তথাপি ভারতের এই বিরাট ৩৩ কোটী জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই (শতকরা ৬৫ জন) কৃষি শিল্পের * উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বে যাহারা শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা এক্ষণে শিল্পকর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ও জাতিগণের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট এই শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ কৃষি-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এবং যৌথ ঋণদান সমিতি স্থাপিত করিয়াছেন। ক্রমশঃ

* See page 114 of Anni Beasant's 'Wake up India.'

শুক্রনীতি সার।

পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।

প্রজাগণ রাজাবিহীন হইলে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হয় না। যেহেতু রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক। রাজাও আবার প্রজাবিহীন হইলে পৃথিবীতে শোভা পান না। অর্থাৎ যে রাজার প্রজা নাই তিনি রাজপদ-বাচ্যই নহেন ॥ ৬৬ ॥

নৃপতি ন্যায়-পরায়ণ হইলে আপনাকে এবং প্রজাবর্গকে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-লাভার্থ উদ্‌যুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন। অন্যথা অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ না হইয়া আত্মপরায়ণাদি দোষযুক্ত হইলে আপনাকে এবং প্রজাবর্গকে নিশ্চয়ই নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির ন্যায়পরায়ণ হইয়া স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক দ্বৈতবনে বাসস্থান করিতে করিতেও স্বর্গভোগ-সুখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং নহুষ নামক নৃপতি অন্যায় পরায়ণ হইয়া অধর্ম্মাচরণ করতঃ রসাতল গত হইয়াছিলেন [অগস্ত্যমুনির শাপে নহুষ নৃপতি ইন্দ্রত্বপদ হইতে স্খলিত হইয়া অজাগরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন] ৬৮

বেণ নামক নৃপতি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়েন এবং তৎপুত্র পৃথু নামক রাজা ধর্ম্মবলে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অতএব নৃপতি ধর্ম্মাত্মা হইয়া ন্যায়তঃ অর্থার্জ্জনে যত্নবান হইবেন ॥ ৬৯ ॥

যে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ তিনি দেবতার অংশ-

সমূত এবং যিনি বাক্যের অংশজাত, তিনি ধর্ম্মলোপকারী ও প্রজাগণের পীড়ক কুৎসিৎ নৃপতি হইয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

এই সমগ্র জগৎ অরাজক হইয়া ধর্ম্মহীন হইলে বিধাতা ইহার রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র পবন যম সূর্য্য অগ্নি বরুণ চন্দ্র ও কুবের এই অষ্ট দেবতার তেজস্বী অংশ গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটী নূতন ধর্ম্মপ্রাণ রাজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৭১—৭২ ॥

ইন্দ্র যেমন নিজের তপোবলের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর জগতের অধিপতি হইয়া যজ্ঞাংশভাগী হইয়াছেন, রাজাও সেইরূপ তপস্যা দ্বারা প্রজারঞ্জক হইয়া প্রজাকে রক্ষা করিতে পটু হইলে প্রকৃত রাজকরগ্রাহী হইতে সমর্থ হয়েন ॥ ৭৩ ॥ বায়ু যেমন গন্ধকে প্রেরণ করেন, রাজাও তদ্রূপ সৎ ও অসৎকর্ম্মের প্রেরক হয়েন। সূর্য্য যেমন অন্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনকারী রাজাও তেমনই অধর্ম্ম নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥ যম যেমন দণ্ডকর্ত্তা রাজাও তেমনই দুষ্কর্ম্মা (পাপী) ব্যক্তিদিগের শাসক। অগ্নি যেমন পবিত্র হইয়া সমস্ত দেবগণের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন; রাজাও সেইরূপ পবিত্রমনা (বিলাস-ব্যসনাদি শূন্য) হইয়া সমস্ত প্রজাদিগের রক্ষার্থ ভাগভোগী (করগ্রাহী) হইয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥ বরুণ যেমন জলরাশি রসের দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করেন, রাজাও তেমনই স্বকীয় কোষগত অর্থ রাশির দ্বারা প্রজাগণকে পোষণ করিয়া থাকেন। চন্দ্র যেমন কিরণ দ্বারা জগৎকে আহ্লাদিত করেন, রাজাও তদ্রূপ দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণাবলী এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণকে আহ্লাদিত করেন ॥৭৬॥

কুবের যেমন অক্ষয় ধন-ভাণ্ডারের অধিপতি, রাজাও তদ্রূপ ধনরাশির সঞ্চয় ও রক্ষণে পটু হইলে প্রকৃত ধনশালী হইয়া থাকেন। ধনরাশি সঞ্চয়ের প্রয়োজন—চন্দ্র যেমন ষোল কলাতে পূর্ণ না হইলে শোভমান হয়েন না, রাজাও সেইরূপ বিপুল রত্নান্বিত কোষাগার ব্যতীত শোভা পান না ॥৭৭॥

পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, গুরুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ধনাধিপত্ব ও দণ্ডধরত্ব এই সপ্তগুণ দ্বারা রাজা সর্ব্বদা ভূষিত থাকিবেন। নচেৎ তিনি কিছুতেই প্রজারঞ্জক হইতে পারিবেন না। অর্থাৎ যে রাজা পিতার ন্যায় কর্ত্তব্য ব্যপদেশে কঠোর, মাতার ন্যায় সর্ব্বদা স্নেহপরায়ণ, আচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মপথ দর্শক, ভ্রাতার ন্যায় হিতাভিলাষী, বন্ধুর ন্যায় সদয় ব্যবহারী, ধনাধিপ হইয়া সম্পদে বিপদে ধনদাতা এবং শোভন দণ্ড ধারণ করতঃ অধর্ম্মাচরণে দণ্ডদাতা, তিনিই প্রকৃত রাজা ॥৭৮॥ক্রমশঃ

যা'বার বেলা।

(শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী)

ভূতের বেগার ছেড়ে দেরে,
বস্‌নি মুটের বোঝা আর ;
ধুঁয়ায় ধূলায় ঘুরে ঘুরে,
হস্‌নি অস্থি চর্ম্ম সার।
শতেক ধাঁধাঁর ঘোরে পড়ে,
যাস্‌নে ওরে আঁধার বাঁকে ;
খোয়াস্‌নে তুই পুঁজি পাটা,
ডুবিয়ে ভেলা ঘূর্ণী পাকে।

রেহাই দে তুই ঘোরা ঘুরি,
আঁখি মেলে দেখ্‌রে চেয়ে ;
কোন ঘাটে সে পারের তরী,
কোথায় খেয়া দিচ্ছে নেয়ে।
দিন গেলে দিন আর পাবি না,
তবুও কেন কচ্ছিস্ হেলা ?
বাজে কাজ কি ছাড়বি না তুই,
হয়নি কি তোর যা'বার বেলা ?

অনুযোগ।

(শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়)

১

ওগো ও পরাণ বঁধু
জীবনের যত পুজা আরাধনা
ব্যর্থ যাবে কি শুধু !
আছিল গো সাধ বড় মনে মনে
বসাব তোমারে এ হৃদি আসনে
মিটাব পিয়াসা অবিরত পানে
তব, নির্ম্মল প্রেম মধু !
ওগো ও পরাণ বঁধু
জীবনের যত সঞ্চিত আশা
ব্যর্থ যাবে কি শুধু !

২

তোমার চরণ ধূলা
বাসনা অহে মাখিয়া নিভাই
তপ্ত হৃদয় জ্বালা
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে

পূজিব তোমার ও ছুটী চরণে
রচিয়া অর্ঘ্য ভকতি গ্রহণে
ঢালিব ভরিয়া থালা—
সাজাব তোমারে মনের মতন
পরায়ে প্রীতির মালা

৩

তোমার মধুর হাসি
ধ্বনিবে হৃদয়ে পুলক মন্দে
ঢালিবে অমিয় রাশি।
তব রাগিণীর স্বর্গীয় সুরে
পাপ তাপ আদি মোহ যাবে দূরে
মুছিবে তপ্ত নয়নের নীরে
হৃদয় দৈন্য রাশি

৪

আমি শুনেছি গো লোকমুখে
এই, জগতের তরে প্রেমের তটিনী
বহিছে তোমার বুকে।
তুমি বিতর তাদের আশীষ পুণ্য
হরিছ তাদের দুঃখ দৈন্য
ভরিয়া দিতেছ বক্ষ তাদের
নিত্য নবীন সুখে
সত্য কহে কি লোকে ?

৫

তবে, হে মোর পরাণ বঁধু
আমার তপ্ত হৃদয়ে কেন গো
অনল জ্বলিছে ধূ ধূ
কোন অপরাধে মৃগ পিপাসায়
তপ্ত হৃদয় দহে যাতনায়
(যখন) জগতের তরে বক্ষে তোমার
সঞ্চিত প্রেম মধু—
শুকাইল তব প্রেমের তটিনী
আমার বেলা শুধু
হে মোর পরাণ বঁধু !

কেলেঙ্কারী।

(গল্প)

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ)

১।

সেদিন মনে হইলে এখনও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি কেলেঙ্কারী! কি ভুল! কি ভুল! মানুষ কখন যে কি করিয়া ফেলে নিজেই তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারে না। কিন্তু একবার দোষটী

বুঝিতে পারিলে সারা জীবনটা অনুতাপে কাটে। আমারও তাহাই হইয়াছে। একদিনের একটী ঘটনায় সারা জীবনটা আমার অনুতাপের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি কেলেঙ্কারী! কি ভুল!—তাহাও আবার যেখানে সেখানে নহে, বাড়ীতে নহে, বন্ধুমহলে নহে, একবারে গৃহিণীর সম্মুখে ষ্টেশনে! ছিঃ ছিঃ! সেই ভদ্রলোকটী কি মনে করিল! আহা! নিরীহ বেচারা, নির্দ্দোষী বেচারা, ভালমানুষ বেচারা অনর্থক অত লোকের সম্মুখে মার খাইল! ছিঃ ছিঃ আমায় ধিক্! আমার স্বভাবকে ধিক্! আমার লেখাপড়া শিখিয়া পাশ করাকে ধিক! আমার যুক্তিকে ধিক!—আর ঘোমটার ভিতর হইতে সেই চক্ষু দুটি! মনে হইলে এখনও আমার দেহে কাঁটা দ্যায়! বিস্ময়, ভয়, লজ্জা, কৌতুক, তিরস্কার সমস্তই সেই চক্ষু দুটীতে মাখান ছিল। আর সেই ভদ্রলোক যিনি আমায় অসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, বন্ধুর মত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এইরূপ অসৎব্যবহার! তাঁহাকে সন্দেহ! তাঁহাকে প্রহার! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

২।

কলেজের একটা কোন দীর্ঘ অবকাশ হইলেই আমার প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করে। সেবারেও গ্রীষ্মের ছুটীতে মনটা বড় উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। গরমটাও সেবারে কিছু বেশী পড়িয়াছিল। একে গ্রীষ্মের তাপ, তাহার উপর বিরহানলে আমার অন্তঃকরণ দগ্ধপ্রায়। সুতরাং প্রাণটা যে উড়ু উড়ু করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমার শ্বশুর মহাশয় তখন বাঁকিপুরে থাকিতেন। প্রথমে সেখানে যাইব স্থির করিয়াছিলাম। পরে অনেক যুক্তি করিয়া দেখিলাম যে, অনাহুত অবস্থায় সেখানে যাওয়া কোন মতেই আমার উচিৎ নয়। কিন্তু হায়! বিধির বিপাক কে খণ্ডাইবে! উপর্য্যুপরি চার পাঁচ খানা আঁকা বাঁকা অক্ষরে পত্র আসিয়া আমার সমস্ত কাঠিন্য সরল করিয়া দিল—বিরহানলে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। বাহির জগতের উত্তাপের সহিত অন্তর্জগতের উত্তাপ মিশিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। তখন মনে পড়িল :—

"পিরীতি পিরীতি কিরীতি যুবতী
হৃদয়ে লাগয়ে সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে?

* * * * *

পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।

বিষম অনল নিবাইলে নহে
হিয়ায় রহল শেল ॥" ইত্যাদি।

সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। মনে করিলাম বাঁকিপুরেই প্রথম যাইব। তৎক্ষণাৎ একটী টাইম টেবল কিনিয়া কোন ট্রেণে যাইব কখন যাইব সমস্তই স্থির করিয়া ফেলিলাম। একশিশি এসেন্স, খান কতক সাবান, গোলাপী রঙের চিঠির কাগজ ও খাম প্রভৃতি বাজার হইতে কিনিয়া আনিলাম। বাড়ীতে মাকে একটী পত্র লিখিয়া দিলাম, "তুমি আমায় অনেক করে যেতে লিখেছ বটে কিন্তু সামনে একটা পরীক্ষা আছে ব'লে এছুটীতে যেতে পাল্লাম না।"

রাত্রি নয়টা আন্দাজের সময় আহারাদি শেষ করিয়া ছাদে আসিয়া বসিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া একমনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। চাঁদ উঠিয়াছিল কিনা জানিনা; তারা ছিল কিনা বলিতে পারিনা, মেঘ উঠিয়াছিল কিনা দেখি নাই—কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। তবে এটা বলিতে পারি, তখন আমার সুনীল হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল, যে অভিমানের মেঘ ছায়া দিয়াছিল তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছিল. সমস্ত হৃদয়টা তখন জ্যোৎস্নায় ভরা, মলয়ানিলে ভরপুর।

এমন সময়ে সুখের স্বপ্নে বাধা পড়িল। সতীশ আসিয়া ডাকিল "শ্যাম।" সতীশ আমার সহপাঠী। তাহাকে বলিলাম, "এত রাত্তিরে হঠাৎ আগমন, ব্যাপার কি?" সতীশ বলিল, "একবার দেখতে এলুম রাধিকার বিরহ অনলে পুড়ে কতটা ছাই হলে।" আমার 'তাঁর' নাম রাধিকা। আমি হাসিয়া বলিলাম, "না ভাই, বিরহ, অভিমান, যা কিছু ছিল সব কেটে গ্যাছে। আমি কালই বাঁকিপুর যাচ্চি। বাস্তবিক ভাই আমায় না দেখতে পেয়ে রাধিকা মনমরা হয়ে গ্যাছে। সে লিখেছে :—

"কানুসে জীবন জাতি প্রাণধন,
এছুটি নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি,
নিমিষে নিমিষ হারা॥

* * * * *

ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়।
কুলবতী হইয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥"

আর একখানা চিঠিতে লিখেছে :—

"বঁধুহে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥

শিশু কাল হৈতে ; আন্ নহি চিতে
ওপদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রাজাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটী হয় শতকোটী
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিও বলে অবলা অখলে
যা হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোহা বঁধু বিনে
আর কেহ নাই মোর ॥”

সতীশ বলিল, “এতে যে তোমার অভিমান দূর হবে তার আর আশ্চর্য্য কি ?” আমি একটু হাঁসিলাম মাত্র। সতীশ বলিল, “ওহে, একটা কার্জ কল্লে হয় না ? আমাকেওত এবার বাঁকিপুর যেতে হবে। তা চল না কেন মধুপুর, শিমুলতলা, বদ্দিনাথ এসব গুলো দেখে যাই।” সতীশের প্রস্তাবে প্রথমটা আমি আপত্তি করিলাম। অত জায়গা দেখিয়া বাঁকিপুর যাইতে হইলে বড় বিলম্ব হইয়া যাইবে। সতীশের কি ? সে ত আর শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে না। বিলম্ব হইলে তাহার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সতীশ ছাড়িবার পাত্র নহে। অবশেষে স্থির হইল, মধুপুর প্রভৃতি দেখিয়া দুইজনে এক সঙ্গেই বাঁকিপুর যাইব। তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম যেন দুই দিনের বেশী কোথাও না থাকা হয়—একদিন হইলেই ভাল, নেহাৎ যদি না হয় ত দুদিন।

৩।

যখন ট্রেণে উঠিলাম, তখন বেলা ১২টা। রৌদ্রের তাপ অতীব প্রচণ্ড, আমাদের গাড়ীতে আশাতীত জনতা। যাহা হউক, ট্রেণ ছাড়িল। রৌদ্রের ভয়ে সকলে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। প্রত্যেকের উষ্ণ নিশ্বাসে সমগ্র গাড়ীখানি বেশ গরম হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ীতে একখানি পাখা ও এক কুঁজো জল আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি ও সতীশ ঠ্যাসাঠেসিতে এবং গরমে প্রায় সিদ্ধ হইয়া উঠিলাম। আমার তালু পর্য্যন্ত তৃষ্ণায় শুকাইয়া উঠিল। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া একটী যুবক, আমাদেরই সমবয়সী হইবে, তাঁহার হস্তস্থিত পাখাটী আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—“এ গরমে একটা পাখা নিয়ে বেরুননি।” আমার তালু শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি উত্তর করিতে পারিলাম না। সতীশ বলিল,—“তাড়াতাড়ীতে ভুল হ'য়ে গ্যাছে।” অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম তাঁহার নিকট পানীয় জল আছে। জল পান করিয়া আধুনিক

আদপ কায়দার মত তাঁহাকে আমার আন্তরিক সহস্র ধন্যবাদ জানাইলাম। কথায় কথায় তাঁহার সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। তবে সভ্যতা অনুসারে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা অসভ্যতা বলিয়া আমরাও তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না এবং তিনিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। যুবকটী দেখিতে বেশ অমায়িক ভদ্র, সভ্য, ধীর, শান্ত। তাঁহার কথাবার্ত্তা চালচলনও বেশ ভদ্রলোকের মত। চোখে সোণার চশমা, হাতে হাত-ঘড়ী, পায়ে পম্প শু', পরণে আদ্দির পাঞ্জাবি। রংটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানদের মত হাড় বার করা চুল কাটা ছিল না। সব রকমেই যুবকটী বেশ ভদ্রলোক। এমন লোকের প্রতি আমার যে সন্দেহ হইবে এবং নীচাশয় ব্যবহার করিব—তাহা আমি আশাও করি নাই।

ক্রমে রাত্রি হইল। একটু ঠাণ্ডা পড়িল। গাড়ীর ভিড়ও অনেক কমিয়া গেল। বাসা হইতে কিছু খাবার আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বাজারের খাবার আমি বড় একটা কিছু খাই না। কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে সেই ভদ্রলোকটী তাঁহার খাবারে ভাগ বসাইতে আমাদের অনুরোধ করিলেন। আমরাও দুই একবার সভ্যতার খাতিরে 'না' 'না' করিয়া বেশ চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় করিয়া আহার করিলাম। পাখার বাতাস হইতে আরম্ভ করিয়া জলপান ও রাত্রে আহারের জন্য আমরা যুবকটীর নিকট ঋণী হইলাম।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। ঘুমাইয়া অনেক স্বপ্ন দেখিলাম। একবার মনে হইল রাধিকা যেন আমার পা জড়াইয়া বলিতেছে "ওগো, কেন তুমি এতদিন আসনি? তুমি কি নিষ্ঠুর! তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া নেই?" এই কথা বলিয়া রাধিকা যেন অভিমান করিয়া বসিয়া রহিল। আমি কত মান ভঞ্জনের চেষ্টা করিলাম, কত সাধ্যিসাধনা করিলাম। কিন্তু রাধিকা আর আমার সহিত কোন কথা কহিল না। অবশেষে আমি যেই সোহাগ ভরে তাহাকে হৃদয়ের উপর তুলিয়া লইব, এমন সময়ে কি একটা গোলমাল হওয়াতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম একটী বেশ বড় ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন বেশ ভোর হইয়া গিয়াছে। সতীশকে তুলিলাম। যুবকটী যেদিকে শুইয়াছিলেন সেদিকে চাহিয়া দেখি তিনি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া সতীশকে বলিলাম,—"ভদ্রলোক গেল কোথায় রে?" সতীশ বলিল,—

"জামুয়ে নাব্‌বার কথা ছিল, বোধহয় সেই খানেই নেবে গ্যাছে।" আমি বলিলাম,— "আমাদের ব'লে যেতে হয়।" সতীশ বলিল,— "ঘুমুচ্ছিলুম বলে বোধহয় কিছু বলে নি," সতীশ কখন কাহারও খারাপ দেখিতে পাইত না। আমার কিন্তু একটা মহৎ দোষ আমি সব জিনিষের খারাপ দিকটা প্রথমে দেখি। যাহা হউক আমি দেখিলাম আমাদের সব দ্রব্যাদি ঠিক আছে। কিছুই চুরী যায় নাই।

৪।

গত কল্য বৈদ্যনাথে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কোন কার্য্যবশতঃ দু'দিন বেশী এখানে থাকিতে হইল। আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা প্রকাশ করা যায় না। একদিন তপোবন দেখিবার জন্য আমি আর সতীশ যাত্রা করিলাম।

তপোবনটী বৈদ্যনাথ হইতে কয়েক ক্রোশ হইবে। স্থানটী দেখিয়া আমরা খুব প্রীত হইলাম। মুনি ঋষিরা সংসার ত্যাগ করিয়া তপোবনে আসিয়া কেন তপস্যা করিতেন তাহা এখানে আসিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তপোবনটী উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর অবস্থিত, বেশ নিস্তব্ধ ও মনোরম। উপরে উঠিবার জন্য পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা গণিয়া দেখিলাম সিঁড়ির ধাপ হাজারের বেশী হইবে। অনেকগুলি গুহা আছে। গুহার ভিতর নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। দেখিলাম একটী গৌরাকৃতি সন্ন্যাসী একটী গভীরতম গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

পরম প্রীত হইয়া আমরা ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় সেই যুবকটীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এখানে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কাল আমি বৈদ্যনাথ এসেছি। আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের সঙ্গে দ্যাখা হ'য়ে গেল।"

আমরা তিনজনে কথা কহিতে কহিতে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত মহুয়া গাছ ও মহুয়া ফল দেখিতে দেখিতে বাসায় ফিরিলাম। যুবকটীর অনুরোধ এড়াইতে না পারায় সে রাত্রে তাঁহার বাসাতেই ভোজন করা গেল। তাঁহার নিকট এই চতুর্থবার ঋণী হইলাম।

সেই যুবকটির সহিত বদ্যিনাথে আর দ্যাখা হয় নাই। আমরা এখন মধুপুরে আসিয়াছি। আজ রাত্রেই শিমুলতলা রওনা হইব। দুপুর বেলা বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। আমি আর সতীশ পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং কতপ্রকার কবিত্ব করিতেছি। প্রাণ খুলিয়া "ধন ধান্যে পুষ্পেভরা"

গানটী গাহিতেছি এবং কত কবির কবিতা [illegible]তেছি। এমন সময়ে দেখিলাম সেই যুবকটীর মত কে একজন ঐ পাহাড়টার পাশ দিয়া নামিয়া যাইতেছে। সতীশকে দেখাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "ও মশাই, ও মশাই" তিনি বোধ হয় শুনিতে পাইলেম না। নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেম। সতীশকে আমি বলিলাম "হ্যাহে লোকটা C. I. D. নয়ত? আমাদের follow করে নি ত? সতীশ বলিল, "ক্ষেপেচ, তোমার যেমন ভয়!" আমি একটু বেশ সন্দিগ্ধ চিত্তেই বলিলাম, "না ভাই বলা যায় না। যে রকম দিনকাল পড়েচে। ডিটেকটিভ, ত আমাদের মতন young man (যুবকদের) দের পিছনে লেগেই আছে।" সন্দেহটা আমার যেন বদ্ধমূল হইয়া গেল।

৫।

যাহা হউক শিমুলতলায় আসিয়া পৌঁছিলাম সেখানে সতীশের এক আত্মীয়ের পাহাড়ে বাড়ী ছিল। আমরা সেইখানেই আস্তানা গাড়িলাম। শিমুলতলায় ক'দিন বেশ সুখেই কাটিল। এক পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই যুবকটীর সহিত আমার দেখা। তিনি আমাদের পাইয়া যেন আপ্যায়িত হইয়া গেলেন। সতীশ তাঁহার সহিত বেশ গল্প গুজব জুড়িয়া দিল। আমি কিন্তু সে আলাপে কিছুতেই যোগ দিতে পারিলাম না। শুনিলাম তিনি বাস্তবিক মধুপুরে গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি আমাদের সেদিন দেখিতে পান নাই। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তিনি যে একজন ডিটেকটিভ, ইহাতে আমার আর কোনই সন্দেহই রহিল না। কলিকাতা হইতে আমাদের পিছু লইয়াছেন এবং আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন।

বাক্য-পরম্পরায় বুঝিলাম তিনিও আমাদের মত ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। শিমুলতলার পর তিনি কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সতীশও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। দেখিলাম আমার নামে একটী পত্র আসিয়াছে। পত্রটী আমার শ্বশুর মশায়ের। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার কন্যা (রাধিকা) ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিমুলতলায় দুইদিনের জন্য আসিয়াছে; আমি যেন যাইবার সময়ে তাহাদের লইয়া যাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ আমার বড় শ্যালক উহাদের সহিত শিমুলতলায় দেখা করিবে এবং আমরা সকলেই যেন এক-সঙ্গেই বাঁকিপুর যাই।

দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত একবারও আমি

আমার বড় শ্যালকটীকে দেখি নাই। শুনিয়াছি তিনি রেঙ্গুণে কাজ করেন।

যাহা হউক পরদিন প্রত্যুষে তাহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেদিন আমার স্ফূর্ত্তি দ্যাখে কে। অতিকষ্টে তাহাদের বাসা বাহির করিয়া শুনিলাম যে, গতকল্য রাত্রে আমার বড় শ্যালক তাঁহার ভগ্নীকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া গিরিডী চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে দু'দিন কাটাইয়া বাঁকিপুর যাইবেন। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম, মনে করিলাম পত্র পাইবামাত্র যদি কাল রাত্রেই অনুসন্ধানে বাহির হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ হইত। মনে মনে সতীশকে খুব ভৎর্সনা করিলাম। সেই ত রাত্রে বাহির হইতে বারণ করিল। আমি ত তখনই বাহির হইতে প্রস্তত ছিলাম। হায়! রাধিকার সহিত দেখা হইল না?

সে দিন আমাদের বাঁকিপুর যাইবার কথা ছিল। আমি জোর করিয়া যাওয়া বন্ধ করিলাম। যার জন্ত যাওয়া সেই যখন সেখানে নাই তখন আর গিয়া কি হইবে! ঠিক দু'দিন পরে সতীশ আর আমি বাঁকিপুর রওনা হইলাম। সতীশ এক আত্মীয়ের বাড়ী উঠিবে আর আমি হোটেলে উঠিব এইরূপ স্থির হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনই রাধিকার সহিত প্রথমে কথা কহিব না। আমি আসিতেছি জানিয়াও সে গিরিডী গেল কি হিসাবে।

বৈকালে বাঁকিপুর পৌঁছিলাম। প্ল্যাটফরমএ (Platform) নামিয়া দেখি সেই যুবকটী হন্ হন্ করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে যাইবার ফটকের দিকে যাইতেছে। আমি তেলে-বেগুণে জলিয়া উঠিলাম। সে যে একজন গোয়েন্দা সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। আমি রাগের মাথায় দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার দিলাম। যুবকটী অবাক্। সতীশ না থামাইলে আমি বোধ হয় আরও মারিতাম। প্ল্যাটফরমএ ভিড় জমিয়া গেল। যুবকটী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "একি মশায়! আমায় চিন্তে পাচ্ছেন না? আমি যে—" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে আমি আরও প্রহার করিতে করিতে বলিলাম, "শালা, লোক চেন না। আমার পেছু নেওয়া।"

এমন সময়ে দেখিলাম—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি কেলেঙ্কারী! কি ভুল! কি ভুল!—। আমার কনিষ্ঠ শ্যালক ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বলিল, "জামাই বাবু, জামাই বাবু, বড়দাকে মাচ্ছেন কেন?" কনিষ্ঠ শ্যালকের পশ্চাতে

একটী অবগুণ্ঠনবতীর সজল নয়নদ্বয়—বিস্ময়ে এবং ক্রোধে আমার উপর ন্যস্ত দেখিলাম।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি ভুল! কি কেলেঙ্কারী! সেই যুবকটী আমার বড় শ্যালক। তাহারা আজ গিরিডী হইতে ফিরিতেছে।

রাত্রে রাধিকা যখন ঘরে প্রবেশ করিল বৈকালের সেই ব্যাপারটায় লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না। উপাধানে মুখ গুজিয়া শুইয়া রহিলাম। আড় চোখে রাধিকাকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল :—

"কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিনী অঙ্গ তরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে॥
কুঞ্জর গামিনী মোতি দশনিনী
যামিনী চমক নেহারিণী রে॥
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাস বিলাসিনী হাস বিকাশিনী
'এহেন' দাস চিত শোহিনী রে॥"

সে পাশ ফিরিয়া শুইল। অনেকক্ষণ তাহাকে নিদ্রিত ভাবিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া যখন দেখিলাম সে কিছুতেই কথা কহে না তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। তাহাকে জড়াইয়া বলিয়া উঠিলাম—

"সুন্দরী কাহে না কহসি কথা।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়া কহি
লাগিতেছে প্রাণে বড় ব্যথা॥
তুয়া আশোয়াশে জাগি নিশি বঞ্চিনু
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃদু মদবিন্দু অধরে কৈছে লাগ
তাহে ভেল সলিল বয়ান॥
তাহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাঁম কাঁহা যাওব আর॥"

অধরসুধা পানান্তে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া বুঝিলাম প্রেয়সীর অভিমান কাটিয়া গিয়াছে।

আদ্যকালের বৈদ্যবুড়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগতের বিকাশ ২—৫ (ক)।

(শ্রীকিশোরীমোহন চোবে-সেন)

(মনু ও শতরূপা মানবের আদি পিতা-মাতার ভাগবতাদি পুরাণ-সম্মত ভারতবর্ষীয় নাম। তাঁহাদের বাইবেল-সম্মত পাশ্চাত্য নাম আদম ও য়ীভ।)

ব্রহ্ম যেমন মনুরূপে ও মহর্ষিগণ রূপে জীব-লীলা আরম্ভ করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি জীব-গণের ভোগ প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহাদের বাসোপযোগি ও প্রয়োজনীয় বস্তু নিচয়ের প্রসবোপযোগি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৎ শব্দ সত্ত্বা বোধক ; সত্ত্বা শব্দের অর্থ অস্তিত্ব ; সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া ব্রহ্ম-সত্ত্বা সর্ব্বভুতের অস্তিত্বের মূল। অতএব জগৎ সৃষ্টির উপাদান-ভুত অংশ ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত। তবে উপাদান অংশ উৎপত্তি, বিকার, পরিণাম, প্রলয়, প্রভৃতি রূপান্তরের বিলাস-ভুমি। এই নিমিত্ত উহা অ-সৎ অর্থাৎ অ-নিত্য বলিয়া কথিত হয়। সৎ ও অ-সৎ এই উভয় অংশের বিদ্যমানতায় পূর্ণব্রহ্ম সৎ ও অ-সৎ এই উভয়াত্মক হইয়াছেন। এই হেতুই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সদসচ্চাহমর্জ্জুন। (গীতা ১৯-৯ অধ্যায়।)

পুনশ্চ,—

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে।

(গীতা ১৩-১৩ অধ্যায়।)

ঐ অসৎ অংশ পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মের অধ্যক্ষতায় তাঁহারই শক্তির অধীন। ভোজবিদ্যা-বিশারদের কার্য্যের ন্যায় অতি বিস্ময়কর জগৎ নির্ম্মাণ ব্যাপার ব্রহ্ম শক্তির প্রকৃতি-গত বলিয়া, ব্রহ্ম শক্তির মায়া ও প্রকৃতি এই দুইটী নাম ও শ্রুত হওয়া যায়।

যেমন রাত্রিকাল জীবের বিশ্রাম কাল, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতির ব্রহ্মদেহে বিশ্রাম কালের নাম প্র-লয় কাল। শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত গীতার অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক-মতে, ও তৎপূর্ব্বে প্রকাশ-প্রাপ্ত মহর্ষি পরাশরের বিষ্ণু পুরাণোক্ত অভিপ্রায়-মতে সহস্র চতুর্যুগ-পরিমিত কাল, অর্থাৎ চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর বিশ্রামের পর সৃষ্টি-কাল, অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তির ক্রিয়া কাল সমারব্ধ হয়। তখন সেই প্রকৃতি সংসার রচনায় প্রবৃত্তা হয়েন।

জগৎসৃষ্টি-কারিণী প্রকৃতিকে পৃথক্ বুঝিতে হইলে, উহা পরব্রহ্ম মহাকাল চৈতন্য পুরুষের গৃহিণী-স্বরূপা। প্রকৃতির সকল কার্য্যে ব্রহ্মের যে অধ্যক্ষতা আছে, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন। যথা—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে॥

(গীতা ১০-৯ অধ্যায়।)

তরল দুগ্ধে মন্থন শক্তির ক্রিয়ারম্ভে যখন তাহা আন্দোলিত ও বিঘূর্ণিত হয়, তখন শব্দের আবির্ভাব হয়, বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, তড়িৎ বা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের বিলাস লক্ষিত হয়, এবং স্থূল নবনীত কণা উৎপন্ন হইতে থাকে। সেইরূপ প্রলয়ান্তে প্রকৃতি-শক্তি সতের অঙ্গে জগতের হেতুভূত অসৎ-অংশ লইয়া লীলারম্ভ করিলে অনাহত মহানাদ উত্থিত হইয়া তাহা হইতে পরমাণু-কণা প্রসূত হইতে থাকে। পরমাণু হইতে জগৎ-সৃষ্টি পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের মত; সেইরূপ উহা ভারতবর্ষের কণাদ ঋষির দর্শন সম্মত মত; এবং উহাই উদ্ভিদ্-দেহ ও জীব-দেহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির পর্য্যালোচনা-লব্ধ সর্ব্ব সাধারণের সরল বুদ্ধির ইঙ্গিত। অসৎ অংশে অন্তঃপ্রবিষ্ট শক্তির পরিমাণের তারতম্য অনুসারে ভৌতিক কণা সকলের গুণভেদ, রূপভেদ, প্রকৃতিভেদ ও শ্রেণিভেদ হয়।

আদি হইতে ঐশীশক্তি পরমাণু মধ্যে হর-গৌরী ভাবে, অর্থাৎ পৃথক্ পরিমাণের পুংভাব ও স্ত্রীভাব অবলম্বন করিয়াও অবস্থিত। ঐ প্রকার বিভিন্ন ভাবের প্রবলতা বশে পরমাণু সকল স্ব স্ব দেহ-নিবদ্ধ ভাব হইতে ভিন্নভাব সম্পন্ন পরমাণুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং পরস্পর মিলিত হইয়া যুগল দেহে অপর যুগল সকলের সহিত সংমিলিত হইতেছে। এই প্রকার ভাব বন্ধন চতুর্দ্দিকে সংঘটিত হইয়া পিণ্ড সকল ও ব্রহ্মাণ্ড সকল গঠিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে নীল নভোমণ্ডল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড সূর্য্য-পিণ্ড সকল ব্যক্ত হইয়া যায়।

কণা সকলের শক্তিভেদে গুণাদিভেদ প্রকাশ পাইলেও জলোৎপাদক জলজান বাষ্পের পরমাণুই স্থূল জগতের সকল দ্রব্যের আদি উপাদান। এই কথার সত্যতা ত্রিনীতি কলেজের অধ্যক্ষ ইংরাজী ১৯২১ সালে ইংলণ্ডের প্রধান বিদ্বৎ সভায় প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রাচীন মনু ও মহর্ষিদিগকে বলিয়া ছিলেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা আদিতে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—

অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ।

(মনুসংহিতা ৮-১ অধ্যায়।)

ভাবার্থ।—অগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন; জল

সৃষ্ট হইলে সেই জলে বীজ সৃজন করিলেন।

মনুর এই উক্তি-মধ্যস্থ বীজ শব্দের অর্থ শক্তি বলিয়া টীকাকারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জল-মধ্যে অর্পণ হেতু ব্রহ্ম-শক্তি প্রথম যে শক্তি-বীজ সৃজন করিলেন তাহা তড়িৎ। বিজ্ঞানাচার্য্যেরা সর্ব্ব প্রকারের পরমাণু মধ্যে তড়িৎ পদার্থ দর্শন ও প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা কোনও কল্পনা-রাজ্যের কাল্পনিক সংবাদ নহে। ইহা পরমেশ্বরের এই সৃষ্ট জগতের দৃষ্ট ব্যাপার। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক অ-ক্ষর সৎ পদার্থই বুদ্ধি-গ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় পদার্থ; তাঁহার ক্রিয়া সমস্তই সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে মানবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে। এ বিষয়ের এক উদাহরণ স্থলান্তরে প্রদত্ত হইবে।

উদ্ধৃত মনুর ঐ শ্লোকার্দ্ধ অতি মূল্যবান।

জল সৃষ্টি যে সৃষ্টিকর্ত্তার আদি সৃষ্টি, সেই কথার উল্লেখ মহাকবি কালিদাসও অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রারম্ভে,

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টু রাদ্যা—

এই বলিয়া করিয়াছেন। ঐ নাটক সুপণ্ডিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় অভিনীত হইয়াছিল।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলের ন্যায় এক জলীয় বাষ্পের মণ্ডলও বিদ্যমান। জল একমাত্র পৃথিবীর পদার্থ নহে।

পূর্ব্বে সূর্য্যের যে বহুত্বের উল্লেখ হইয়াছে, এক্ষণে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে। উহার আলোক ও উত্তাপের আলোচনা পরে হইবে।

গগনমণ্ডলে যে অসংখ্য সূর্য্য বিরাজমান, সে সংবাদ বশিষ্ঠ ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিত দিগেরও ঐ কথা। তাঁহারা বলিয়াছেন যে আকাশ মণ্ডলের নক্ষত্র পুঞ্জ পৃথিবী হইতে বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া অতিশয় ক্ষুদ্র বোধ হইলেও উহারা প্রকৃত পক্ষে এক একটী সূর্য্য। এক্ষণে শরৎকালের মধ্য-গগনে পরিদৃশ্য-মান উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছায়াপথরূপ কর্ম্ম-শালায় বিশ্ব-কর্ম্মার সূর্য্য-নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। বুওর যুদ্ধের অবসান কালে এক নূতন সূর্য্যের (অর্থাৎ নক্ষত্রের)আবির্ভাব হইয়াছে। মনুষ্য-ভূমি পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ সকল সূর্য্য হইতে বিচ্যুত বলিয়াই বহু বিবেচক পণ্ডিতের বিশ্বাস। গ্রহগণ তাহাদের পরিমাণানুরূপ শক্তি বিশেষের প্রেরণায় মূলপিণ্ড হইতে স্খলিত হইয়াছে,এবং স্খলিত হইয়াও অপর এক শক্তির ক্রিয়াবশে আপন আপন কক্ষে অর্থাৎ ভ্রমণ-পথে বিধৃত রহিয়াছে। শক্তি-প্রয়োগ দ্বারা এ সকলের বিধারণ পূর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মেরই লীলা। যথা—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

(গীতা ১৩-১৫ অধ্যায়।)

সূর্য্য যে মনুষ্যাদির বাসভূমি পৃথিবী প্রভৃতির নির্ম্মাণকর্ত্তা,—ইহাই ভারতবর্ষীয় ঋষিদিগের ধারণা। সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়াছেন যে সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ মূলকারণ হইতে লব্ধ-প্রকাশ জগৎপ্রসব ধর্ম্মা স্থূলনেত্রে দর্শনীয় ঈশ্বর। ভগবানের বিভূতি-প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যেই অধিক। ভবিষ্যপুরাণ-কার বলিয়াছেন যে সমুদায় জগৎ সূর্য্যের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, এবং সমস্তই পুনঃ সূর্য্যের শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। অতি প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদের প্রকাশ কাল হইতে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্মের তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্য সন্তানেরা প্রত্যহই তাঁহার উপাসনার অন্তে অক্ষি-গোচর তদীয় প্রধান প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্যকে,

জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশ হেতবে,

অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ,—এই বলিয়া বন্দনা করিয়া আসিতেছেন।

এই সকল প্রাচীন কথা জড় বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জড় বিজ্ঞানের সুন্দর আলোচনা করিতেছেন। অতএব অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উল্লেখ হইতেছে।

(১) সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বহুলক্ষ গুণ বৃহৎ এবং পৃথিবী শূন্য দেশে সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্টা থাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য ধাতু-বহুল গুরুসার, পৃথিবী লঘুসার। এই সকল তথ্য নিশ্চয় করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে উহা প্রথমে সূর্য্যেরই অংশ বিশেষ থাকিয়া কোনও ক্রমে সূর্য্য হইতে ক্ষরিত হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব পৃথিবী সূর্য্য হইতে উৎপন্না, এবং যৎকিঞ্চিৎ ধাতুরত্নময় স্ত্রীধন-সম্পন্না।

(২) পৃথিবীর দেহ এ প্রকার ভাবে ধৃত আছে যে, তাহার গাত্রের দক্ষিণাংশ দক্ষিণায়নে ও উত্তরাংশ উত্তরায়ণে সূর্য্যের উত্তাপ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে উত্তাপের তারতম্য হেতু শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, প্রভৃতি ঋতুভেদ হইতেছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতুজাত দ্রব্য সমুদায়ের আবির্ভাব হইতেছে।

অতএব এই প্রাণিপূর্ণা পৃথিবী সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা।

(৩) পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার না হইয়া অণ্ডাকার। ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটী বৃত্ত শূন্যদেশে অণ্ডাকার পথে পরিভ্রমণ করিতে

থাকিলে, কালে তাহাদের সংঘর্ষ সমুপস্থিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া এক মার্কিণ পণ্ডিত সম্প্রতি (ইংরাজী ১৯২২ সালের শেষ ভাগে) কহিয়াছেন যে পৃথিবী কালে সূর্য্যে পতিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে।

অতএব সূর্য্য পৃথিবীর বিনাশের হেতুও হইলেন। সূর্য্য ও গতিশক্তি-বিশিষ্ট। আমাদের ২৯ দিনে উহার দৈনিক গতি সম্পন্ন হয়। উহার বার্ষিক গতি সম্ভবতঃ ছায়াপথের চতুর্দ্দিকে। তাহা হইলে সূর্য্যের ভ্রমণ-পথ সুন্দর অণ্ডাকার হয়; এবং মহাপ্রলয়ের সঞ্চার কালে জীর্ণ অবস্থায় জীর্ণ সংস্কারের নিমিত্ত উহার বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালায় যাইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা সাধারণের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়।

পৃথিবী যে গতি-যুক্তা তাহা আর্য্য-ভট্ট ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বরাহমিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী। তথাপি যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য স্থূল জ্ঞানের বিরোধি, প্রাচীন শাস্ত্র-বক্তারা সেই সকল তথ্যকে বহু স্থলে রূপক অলঙ্কারের সাহায্যে সাধারণ দৃষ্টান্তাবলির বেশ ভূষা প্রদানে বিশোভিত রাখিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছেন। এই বাক্যের উদাহরণ স্বরূপ প্রসিদ্ধ পৌরাণিক অতি প্রাচীন প্রলয়দ্রষ্টা মার্কণ্ডেয় ঋষির এক ব্যাখ্যার উল্লেখ হইতেছে। ঋষি বলিয়াছেন :—

সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞাদেবী স্বামীর তেজোবাহুল্য হেতু অতিশয় তাপিতা হইতেন, এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে অসমর্থা থাকিতেন। দেবী আপনার ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেই স্বামীর সন্নিধানে রাখিয়া দিয়া স্বয়ং দূরস্থিতা হইলেন। সংজ্ঞার এই নিরানন্দের বার্ত্তা পিতা বিশ্বকর্ম্মার কর্ণগোচর হইল। তখন বিশ্বকর্ম্মা জামাতাকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে ভ্রমিযন্ত্রে ভ্রামিত করেন। ইহাতে সূর্য্যের বিবর্দ্ধিত অংশগুলি তাঁহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িতে থাকিল; এবং তাঁহার তেজের হ্রস্বতা সম্পাদিত হইল।

পৃথিবীর ন্যায় বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, ও শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে। রমণীয় বচন-বিন্যাসক মার্কণ্ডেয় ঋষি এই যে সূর্য্যের অঙ্গ হইতে অংশ পতনের উল্লেখ করিলেন, সে সকলের অর্থ পৃথিব্যাদি গ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিলে নূতন পুরাতন যাবতীয় উক্তির সমন্বয় হইয়া যায়। এই সমন্বয় সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। এই সমন্বয় অনুসারে উহারা সকলেই সূর্য্যের আত্মজ।

ভারতবর্ষীয়েরা যে সকল গ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে শনৈশ্চর—অর্থাৎ অতি মৃদুগতি-যোগে বিচরণে রত শনিগ্রহ—সূর্য্য

হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। মহর্ষি বেদব্যাস নবগ্রহ স্তোত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে শনৈশ্চরকে রবি-সূনু অর্থাৎ সূর্য্যের আত্মজ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। শনির সহিত সূর্য্যের এই সম্বন্ধ সমন্বয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল। শনির সূর্য্য-পুত্রত্বের উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যই পৃথিবী প্রভৃতি অপর সকল গ্রহের উৎপত্তির কারণ—ইহা পরম জ্ঞানী বেদব্যাস প্রকাশ না করিলেও, তিনি স্বয়ং তাহা বিদিত ছিলেন।

বেদব্যাস স্তোত্রমধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে মঙ্গল গ্রহ ধরণীগর্ভ-সম্ভূত, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। ভূমি হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহার একটী নামও ভৌম। ঐ গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী হইতে উহার দূরত্বও অল্প।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে অগ্নি বিদ্যমান। ঐ অগ্নি নূতন ও পুরাতন মহাদ্বীপের নানা আগ্নেয় গিরি হইতে মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইতেছে; ভূমির পৃষ্ঠদেশ বহুদূর পর্য্যন্ত কম্পিত করিতেছে; ও স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতায় ও নিম্নতায় হ্রাস বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। উহা ভূমি বিদীর্ণ করিয়াছে এবং অষ্ট্রেলিয়ার পার্শ্বস্থিত সমুদ্র প্রদেশ হইতে মহাদ্বীপের ন্যায় এক বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের অন্তর্দ্ধানের হেতু হইয়াছে। মঙ্গলের ভৌম নাম সূচনা করিতেছে যে পৃথিবীর কোন ও অংশ, সম্ভবতঃ সেই অন্তর্হিত অংশ, প্রাচীন কালে ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নায় শিথিল হইয়াছিল; এবং তদবস্থায় প্রকৃতির কোন ও শক্তিবশে, সম্ভবতঃ কোনও বৃহৎ ধূমকেতুর সন্নিধি-বশে বহিরাকৃষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে স্খলিত হইয়াছিল। ঐ ধূমকেতুর সহিত মিলিত থাকিয়া পৃথিবীর ঐ অংশ পৃথক্ গ্রহে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ভৌমের প্রসব কালে পৃথিবী বিপন্না ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণনা রহিয়াছে। তৎকাল হইতেই ভূমিকম্প ও ধূমকেতুর আবির্ভাব অনিষ্ট সূচক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

মঙ্গল গ্রহের অপর একটী নাম অঙ্গারক, অর্থাৎ অঙ্গার-খণ্ড। উহা পুনঃ লোহিতাঙ্গ; অর্থাৎ দীপ্ত অঙ্গার-খণ্ড। ধূমকেতুর সহিত সংস্রব হেতু ঐ নামের উৎপত্তি। কারণ, ধূমকেতু মাত্রেই রক্তবর্ণ।

মঙ্গল গ্রহ ও মনুষ্যের নিবাস-ভূমি। এই সংবাদ সহজ-বোধ্য। কারণ, সেই অংশের সহিত সেই অংশবাসী মনুষ্যেরাও পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহে নীত হইয়াছিলেন। মঙ্গল-বাসী মনুষ্যেরা তাঁহাদের গ্রহে অনেক কৃত্রিম নদী

খনন করিয়াছেন। ঐ গ্রহ এখন পঞ্জাব প্রদেশের ন্যায় কৃত্রিম নদীতে পরিপূর্ণ থাকিয়া প্রচুর শস্য প্রসব করিতেছে। পৃথিবী ও মঙ্গলের মৃত্তিকা-ভাগ সমগুণ-সম্পন্ন।

পারিবারিক সম্বন্ধ ধরিলে মঙ্গল গ্রহ সূর্য্যের দৌহিত্র।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীসন্তোষকুমার দাস, এম্-এ)

ভারতের কৃষি-বিদ্যালয়ের মধ্যে পুষা, পুণা ও নাগপুরের কলেজ তিনটীই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমেরিকার মাত্র উইজকন্‌সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৮৫৯টী কৃষি-বিদ্যালয় আছে। কৃষি-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। নবোদ্ভাবিত উপায়ে ক্ষেত্র খনন ও সার প্রদান করিলে কৃষি-শিল্পের আরও উন্নতি হইতে পারে।

আমাদের দেশে, লোকের একটা ধারণা আছে—যাবতীয় শিল্প-সমাধানে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। এটা কিন্তু একান্তই ভ্রান্ত ধারণা; কারণ শিল্প মাত্রেরই সৌকার্য্য, সৌন্দর্য্য-সমন্বয় ভিন্ন সম্ভবে না। আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত ক্বচিৎ ঘটে। অধিকন্তু বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানব্যুৎপত্তি ভিন্ন মৌলিকতা উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ যথাযথরূপ হয় না। মৌলিকতার অভি-নবত্বই শিল্পোন্নতির অন্যতম সহায়। শিল্পিবর্গের মধ্যে বিদ্যা-বিদ্বেষ বিদ্যাশিক্ষাসুলভ উদারতার অভাব এতদ্দেশীয় শিল্পাদির ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ।

"ভারতের শিল্পের উন্নতি হয় না কেন?—এতদুত্তরে ইংরাজগণ বলিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্তগণ কর্ত্তৃক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য অধিকতর বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ।" ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত করিয়া—তাহার বিলাস-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়া—তাহার ভোগ-লালসা পরিবর্দ্ধিত করিয়া—তাহার নব নব অভাব সৃজন করিয়া—ভারতের শিল্পের তথা বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা যুক্তিযুক্ত

নহে। এরূপ করিলে যথার্থ জাতীয় উন্নতি কখনই সাধিত হয় না। বিজাতীয় ভাবে জাতীয় উন্নতি কি কখনও সম্ভব? জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে জাতি উন্নত হয়, সেই জাতির উন্নতিই প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী ও কার্য্যকরী হয়। আমদানী করা উন্নতি লইয়া জাপান উন্নতিলাভ করে নাই—স্বদেশের আভ্যন্তরীণ শক্তিবিকাশেই জাপান এই অল্প কালের মধ্যেই উন্নত হইয়াছে। এখনও যদি ভারত জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই এতদ্দেশের শিল্পের উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারাই আমাদের ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্রস্থল। তাঁহারাই আমাদের সেবক, আমাদের প্রচারক, আমাদের ইচ্ছা ও আদেশের পরিপালক ও পরিচালক। তাঁহারা স্ব স্ব দেশে, সমাজে, গ্রামে, জেলায়, থানায়, পাড়ায় আমাদের শিল্পোন্নতির প্রয়োজন ও উপায় আপামর সাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে যে, কি জাতীয় কাজ সাধিত হয় তাহা বলা যায় না। তাঁহারা যেমন লেখাপড়া শিখিয়া আত্মোন্নতি করিতেছেন, তেমনি জাতীয় উন্নতিটাও যেন একেবারে বিস্মৃত না হন। কারণ জাতীয় উন্নতি বিনা আত্মোন্নতি স্থায়ী হয় না। আর এই শিল্পোন্নতি দ্বারাই জাতীয় উন্নতি লাভ হয়। আমাদের সমাজের প্রাচীন প্রথা খুব ভাল ছিল। গ্রামের দলপতি (অর্থাৎ মোড়ল) দ্বারাই ঐ কাজ সম্পন্ন হইত। কিন্তু এখন সমাজের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া ঐ সকল লোকের ক্ষমতা সমাজে অযথা দলাদলি, বিবাদ বিসম্বাদ ও শক্তিনাশে ব্যয়িত হইয়া সমাজকে শনৈঃ অধঃপাতে নীত করিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ, দলাদলি ত্যাগ করিয়া আমাদের একযোগে উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত।

ভারত গরীবদেশ। সুতরাং এদেশের পক্ষে যৌথ কারবার বাঞ্ছনীয়; এ বিষয়ে ধনী সম্প্রদায়ের ও Government এর সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। কলকারখানা সংরক্ষণ করিতে হইলে অসংখ্য যৌথ ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। কল-কারখানা সংরক্ষণ করিতে হইলে, অসংখ্য ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। অসংখ্য (১৪,৫০৯) যৌথ ঋণদান সমিতি জার্ম্মাণির শিল্পোন্নতি বিষয়ে সমধিক সাহায্য করিয়াছেন। স্বাধীন বাণিজ্য বা অবাধবাণিজ্য দূর করিলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু এ ক্ষমতা Government এর হস্তে এবং অবাধ বাণিজ্যে

তাঁহাদের স্বার্থ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। অনৈক স্বদেশ হিতৈষী ভারতবাসী বলিয়াছেন—"If nations by themselves are made, we must not indefinitely hang by the coat-tail and wait upon the pleasure of a foriegn power to furnish us with the necessary escort on the way to our Goal—the industrial development of the country Our destiny is in our hands and we must make or mar it now or never.

"Seek and ye shall find : knock and it shall be open" was as true in Christ's lifetime as twenty centuries after his death and hold as good in the industrial as in the religions world. No amount of cold condemnation from high quarters, of our goal as extravagant or unrealisable should damp our ardour and keep us from the fight. On the successful issue of this fight depends the future of the Indian people and if we cannot work our way to the goal, we shall richly deserve to be impoverished, trampled under foot and blotted out of the face of the earth."

পরিশেষে বক্তব্য যে—যে সকল পণ্য এতদ্দেশবাসী মাত্রের একান্ত প্রয়োজন সেই সকলের কারখানাদি স্থাপনে প্রথমে উদ্যোগী হওয়া উচিত। যে সকল দ্রব্যাদি আমরা উপেক্ষা করিয়া দূরে ফেলিয়া দিই, সেই সকল দ্রব্যকে আবশ্যক মত কার্য্যে প্রয়োগ করিলে ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে ভূগর্ভে, যে অসংখ্য বিচিত্র দ্রব্য-সম্ভার বিক্ষিপ্ত অযত্ন-পতিত ভাবে বিরাজমান, তৎসমুদায়কে পণ্য বিশেষে পরিণত করিতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। একটী নূতন শিল্প উদ্ভাবিত করিতে পারিলেই সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিবিধ শাখাশিল্প অভ্যুত্থিত হইবে—এইরূপে শিল্প-প্রসার ঘটিবে।

শুক্রনীতি সার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব।

পিতা যেমন পুত্রের বিদ্যাদি উপার্জ্জনে সর্ব্বদা তৎপর, মাতা যেমন পোষণকারিণী এবং সকল দোষের ক্ষময়িত্রী, উৎকৃষ্ট বিদ্যাশিক্ষক গুরু যেমন শিষ্যের সর্ব্ববিষয়ে হিত উপদেষ্টা, ভ্রাতা যেমন পিতৃধন হইতে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন, মিত্র যেমন আত্মা, স্ত্রী, ধন ও অন্যান্য গুহ্য

বিষয়ের গোপনকর্ত্তা, কুবের যেমন ধনদাতা, যম যেমন দণ্ডকর্ত্তা—রাজাও সেইরূপ বিদ্যাদাতা পোষণকারী, ক্ষমাবান, শিক্ষক, স্বীয় প্রকৃতাংশ গ্রাহক, গোপনকর্ত্তা, ধনদাতা ও দণ্ডদাতা হইয়া থাকেন। যে নৃপতিতে এ গুণ সমূহ বর্ত্তমান নাই, তিনি নৃপতি নামের অযোগ্য এবং তাঁহার রাজত্বও আশান্তিপূর্ণ হয়। ৭৯—৮১॥

অতিশয় উন্নতিশালী রাজাতে এই সাতটী গুণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে অতএব রাজা কখনও এই গুণসপ্তকে ত্যাগ করিবেন না ॥৮২॥ যিনি দণ্ডদানে সমর্থ হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনিই প্রকৃত সুশাসন করিতে সক্ষম। অতএব রাজা অন্যান্য সমস্ত গুণরাশিতে বিমণ্ডিত হইলেও ক্ষমাগুণ না থাকিলে শোভা পান না ॥৮৩॥ যিনি নিজনিষ্ঠ দোষ রাশি পরিত্যাগ করতঃ নিন্দাবাদ সমূহ সহ্য করিতে সক্ষম এবং সর্ব্বদা দান, মান, সমাদরাদি দ্বারা স্বীয় প্রজাসমূহের প্রীতি-জনক হয়েন, তিনিই প্রকৃত রাজা ॥৮৪॥ যিনি শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বলবান, সংগ্রামবিশারদ, শত্রুদমনকারী এবং যিনি যথেচ্ছাচারী নহেন, যিনি বুদ্ধিমান, জ্ঞান বিজ্ঞানযুক্ত, নীচসংসর্গ-রহিত, বহুদর্শী, পণ্ডিত-পোষক (বৃদ্ধমন্ত্রী অনুগত) সুনীতিজ্ঞ, বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বদা যাঁহার সেবা করে, সেই রাজা দেবাংশ-সম্ভূত এবং তিনিই প্রকৃত রাজা ॥৮৫।৮৬॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে সকল রাজগুণ কথিত হইল, যে রাজা এই সকল গুণের বিপরীত গুণাবলম্বী সেই রাজা রাক্ষসের অংশ হইতে অবতীর্ণ—অতএব তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন। সেই রাজার পার্শ্বচরগণও উন্মার্গগামী হয়। কারণ রাজাও যাঁহার অংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার পারিষদবর্গও সেই অংশ হইতে উৎপন্ন ॥৮৭॥ রাজা সর্ব্বদাই সেই পার্শ্বচরগণের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মাদির অনুমোদন করিয়া থাকেন। অনুরূপ প্রাক্তন বশতঃ রাজা সেই পার্শ্বচরগণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে বা কার্য্যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন ॥৮৮॥

মানবগণকে স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, প্রাক্তন যদি শান্তি আদি প্রতিকার দ্বারা নাশ্য হয়, তাহা হইলে প্রতিকার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মের ফল অনুরুদ্ধ হয়। কিন্তু প্রতিকারের অভাবে কর্ম্মফল যে মানুষকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ইহা স্থিরীকৃত ॥৮৯॥ ব্যাধি যেমন সুন্দররূপে চিকিৎ-সিত হইলে ভোগের কারণ হয় (অর্থাৎ যে কর্ম্মফল ব্যাধিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাই আবার প্রতিকারের প্রভাবে সুস্থাবস্থায়

ভোগরূপে পরিণত হয়); রাজাও তদ্রূপ নীতি শাস্ত্রাদি সাহায্যে প্রতিকৃত হইলে (উন্মার্গ-গামী রাজাও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হইলে) উত্তম রাজ-গুণে ভূষিত হইয়া থাকেন। কারণ, অনিষ্টের হেতু গুলি (যাহা হইতে অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে তাহা) যদি মানবকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে এমন কোন ব্যক্তি আছেন—যিনি পুনরায় সেই অনিষ্টলাভার্থ প্রযত্নপর হয়েন ॥৯০॥

উৎকৃষ্ট ফললাভ হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মন্দ ফললাভ হইলে অন্তঃকরণ আনন্দিত হয় না। অতএব সৎ ও অসৎ এই উভয়বিধ ফলের জ্ঞাপক নীতিশাস্ত্রসমূহ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া যাহাতে মন্দফল উৎপন্ন না হয়, সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥৯১॥ নীতি প্রয়োগের মূল—বিনয়। শাস্ত্রার্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিলে বিনয় উপলব্ধ হয়, বিনয়ের মূল—ইন্দ্রিয়জয়; জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলে শাস্ত্রার্থও সম্যক্ অবগত হইতে পারা যায় না ॥৯২॥ রাজা প্রথমতঃ আত্মাকে তারপর পুত্রগণকে অমাত্যগণকে ভৃত্যগণকে এবং প্রজাবর্গকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিনয়মণ্ডিত করিবেন। অর্থাৎ রাজা প্রথমতঃ বিনয়ান্বিত হইলে তদনুকরণে পুত্র মিত্রগণও বিনয় শিক্ষা করিয়া থাকেন। ক্রমে অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গ ও প্রজাগণও বিনয়-ভূষিত হইয়া রাজ্যশ্রী বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

রাজা যে কেবলমাত্র পরকে উপদেশ দিবার জন্যই জ্ঞানী হইবেন, তাহা নহে। পরন্তু নিজেও শাস্ত্রাদেশের অনুবর্ত্তী হইবেন। কারণ, সগুণ রাজাও (পরোপদেশকুশল রাজাও) কখনও কখনও নিজের উপদেশানুরূপ শাস্ত্রানুষ্ঠানের অভাব বশতঃ রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকেন। ৯৪ ॥

প্রজাগণ গুণহীন হইলেও রাজাবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। ইন্দ্রাণী যেমন কখনও বিধবা হয়েন না; প্রজাও তদ্রূপ কখনও নৃপবিহীন হয় না। অর্থাৎ রাজা গুণহীন হইলে প্রজাহীন হয়েন; প্রজা কিন্তু গুণহীন হইলেও রাজাহীন হইতে পারে না ॥ ৯৫ ॥ যে রাজার মন্ত্রিগণ বিনয়সম্পন্ন নহেন, বান্ধবগণও অবিনীত এবং পুত্রগণ দুষ্ট; সেই রাজার রাজ্য শ্রীহীন হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ যে রাজার বান্ধবগণ অনুরক্ত, যে রাজা সদাই প্রজাপালনে তৎপর (অনলস) এবং যে রাজা বিনয়ী তিনি বিপুল লক্ষ্মীলাভে সমর্থ হয়েন। অতএব রাজা এবং তাঁহার পার্শ্বচর বান্ধবাদি সর্ব্বদাই জিতেন্দ্রিয় হইবেন ॥ ৯৭ ॥

সুবিস্তীর্ণ বিষয়রূপ অরণ্যে সর্ব্বদা বিচরণ-শীল অতিশয় দুর্দ্দান্ত যে ইন্দ্রিয়রূপ মত্ত মাতঙ্গ, তাহাকে জ্ঞানরূপ অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত

করিবে। অর্থাৎ যিনি বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ কুপথগামী হইতে পারে না॥ ৯৮॥

বিষয়রূপ (রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দরূপ) আমিষের (ভোগ্যবস্তুর) লোভে মন সর্ব্বদাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তদ্‌বিষয়ে প্রেরণ করিতেছে। অতএব অতিশয় যত্নসহকারে সেই মনকে অগ্রে নিরুদ্ধ করিবে। কারণ, মনকে জয় করিতে পারিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমূহ আপনিই জিত হইয়া থাকে॥ ৯৯॥ ক্রমশঃ

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি এ।

২৫

গিরিডির জল হাওয়ায় সুরেশ দেহে সারিয়া উঠিল বটে কিন্তু মনে কিছুমাত্র সারিয়া উঠিতে পারিল না। ইন্দু এবং অশ্রুর চিন্তাই তাহার মানসিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে. ইন্দু ধীরে ধীরে তিলে তিলে মরণের পথেই অগ্রসর হইতেছিল। যে কাল রোগে তাহাকে ধরিয়াছে সে রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। নিজের যা কিছু সমস্তই হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়া সে বীরেনকে ফিরাইয়া আনিয়াছে বটে, সে নিজের ভাগ্যকে ফিরাইয়াছে বটে কিন্তু সে নিজেকে হারাইতে বসিয়াছে। জীবন দিয়া সে স্বামীকে বাঁচাইয়াছে, প্রাণপণ করিয়া স্বামীকে উদ্ধার করিয়াছে কিন্তু সে স্বামী-সৌভাগ্য তাহার কপালে নাই; তাই বুঝি সে দিন দিন মরণের পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সুরেশ আসিবার সময়ে যে চেহারা ইন্দুর দেখিয়া আসিয়াছিল সে চেহারায় মানুষ কখন বেশীদিন বাঁচে না।

ইন্দুর মরণ নিশ্চয় এবং সেই মরণ যে ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে ইহাও সুরেশের বুঝিতে বাকী রহিল না। যে ইন্দুকে সুরেশ আশৈশব দেখিয়া আসিতেছে, সুখের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা, পিতার আদরে বর্দ্ধিতা যে ইন্দুকে সে শিক্ষকের মত উপদেশ দিয়া আসিয়াছে, ভাইয়ের মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছে, সেই ইন্দুকে সুরেশ কিছুতেই ভুলিতে পারিতে-

ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর কত দুঃখ কষ্ট, কত লাঞ্ছনা অত্যাচারের ভিতর দিয়া সে নিজেকে চালাইয়া আসিয়াছে। একদিনের জন্য স্বামীর উপর অভিমান করে নাই, মায়ের উপর রাগ করে নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দ্যায় নাই। চিরকাল সে নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেই মতই নিজেকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। একদিনের জন্যও ধৈর্য্য হারায় নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ত্তব্যের কিংবা কর্ম্মের অবহেলা করে নাই, মুখ বুজিয়া সকলি শুধু সহ্য করিয়া আসিয়াছে, কখন কোন কথার প্রতিবাদ করে নাই।

যে পদদ্বয় দ্বারা বীরেন পদাঘাত করিত সেই পদদ্বয়েরই ধুলা ইন্দু মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। যে স্বামী তাঁহাকে চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে সেই স্বামীকেই সে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীকেই সে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

সুরেশের এ সমস্তই মনে পড়িয়া যাইতেছিল। সেই ইন্দু আজ মরণের পথে। ইহাতেও তাহার দুঃখ নাই। সে স্বামীকে বাঁচাইতে পারিয়াছে এইটুকুই তাহার আনন্দ, মরণে শান্তি জীবনে তৃপ্তি। কিন্তু ইন্দু আর বাঁচিবে না। এ কথা ভাবিলেও অজ্ঞাতে সুরেশের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। কিছুতেই সে জল সে বন্ধ করিতে পারিত না। তবে মরণের পূর্ব্বে ইন্দু নিজের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে—দেখিয়া যাইতেছে তপস্যার ফল হইয়াছে জানিয়া যাইতেছে—এইটুকু মনে করিয়া সুরেশ একটুকু আনন্দ পাইত। তাহার এত কষ্টের এত দুঃখের পুরস্কার যে ভগবান দিয়াছে—এইটুকু মনে করিয়া সুরেশের সুখ হইত।

এ দিকে আবার অশ্রুর কথা ভাবিয়াও সুরেশের মনে সুখ ছিল না। পুরী হইতে ফিরিয়া আসার পর অশ্রুর হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এত কাছে আসিয়া হঠাৎ সে কেন এতদূরে চলিয়া গেল? এত আপনার হইয়া হঠাৎ কেন আবার পর হইয়া গেল? সুরেশ শুধু এ প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য চিন্তাই করিত, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিত না। অশ্রুকে সে যে কতখানি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, কত খানি আপনার ভাবিয়া লইয়াছে—ইহা সে বুঝিতে পারিল সেই দিন, যেদিন অশ্রুর 'ছাড়া' ছাড়া' ভাব সে লক্ষ্য করিল।

অশ্রুর সেই টাইফয়েডের সময় হইতেই ধীরে ধীরে তাহার প্রেম মন্দাকিনীর স্রোত সুরেশের হৃদয়ের পাড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া

ছিল। এবং সেই ভাঙ্গা শেষ হইয়া সমস্ত হৃদয়টা মন্দাকিনী-স্রোতে ভরিয়া গেল সুরেশের অসুখের সময় পুরীতে। কৃতজ্ঞতায় কৃতজ্ঞতায় এক হইয়া গিয়া, ঋণে ঋণে সমান হইয়া গিয়া উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে আর কোন ভিন্নতা ছিল না। সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া প্রেমের পবিত্র স্রোত, ভালবাসার তরঙ্গমালা একুল ওকুল ভাসিতে ছিল। উভয়েরই মনে হইতেছিল যেন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র এক হইয়া সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে এ চড়া কিসের? পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গার স্রোতের সহসা এ দিক্ পরিবর্ত্তন কেন? চড়া যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, ক্রমেই শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। গঙ্গার জোয়ারের ঝাঁপটা, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত, স্রোতের বেগ মাঝে মাঝে আসিয়া চড়ায় লাগিতেছে বটে কিন্তু এ চড়া তো আর ডুবিবার নাম করে না।

অশ্রুর এ ব্যবহারে সুরেশ একটু ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকিতে পারিল না। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যাহাকে ভালবাসে তাহারই উপর তাহার যত কিছু রাগ, অভিমান দুঃখ সব হয়। সুরেশেরও তাহাই হইল। সুরেশ একবার ভাবিল, সত্যই তো অশ্রু কেন তাহাকে ভালবাসিবে? সে ভালবাসে বলিয়া? সুরেশ অশ্রুকে ভালবাসে বলিয়া যে অশ্রুকেও সুরেশকে ভাল বাসিতে হইবে ইহা আবার কোন নিয়মে বলে? অশ্রু ত সুরেশের পায়ে ধরিয়া প্রেম ভিক্ষা করিতে যায় নাই, সে তো একবার মুখ ফুটিয়া বলে নাই, 'ওগো, তুমি আমায় ভালবাস।' কেন তবে সুরেশ উহাকে ভালবাসিল?

কিন্তু অশ্রু যে সুরেশকে ভালবাসেনা এ কথাও সে বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিল না। নিশ্চয়ই সে ভালবাসে তা'না হইলে তাহার বসন্তের সময়ে অমন করিয়া কখনই অশ্রু তাহার সেবা করিতে পারিত না। শুধু কৃতজ্ঞতার জন্য শুধু ঋণ পরিশোধের জন্য, শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে কেহ কখন অত খানি করিতে পারে না। একটু স্নেহ না থাকিলে, একটু ভালবাসা না থাকিলে অমন করিয়া দিবারাত্র অনাহারে অনিদ্রায় কেহ কখন সেবা করিতে পারে না। অশ্রু নিশ্চয়ই সুরেশকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে নহে, প্রাণ দিয়া ভালবাসে। অশ্রুর সহিত আলাপের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনাই সুরেশ একবার ভাবিয়া দেখিল, দেখিল অশ্রু কখনই তাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে না।

তবে এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কেন যে

পুরী হইতে আসিবার পর হইতে এমন হইয়া গেল? তাহার সহিত কথা কওয়া দূরে থাক্ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই। সুরেশকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া অশ্রু অন্যত্র চলিয়া যাইত। অথচ যে অশ্রু পূর্ব্বে সুরেশ আসিলে নিজের ঘরে বসাইয়া ইন্দুর সম্বন্ধে, সঙ্গীত সম্বন্ধে, অনেক ভাল ভাল পুস্তক সম্বন্ধে কত আলোচনা করিত, কত কথা কহিত, কত হাসিত। অনেক অনুরোধ করার পর যদিও সে এক আধ দিন সুরেশদের বাটী যাইত, বিন্দুবাসিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া আসিত। সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিত না। নেহাৎ সাক্ষাৎ হইয়া গেলে বেশী কথাও কহিত না। সুরেশ ভাবিল তবে কি কিরণময়ীর অতীত কালের ইতিহাস অশ্রু জানিতে পারিয়াছে? সেই জন্যই কি সুরেশের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে? কিন্তু সে এমন কি ইতিহাস, এমন কি রহস্য, এমন কি ভয়ানক জিনিস্ যাহা জ্ঞাত হইয়া অশ্রু সুরেশকে ভুলিতে চেষ্টা করিবে? সে ইতিহাস যতই কেন ঘৃণিত হউক না, যতই কেন জঘন্য হউক না, যতই কেন সমাজ বিরুদ্ধ হউক না, সুরেশ ভাবিল, তাহাতে তার কি যায় আসে। অশ্রুকে সে ভাল বাসিয়াছে, অশ্রু তাহার। অশ্রু যতই কেন নীচ হউক না, অশ্রু তাহার। কিরণময়ী যতই কেন পাপ করুন না, অশ্রু তাহার। অশ্রুকে পাইতে গেলে যদি সমাজ ছাড়িতে হয়, যদি মানুষের উপহাস সহ্য করিতে হয়, তাহাতেও সে প্রস্তুত—যদি সে শুধু এইটুকু বুঝিতে পারে যে ভগবানের চক্ষে অশ্রু নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্কী, নিষ্পাপী। জননীর উপদেশে জননীর সাহায্যে, ভগবানের ইঙ্গিতে সুরেশ সমাজ ত্যক্তা, মনুষ্য-বর্জ্জিতা অশ্রুকে হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারে। তবে অশ্রুর কিসের ভয়। কিসের চিন্তা! যাহাই কেন কিরণময়ীর ইতিহাস হউক না, তাহা জানিবারও সুরেশের প্রয়োজন নাই; সে শুধু জানে অশ্রু তাহার।

তবে কেন অশ্রু সুরেশের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সুরেশ যত ধরিবার জন্য আগে ছুটিয়া যাইতেছে, ততই সে পাছু হাটিয়া যাইতেছে কেন? তবে কি সে সুরেশকে চাহে না? আগেকার মত আর তাহাকে ভালবাসে না? তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারিলেই যেন অশ্রু বাঁচে। তাহার সহিত কথা না কহিতে হইলেই যেন অশ্রু শান্তি পায়। তাহাকে সম্মুখে না দেখিতে পাওয়াই যেন অশ্রুর ইচ্ছা—এইভাবে চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবামাত্র অভিমান মাথা তুলিয়া বলিল, "সে

যখন তোমায় চায় না, তখন তুমি কেন তার জন্য মর?" অমনি সুরেশ বলিয়া উঠিল "তাইত; ঠিক কথাইত। আমিই বা কেন তা'র জন্যে মরি। সে ত সত্যই আমায় চায় না।" ক্রোধ বলিয়া উঠিল, "অভিমান ঠিক কথাই বলেচে, সে যখন তোমায় চায় না তখন তুমি কেন তার জন্য মর?" ক্রোধ ও অভিমান দুইজনে মিলিয়া সুরেশকে দিয়া বলাইল, "অশ্রু আমার কে? সত্যি কথা বলতে গেলে কেউই ত নয়।" মিথ্যা অমনি দুইপাটী দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "অভিমান আর ক্রোধ যা বলেচে সেই কথাই ঠিক। অশ্রু ত বাস্তবিকই কেউ নয়।" সুরেশ বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই ত; সে আমার কেউ নয়।" এমন সময় বিবেক আসিয়া পিছন দিক হইতে কানে টান দিতেই, হৃদয়ে ধাক্কা মারিতেই সুরেশ পিছন ফিরিয়া হৃদয়ের মধ্যে দেখিল অশ্রু বসিয়া আছে, সেই একই ভাবে বসিয়া আছে—তবে সে হাসিটুকু নাই, সে স্ফূর্ত্তিটুকু নাই, মুখের সে উজ্জ্বলতাটুকু নাই। কিন্তু পূর্ব্ব অপেক্ষা আরও যেন সে হৃদয়টিকে জোরে জাপটাইয়া ধরিয়া আছে এবং কাতর ভাবে বেদনা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং যেন বলিতেছে "ওগো, আমি তোমায় প্রাণপণ শক্তিতে ধরে আছি? তুমিও আমায় অমনি ক'রে ধর। নইলে তারা যে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আমি তোমায় ছাড়ব না। কিন্তু তারা যে ছাড়তে বাধ্য করচে। তাদের যেতে বলে দাও। আমি তোমায় ছাড়ব না, কক্ষণ ছাড়বনা। তারা চলে যাক্।"

বিবেকের অনধিকার চর্চ্চায় অভিমান, ক্রোধ, ও মিথ্যা রাগে গর্ গর্ করিয়া বিবেকের প্রস্থানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল; বিবেক চলিয়া যাইলেই আবার সুরেশকে সৎপরামর্শ দিবে। সুরেশও বিবেকের সহিত কথা কহিতেছে বটে কিন্তু আড়চোখে উহাদের পানেও মাঝে মাঝে চাহিতেছে।

এমন সময়ে বিন্দুবাসিনী একটী পত্র হাতে করিয়া গম্ভীর মুখে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুরেশ তখন মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া সমস্ত সকালটা এই সব কথাই ভাবিতেছিল। বিন্দু-বাসিনী ডাকিলেন, "সুরো।" মায়ের বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া এবং গম্ভীর গলার স্বর শুনিয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল, "কি মা? ও চিঠি কিসের?" বিন্দুবাসিনী পত্রখানি পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "প'ড়ে দ্যাখ।"

সুরেশের তখন হঠাৎ ইন্দুর কথা মনে পড়িয়া গেল। পত্র ত প্রায়ই আসে কিন্তু এমন

করিয়া কোন দিন ত বিন্দুবাসিনী আসিয়া সুরেশকে ডাকেন না। তবে কি ইন্দুর কিছু হইয়াছে!

অশ্রুর কথাও যে না মনে হইল তাহা নহে। আসিবার সময়ে কিরণময়ীর শরীর খারাপ দেখিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার হৃদ্‌রোগটা খুবই বাড়িয়াছিল ইহাও সে মাকে অশ্রুর পত্রে জানিয়াছিল। তাঁহার অসুখে অশ্রু ত কোন বিপদে পড়ে নাই।

তাড়াতাড়ি পত্রখানি লইয়া সুরেশ পড়িতে লাগিল।

কিরণময়ী লিখিয়াছেন :—

দিদি,

সে আজ এক বচ্ছরের ওপর হয়ে গেল। মনে আছে বোধ হয় একদিন তোমার হাত ধরে বলেছিলুম "আজ থেকে অশ্রু আমার মেয়ে নয়, তোমার মেয়ে।" তখন অশ্রু রোগশয্যায় পড়ে।

সেইদিন থেকেই দিদি তাকে আমি তোমার পায়ের কাছে রেখে দিয়েচি। তার ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর কচ্চে। তোমার ইচ্ছে হয় তাকে তাড়িয়ে দিও; ইচ্ছে হয় বাড়ীতে একটু স্থান দিও। সে বড় অভাগী! বড় অসহায়! পৃথিবীতে তার কেউ নেই। তার মুখখানা দেখে, তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তাকে বাড়ীতে একটু স্থান দিও। আমার ইতিহাস শুনে, আমার পাপের এবং কলঙ্কের কাহিনী শুনে কেউ তাকে একটু থাকবার যায়গা দেবে না; সবাই তাকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু, দিদি, আমি জানি তুমি কখন তাকে তাড়াতে পারবে না। সেই ভরসাতেই আমি আজ তাকে তোমার পায়ের তলায় রেখে সুখে মত্তে পাচ্চি।

আমি বেশী কিছু আশা কচ্চি না। শুধু তাকে দু'বেলা খেতে দিও যেমন তুমি তোমার অন্য ঝী চাকরাণীদের দিয়ে থাক এবং তাদেরই মত তাকে একটু মাথা গোঁজবার যায়গা দিও। আমার মেয়ের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী আমি কল্পনাও কত্তে পারি না। হ্যাঁ আর একটা কথা, রতনকে তাড়িয়ে দিও না। অশ্রুকে না দেখে সে বাঁচতে পারবে না। অশ্রু তার প্রাণ। তাকেও তুমি চাকরের মধ্যে বাহাল ক'রে নিও।

তুমি সন্তানের জননী। তোমার মায়ের প্রাণ। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পাচ্চ, দিদি, এ কথাগুলো লিখতে আমার কতখানি কষ্ট হচ্চে, কতখানি প্রাণ ফেটে যাচ্চে। আমার জন্যই আজ অশ্রুর এত কষ্ট। নইলে সে পৃথিবীতেই বা আসবে কেন আর এত কষ্টভোগই বা করবে কেন? অশ্রুর কাছেই আমি আমার জীবন্মৃ-

খানা রেখে গেলুম। সেইটে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে আমার কেন এত জ্বালা, কেন এত অশান্তি, কেন এত চিন্তা।

আমার নিজের কর্ম্মের জন্যে আমি একদিনও অনুতাপ করিনি, কখন করবও না। কিন্তু কি জান দিদি, করবনা বল্লেও মাঝে মাঝে যেন অনুতাপ এসে পড়ে। সেটা আমার জন্যে যতটা নয় ততটা অশ্রুর জন্যে। মানুষের হাসি, সমাজের টিট্‌কিরী আত্মীয় স্বজনের বর্জ্জন এসবের জন্যে একদিনও আমি অনুতাপ করিনি, দুঃখু করিনি, প্রায়শ্চিত্ত করবারও দরকার বোধ করিনি। কিন্তু, অশ্রুর মুখ দেখে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে মাঝে মাঝে আমার অনুতাপ হয়। ভগবান যদি অশ্রুকে আমার কাছে না পাঠাতেন তাহ'লে আমার কোন দুঃখুই ছিল না। ওরই জন্যে আমার যত ভাবনা, যত চিন্তা, যত মনোকষ্ট।

তোমার কাছে, তোমার আশ্রয়ে, তাকে রেখে যেতে পাচ্চি এইটুকু মনে করে আমি আজ অনেকটা শান্তিতে মত্তে পাচ্চি। আবার বলি দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে কখন তাড়িয়ে দিও না। বাড়ীতেও যদি স্থান দাও, ওর অভিভাবকের মত হ'য়ে থেক। যদি পার, দেখে শুনে ওর একটা বিয়ে দিও! বিয়ে ওকে কেউ করবে না তা আমি জানি। আমার ইতিহাস শুনে ওর কাছেও কেউ আসবে না। তবে যদি এমন দয়ালু কেউ থাকে যে আমার সমস্ত ইতিহাস শুনেও আমার অশ্রুকে চরণে স্থান দেবে তারই সঙ্গে ওর বিয়ে দিও দিদি।

আর তোমায় লেখবার কিছু নেই, বল্‌বার কিছু নেই, জানাবার কিছু নেই। জীবিতাবস্থাতেই তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েচি। মরণের সময়েও তোমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্চি। কিন্তু কি করব, এর কোন উপায় নেই। আমাকে এ বোঝা চাপাতেই হ'বে আর তোমাকে এ বইতেই হবে। সুরেশকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। তুমি আমার অসংখ্য প্রণাম জেন। এ চিঠি যখন তোমার কাছে যাবে তখন আমি তোমাদের ছেড়ে, আমার অশ্রুকে ছেড়ে অনেক দূরে, যে মহাতীর্থের দিকে আমার চিরকাল লক্ষ্য সেখানেই চলে যাব। অশ্রুকে আমি অনেক করে বলেচি আমি ম'রে গেলে যেন সে এ চিঠি ডাকে ফ্যালে।

আবার বলচি, দিদি, অশ্রু আমার বড় অভাগী, বড় অসহায়। আমি তাকে চিরকাল আমার বুকের মধ্যে চেপে রেখে এতবড় করে তুলেচি। আমার সমস্ত দুঃখু কষ্ট, মনের জ্বালা অশান্তি কিছুই তাকে জানতে দিইনি। মানুষের কাছে, সমাজের কাছে আমরা কত ছোট, কত

নীচ, কত হীন একদিনের জন্যেও তাকে বুঝতে দিইনি। তাকে শুধু এইটুকুই শিখিয়ে এসেচি **ভগবানের কাছে আমরা পাপী নই, দোষী নই।**

যখন সে আমার ইতিহাস পড়ে অকুল পাথারে পড়বে, সংসার সমুদ্রে ভেসে যাবে, দিদি, তুমিই তাঁকে আমার মত বুকে চেপে ধোরো। তোমার কোলের মধ্যে সে আমারই কোলের মত শান্তি পাবে, সুখ পাবে। মনে কোরো দিদি, সুরেশ তোমার যেমন ছেলে, সেও তেমনি তোমার মেয়ে।

মনের আবেগে বোধ হয় অনেক অসংযত কথা বলে ফেলেছি। কতকগুলো শুধু আবোল তাবোল, মাথা মুণ্ডু বকেছি। যাই কেন বলিনা দিদি, আমার এখনকার মনের অবস্থা কল্পনা কোরে আমায় ক্ষমা করো। আমি যদি অশ্রুর মা না হ'তুম তাহ'লে বোধহয় আজ এমন করে এসে তার জন্যে তোমার কাছে বলতে পাত্তুম না। আর, দিদি, তুমিও যদি 'মা' না হ'তে তাহ'লে মায়ের এ দুঃখ কক্ষনই বুঝতে পার্ত্তে না। তুমি সন্তানের জননী বলেই আজ আমি তোমাকে এত কথা বলে যাচ্ছি। মা নইলে মায়ের বেদনা কে বুঝবে দিদি? সকলের কাছে ঘৃণ্য হ'লেও অশ্রুর কাছে আমি তার মা। মা বলেই আমার আজ এত জ্বালা, এত বেদনা, এত অশান্তি! মা বলেই আজ আমি এত কথা মায়ের কাছেই বলে যাচ্ছি। ইতি,

"তোমার দিদি—**কিরণ**।"

সকাল হইতে যে চিন্তার ধারা সুরেশের হৃদয়কে প্লাবিত করিতেছিল, হঠাৎ তাহা শুকাইয়া গিয়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল এবং তাহার স্থলে করুণার, সহানুভূতির, স্নেহের এবং ভালবাসার বন্যা আসিয়া ভরিয়া গেল। পত্র পাঠ শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া সুরেশ বলিল,—"তাহ'লে এখন উপায় কি মা?" বিন্দুবাসিনী এতক্ষণ কি একটা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন,—"যাওয়া ছাড়া আর উপায় দেখচি না সুরো।" সুরেশ বলিল,—"আজকেই যাবে?" বিন্দুবাসিনী বসিয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"আজই বিকেলের গাড়ীতে যেতে হবে। সময় ত আর বেশী নেই, তুই শিগ্‌গীর নেয়ে খেয়ে নিয়ে ষ্টেসনে গিয়ে একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করে আয়। আমি ততক্ষণ এ দিক্‌কার সব গুছিয়ে নি। ভাবিস্‌নি সুরো, এতে ভাববার কিছু নেই, গাড়ী রিজার্ভ যদি না হয় তবুও আজ যেতে হবে।" সুরেশ বলিল,—"সে কথা ভাবি নি মা, ভাবছিলুম অশ্রুর সেই চিঠিখানা পেয়েই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল।" ক্রমশঃ

জ্যোৎস্না রাত্রি।

(কবি প্রসিদ্ধি)

ললিত ছন্দে।

শ্রীরাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

মনঃ প্রীতি-কর, পূর্ণ সুধাকর,
সুনীল অম্বর, করে উজ্জ্বল।
চকোরী চকোর, উল্লাসে বিভোর,
চাতক কঠোর, খেদ-বিহ্বল॥

চন্দ্র প্রণয়িনী, ফুল্লা কুমুদিনী,
মানস মোহিনী, মরাল গ্রীব।
নিশাচর পাখী, ত্যজি নীড় শাখী,
আনন্দেতে মাখি, হ'ল উদ্‌গ্রীব॥

সূর্য্য বিরহিণী, শ্রীহীনা নলিনী,
মরম ঘাতিনী, বিষাদে রহে।
কোকিল কাকলি, পাপিয়ার বুলি,
থেকে থেকে খালি, আনন্দে বহে॥

চক্রবাক্ বধূ, হারাইয়া বঁধু,
নাহি পিয়ে মধু, বিরহে রহে।
উজ্জ্বলে মধুরে, পাপিয়ার সুরে,
প্রকৃতির উরে, চন্দ্রমা রহে॥

সরসীর জলে. অতি কুতুহলে,
অম্বর মণ্ডলে, সুধাংশু ভাসে।
চাঁদেতে জলেতে, মিশিতে মিশিতে,
অরিতে অরিতে, অমিয় আসে॥

যেন কত চাঁদ, ধরি নানা ছাঁদ,
পাতিয়াছে ফাঁদ, হরষে মজে।
লোকে লোক মিলে হেরে কুতুহলে,
ধরিতে সকলে, মনের মাঝে॥

কৌমুদী উজ্জ্বলে, জলের কল্লোলে,
বায়ুর হিল্লোলে, মাতিয়া ধরা॥
প্রকৃতি সুন্দরী, সহ বিভাবরী,
লইয়া বল্লরী, প্রসূন পরা॥

সুমোহন সাজে, ছায়াপথ মাঝে,
হিমাংশু বিরাজে, হইয়া রাজা।
নক্ষত্র নিকরে, পুলকিত করে,
ধরি করে করে, হয়েছে প্রজা॥

খদ্যোতের কুল, হইয়া আকুল,
নহেক বিপুল, রশ্মি আলায়।
প্রকৃতি সমূল, সুরায় আকুল,
ফোটায় বকুল, মুখ-সুরায়॥

গরবের ভরে, তার পদভরে,
অতি সকাতরে, অশোক ফোটে॥
সৌরভ পাইয়া, ভ্রমর জুটিয়া,
গুঞ্জিয়া গুঞ্জিয়া, পীযুষ লোটে॥

গয়ার ইতিহাস। [দন্তশিরপুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল।

দন্তশীরপুর কেবল মাত্র বৌদ্ধ জগতের তীর্থস্থান নহে। যে মহামতি বঙ্গ ও দক্ষিণ-ভারতের আচণ্ডালে প্রেম ও ভক্তি রস শিক্ষার এবং পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় ভাব প্রকাশের অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেই ভগবান জগৎপূজ্য শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রথম দীক্ষা ঈশ্বরপুরীর নিকট গয়ায় ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের পাদদেশে রাধাশ্যামী-কুণ্ডের পার্শ্বেই হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং সেই প্রেমময় ভগবান গৌরচন্দ্র যে যে বার ৺কাশীধামে পদব্রজে গমন করেন, সেই সেই বারই তিনি গমনাগমন উভয় বারেই এই নিরদা-বিধৌত পুণ্যতোয় প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধের অবগাহ ও কোমল পুণ্যময় পদস্পৃষ্ট এই দন্তশীরপুরের জলাশয়ে অবগাহন করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। গয়া জেলা হইতেই রামকৃষ্ণ, লাক্সাবাবা, বিজয়কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, বুদ্ধভগবান প্রমুখ ভারতের ধর্ম্ম-প্রচারক ও ভাবপ্রকাশকগণ তথা মহাবীর প্রমুখ জৈন নেতাগণ এই গয়া জেলা হইতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবস্ফুরণ ও চিন্তা স্রোতের অমিয়মাখা ধারা-সম্পাৎ অজ্ঞ ও দীন জগৎবাসীকে দান করিবার জন্য পূর্ব্বাভাষ ও পরিচয় দিয়াছিলেন। তাই এই পুণ্য-সলিলা জলাশয়-তীরে এমন কি সমগ্র গয়া জেলার মধ্যে একটীও বৈষ্ণব-মঠ নাই। ইহা কি বঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী তথা পৃথিবীর সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের চির কালিমা নহে? কয়েক বৎসর গত হইলে বসুমতী পত্রিকায় যে স্থানে ভগবান চৈতন্যদেব গিয়া বাস করিয়াছিলেন সেই খানে একটী মঠ নির্ম্মাণের সংকল্প বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী ও নিঃস্বার্থ লোকের অভাবে তাহা চাপা থাকিয়া যাইল। টাকীর খ্যাতনামা জমীদার বাবু যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মাননীয় সার মনীন্দ্রনাথ নন্দী বাহাদুর আমাকে এ বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য দান করিবেন বলিয়া আমাকে প্রতিশ্রুতি পত্রও লিখিয়াছিলেন কিন্তু আমি প্রকৃত নিঃস্বার্থ ও বিশ্বাসী সহযোগীর অভাবে এই গুরুতর জাতীয় ও ধর্ম্মের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে রাজী

ও ইচ্ছুক হই নাই। যেস্থানে ভগবান চৈতন্য প্রভু গয়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে তিনি ভাবে গদ গদ হইয়া ভগবানের লীলা ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থান কেবল বৌদ্ধ জগতের নহে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও মহাতীর্থ স্থল বলিতে হইবে। যদি বেলুড নবদ্বীপ মথুরা বৃন্দাবন হালিসহর, কৌন্দবিল্ল, ত্রিবেণী, উজ্জয়িনী, পুরী, চন্দ্রনাথ, বোলপুর, নলহাটী, জলপাইগুড়ী, জ্বালামুখী, বৈদ্যনাথ যশোহর, নারীট্ট প্রতাপনগর, ইত্যাদি হিন্দু-তীর্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে,তাহা হইলে প্রাচীন দস্তশীরপুর—যেখানের স্মৃতি বুদ্ধ ও চৈতন্যের সহিত জড়িত—কেন এই দুই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বিগণের তীর্থরূপে গৃহীত ও সিদ্ধ হইবে না। তাই বলি যে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এই দিকে দৃষ্টি দান করুন।

১৯০০ সালে তিব্বতের প্রসিদ্ধ যোগী তাশীলামা ভুটান হইয়া গয়াদর্শনে ও বুদ্ধ গয়া পর্য্যবেক্ষণ ও ভ্রমণে আসিলে আমার অতিথি হন। সেই উপলক্ষ্যে আমি তাঁহাকে যত্নে গয়া নগরের যাবতীয় দর্শনের যোগ্য স্থানগুলি ভ্রমণ ও পরিদর্শন করাইতে তিনি রাজগৃহ ও গুরপা ভ্রমণ করিয়া কপোতিকা, বিষ্ণুপুর টাড়োয়া, কুর্কীহার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বলিলেন যে দস্তশীরপুর ত দেখিলাম না। তাহাতে আমি বলিলাম যে, তাহার কোন নিদর্শন বা উল্লেখ ইংরাজি বা বৌদ্ধগ্রন্থে পাই নাই; তাহার অস্তিত্ব কোথায় ছিল? তাহাতে উত্তরে চীনপীঠক গ্রন্থ হইতে এই উভয়ের মতে পণ্ড-হাঁস-পাতালের ও দস্তশীরপুর মঠের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়া দিলে আমি ক্রমশঃ ক্রমশঃ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি, তাহা এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত করিলাম। ১৯০৪ বা ১৯০৫ সালে সিবিলামা ও দলাইলামার আদেশে বুদ্ধগয়া পরিদর্শনে আসিয়া এইরূপই কথা বলিয়াছিলেন এবং আমার অতিথি হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাবোধির ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে গয়ায় আসেন, তখন আমার পিতার আতিথ্য স্বীকার করেন এবং আমিই তাঁহাকে সিলাও (শিলাভদ্র) প্রবরগিরি (বরাবর) বুদ্ধগয়া ইত্যাদি বহু স্থল পরিভ্রমণ করাই। পরে জজ ক্রাষ্টার ও মিঃ বিগনগু সাহেবের সময় যখন ডাঃ ক্যানিংহাম দুইবার গয়া পরিভ্রমণ করিতে আইসেন, তখন তাঁহাদের পরিদর্শনের ভার আমার পিতা ৺উমেশচন্দ্র সরকার গয়ার সরকারী উকিল বিধায় তাঁহারই মাথায় পড়ে, তাঁহার আদেশে আমি উক্ত মহোদয়গণকে সকল স্থান পরিদর্শন করাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত আমি অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করি। তিনি দস্তশীরপুরেও (ডুমরায়) আসিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার সম্বন্ধে কিছুই তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করেন নাই। এইখানে মহারাজ দশরথের সময়ে খোদিত এক শীলালিপি পাইয়াছিলাম। তাহা এখন কালের স্রোতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী।

(শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস)

পূর্ব্বকালে নদন্ত নামে একজন নরপতি ছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র ছিল। নদন্ত নৃপতি পুত্র কএকটীকে শ্রীহরির প্রিয়পাত্র করিবার মানসে বহু কাল যাবৎ নির্জ্জনে বসিয়া আরাধনা করেন। ভগবান তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া নৃপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন—"আমি তোমার আরাধনায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমার মনমত বর গ্রহণ কর।" নৃপতি কহিলেন "প্রভো, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে তবে এই বর দিন—যেন আমার চারিটী পুত্র আপনার প্রিয়পাত্র হয়। ভগবান 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। কালক্রমে ঐ চারিটী পুত্র বৃন্দাবনে একটী বংশবৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ চারিটী পুত্রের নাম স্বর, সুর, রাগ ও অনুরাগ।

একদা মুর নামক দৈত্য কন্দর্পকে গরুড় করিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ সাবিত্রীর নিকট হইতে বেদ হরণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। বিষ্ণু তখন স্বধামে উপস্থিত ছিলেন না। সরস্বতী বিষ্ণুরূপা মুরকে দেখিয়া সুখী হইলেন না—বরং ম্লান হইলেন। মুর সরস্বতীকে ম্লান দেখিয়া প্রিয় বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়ে আজ এত ম্লান দেখিতেছি কেন! এস আমরা বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়া সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া স্বপুরে গমন করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সরস্বতী বিষ্ণুরূপী মুরকে চিনিতে না পারিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং মুরকে 'রক্ষোত্তম' বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন। সেই মুরপুরে সরস্বতীর চক্ষের জল হইতে একটী অশোক বৃক্ষের উৎপত্তি হইল, দেবী তাহার মূলে বসিয়া ক্রন্দন

করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিষ্ণু স্বধামে আসিয়া দেখিলেন, সরস্বতী গৃহে নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুশীল ও পুণ্যশীল নামক দুই জন দুতকে প্রেরণ করিলেন। দুই দুত বহু স্থানে অনুসন্ধান করিয়া সরস্বতীর উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে মুরপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সরস্বতী অশোক বৃক্ষের মূলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তখন দুই দুত মুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুরও নানা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই দুত মুরের নিকট পরাজিত হইয়া শ্রীহরির নিকট গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বিবরণ কহিলেন। বিষ্ণু দুতদ্বয়ের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজেই যুদ্ধার্থে মুরপুরে গমন করিলেন এবং অতিকষ্টে মুর দৈত্যকে সংহার করিয়া বেদের সহিত সরস্বতীকে উদ্ধার করিলেন। সরস্বতীকে উদ্ধার করিয়া কহিলেন—প্রিয়ে! তুমি আমার অংশ-ভূতা হইয়াও, অসুরমায়ায় মোহিত হইলে, অতএব আমি তোমাকে এই শাপ দিতেছি যে "বৃন্দাবনে মহারণ্যে বংশবৃক্ষো ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ বৃন্দাবনের অরণ্যে বাঁশগাছ হইয়া জন্ম-গ্রহণ ক'র। সরস্বতী শাপের কথা শুনিয়া শ্রীহরির পদযুগল ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—"প্রভো! এ দাসী আপনার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। শ্রীহরি কহিলেন "প্রিয়ে! আমার বিরহ তোমায় সহ্য করিতে হইবে না তুমি আমার নিকটে থাকিয়া সদা সর্ব্বদা আমার অধর সুধা পান করিবে।" সরস্বতী বৃন্দাবনে আসিয়া ঐ বাঁশগাছে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণের উপযুক্ত হইলে প্রজাপতি ঐ বাঁশগাছকে তুলিয়া চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ বাঁশের মূলভাগে বেণু, মধ্যভাগে মুরলী, তদূর্দ্ধে বংশী এবং অগ্রভাগে গোচারণের যষ্ঠি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। সেই বংশীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোক মোহিত করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের বেণুতে স্বর। মুরলীতে স্বর ও সুর। বংশীতে স্বর সুর ও রাগ আছে। এবং অনুরাগ নামে যষ্ঠী। কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে বিরাগ নামে যষ্ঠী। ইহার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণু বাদন করিতেন, ব্রজবাসীগণ বেণুর রব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। যে সময় মুরলী বাদন করিতেন ব্রজবাসীগণের কর্ণে সুধাসম প্রবেশ করিয়া সকলকে মুরলী রবে মুগ্ধ করিত। যখন বংশী-

বাদন করিতেন ব্রজবাসীগণ বংশীরবে এতই মোহিত হইতেন যে জ্ঞানশূন্য উন্মাদের ন্যায় যে যে অবস্থায় থাকিত সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইত। রাসের সময় ও গোপগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেন। আর শ্রীকৃষ্ণের হাতে অনুরাগ নামক যষ্টি যার অঙ্গ স্পর্শ করিত, সে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া পাগল হইত। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানিত না।

"ভারতীয় ভাব।"

[অধ্যাপক শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ বেদান্তভূষণ]

সংসার একটি প্রাসাদ। আচার ইহার স্তম্ভ—ধর্ম্ম ইহার ভিত্তি। যেমন ভিত্তিহীন গৃহ অচিরেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়, ধর্ম্মহীন সংসারও তদ্রূপ। কিন্তু; এই ধর্ম্ম যে কি; অথবা ইহার স্বরূপ যে কাহাকে বলে, এ বিষয়ে জৈমিনি মনু প্রভৃতি ঋষিদিগের বহুবিধ অভিমত সংলক্ষিত হয়, এবং বর্ত্তমান জনসমাজের বিভিন্ন রুচিতেও বহুধা আলোচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমাদিগের মধ্যে অনেকেই ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব পরিগত হন না। পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্মের অপলাপ হইলেই ঋষিগণ বা তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ 'অব্রহ্মণ্যং অব্রহ্মণ্যম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন, এখন কিন্তু কাহারও মুখে ঐরূপ বাণী আর শুনিতে পাওয়া যায় না; কারণ ধর্ম্মের সুশৃঙ্খলতা বহুদিন হইতেই প্রায় ভারত-বক্ষঃ হইতে তিরোহিত। তবে ধর্ম্ম 'সনাতন' আর এ ধর্ম্মের উপরে ভগবানের পূর্ণকৃপা প্রতিনিয়ত বিরাজমান। সুতরাং 'অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মত' এখনও ভারতবক্ষে তাই ধর্ম্মনদী প্রবাহিত। এবং হিন্দু জাতি বলিয়া 'জাতীয় গৌরব চির-প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মহীন অনেক জাতির নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও হিন্দু অক্ষত শরীরে দম্ভের সহিত জাতীয় জগতে দণ্ডায়মান। যেহেতু এই জাতীয় জগতের মূলে এক অখণ্ড ধর্ম্ম চির বিরাজিত। কত বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, এই সনাতন ধর্ম্ম কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, কত অন্যায় অপলাপের উদ্যতদণ্ড ভ্রূকুটির চক্ষে ধর্ম্মকে ভয় দেখাইয়াছে, কিন্তু এ যে ভারত! ভারতের ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে ভারত মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন।

এইজন্য তাঁহারই শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥

আমরা এখনও শুনিতে পাইতেছি। তিনি ভারতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'হে ভারত! তুমি আমার পূর্ণ লক্ষ্য স্থল। তুমি নির্ভয়ে অবস্থান কর, যখন যখন তোমার বক্ষে কোনরূপ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে, অথবা অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে, তখনই আমি শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিব।' বাস্তবিকই দেখা যায়, যখন যখন ধর্ম্মহানি বা ধর্ম্মের উপর কোনরূপ প্রতিঘাত হইয়াছে, তখনই কৃপামূর্ত্তি ভগবান্‌ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতকে অধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত—ভারতে ভাগবতীয় অবতার। প্রতি ভাগবত মূর্ত্তিই ইহার পূর্ণ নিদর্শন স্বরূপ। ধর্ম্ম-বিপ্লব হইতে পরিত্রাণ করাই—প্রতি অবতারের লক্ষ্যস্থল। যখন সাত্ত্বিক ভাবের অপচয় হইয়া রাজসিক ভাবের উপচয় হয় এবং তাহারই জন্য মানব সমাজে বহুত্র আসুরিক ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব আনয়ন করে; তখনই শ্রীভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া বিপ্লব বন্যায় প্লাবিত ভারতকে যথাপূর্ব্ব উদ্ধৃত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের কল্যাণ সাধন করেন। এবং ধর্ম্মও অক্ষুণ্ণ হইয়া পুনঃ মানব সমাজে পবিত্রতা সম্পাদন করে, আর মানব জীবন গঠিত হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুকূলে যথার্থ শান্তি লাভের অধিকারী হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা ও অধর্ম্মের বিনাশই ভারতে প্রতি অবতারের অবতারত্ব। দেখা যায় দিগ্বিজয়ী রাবণ অব্যাহত শক্তিতে যখন ত্রিভুবন পরাভব করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন, যখন পরস্ত্রী হরণই তাহার একমাত্র কর্ম্ম হইয়া উঠিল যখন দেব-চরিত্র স্বর্গলোক, পুণ্য-চরিত্র ঋষিলোক সন্ত্রস্ত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মাচার হইতে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল তখনই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। তিনি স্বয়ং রামচন্দ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এবং উদ্বুদ্ধ প্রকৃতিকে সীতারূপে অভিব্যক্ত করিয়া 'লীলা-কৈবল্যের' অনুসরণ করিলেন। আবার পিতৃ প্রতিপালন ছলে যৌবনে 'সূর্য্য-বংশের পশ্চিম বয়সে অবলম্বনীয়' বাণপ্রস্থ ব্রত ধারণ করিয়া সহধর্ম্মিণী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত কঠোর বনবাসকষ্ট স্বীকার করতঃ মানবলীলার পরিপুষ্টি বিধান করিলেন। দুশ্চরিত্র রাবণ রামকে ভদবস্থ দেখিয়া অতিমানুষী সীতার অসামান্য-রূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি ধরিয়া সীতাকে অপহরণ করিলেন। তাই আজ অনুরক্ত রাবণের স্বর্ণবপ্রবলয়িত স্বর্ণজয়িনী

লঙ্কাপুরীর তোরণদ্বারে অবস্থিত ভক্তিমুক্ত মহাদেব রাবণের দুর্ব্ব্যবহারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবতী বিদিতবৃত্তান্তা হইলেও ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন কেন? "সীতাপহরণ?" ইহাত তাহার ব্রত! ইহাই তো আসুরী বৃত্তি। সুতরাং 'রাক্ষস-রাবণ' সীতাহরণ করিয়াছে বলিয়া আপনি আপনার পরমভক্ত রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন—ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের কথা।

মহাদেব ভগবতীর কথায় হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "পার্ব্বতি! সত্য! তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু রাবণ যদি রাক্ষসী বৃত্তির অনুসরণ করিয়া সীতাকে অপহরণ করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতাম না, সে যে ব্রাহ্মণ বৃত্তির অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে সীতাকে অপহরণ করিয়াছে, ইহাতে ব্রাহ্মণ বৃত্তি ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কলঙ্কিত হইয়াছে, এইজন্য আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।" কি সত্য কথা! কি কল্যাণের কথা! ভারতের ধর্ম্ম, সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, উদার ও নিত্য সত্য এই হিন্দু-ধর্ম্মের উপর যদি কখনও কোনরূপ আঘাত হইয়া থাকে বা হইতে থাকে, অথবা কখনও বৈষম্য বা বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ তাহার প্রতিরোধ করিয়া থাকেন।

এইজন্য দেখা যায় এ ভারতে কখনও যুদ্ধ ব্যাপার স্থান পায় না। প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসই ইহার পূর্ণ নিদর্শন স্বরূপ। যখন যখন জাতীয় জগতে সংগ্রামের সাড়া পড়ে অথবা পরস্পরের কলহ-পরম্পরায় যখন জাতীয় জগৎ বিধ্বস্ত হইতে যায়, তখনই তাহার প্রতিরোধক কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত। যখন প্রাচ্য প্রতীচ্যের মহা সংঘর্ষণ আসিয়া ভারতকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন কি জানি কোন এক মহাসুপ্রাণতায় মহাত্মা গান্ধী বলিয়া উঠিলেন—(Nonviolence) অর্থাৎ সংঘর্ষ করিও না। ইহা ভারতের ধর্ম্ম নহে, পূতচরিত্র আর্য্যঋষিগণের প্রদর্শিত পথ ইহা নহে, ইহাতে শান্তি নাই, হিংসায় অশান্তি! হিংসা মানুষকে মনুষ্যত্বে বঞ্চিত করে, হিংসা দেবত্বের বিনিময়ে অসুরত্বে পরিণত করে। যদি শান্তি চাও! হও জ্ঞানগুরু! হও কর্ম্মগুরু! দেখিবে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছ। অভাব অভিযোগ অসূয়া আর আত্মগ্লানি থাকিবে না। শান্তির জন্য

তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না, শান্তি তোমাকে অন্বেষণ করিয়া লইবে।

সমগ্র ভারত যেন হারাণ ধন পাবার মত পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শবশরীরে জীবন সঞ্চারের মত যেন একবার ভারতটা স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কৈ! তাহা থাকিল কৈ? মহাত্মার বাণী রক্ষিত হইল কৈ? গ্রহণ করিতে পারিল কৈ, এযে ভিত্তিহীন সৌধ প্রাসাদ। ইহা কি কখনও দাঁড়াইতে পারে, এখনও অপ্রস্তুত, ভারত এখন ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখেনা, ধর্ম্ম যে এখানকার ভিত্তি, তাহা তাহাদের হৃদয়ে এখনও দৃঢ়ভাবে স্থান পায় না। ধর্ম্মকে ব্যভিচারের ভিতর দিয়া বর্ণাশ্রমবহির্ভূত আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মজগতে ধার্ম্মিক হইলে তো আর বাস্তবিকই ধর্ম্মের উপাসনা বা ধর্ম্মকে প্রাণবান্ অথবা ইহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা হইবে না। যথার্থ আর্য্যপ্রভাব অনুকরণ করিতে হইবে। নিজেদের ভিতর হইতে কদাচারের ছবিগুলি একেবারেই সরাইতে হইবে। তবে তো বিশ্ববিজয়ী। তুল্য বলশালী না হইলে কি তুল্যবলকে পরাজিত করা যায়? তাই তো চণ্ডীতে প্রকৃতি নিজেই বলিতেছেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে সমেভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

হে শম্ভো! যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাভূত করিতে পারিবেন, যিনি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারিবেন, এবং যিনি আমার তুল্য বলশালী হইবেন তিনিই আমার স্বামী হইবার উপযুক্ত। সুতরাং নিজেদের অবস্থার অনুধাবন করিলে তো স্বতঃই বোধগম্য হয় যে, আমরা কিরূপ ধার্ম্মিক, আর আমাদের উদারতা কতদূর? এবং সংযম ও সত্যবাদিতা কতদূরে? সুতরাং ধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে সত্য, সরলতা ও বর্ণাশ্রমাচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাকে পোষাকী করিলে চলিবে না। কেবল বক্তৃতা প্রসঙ্গে আর গ্রন্থালোচনায় ধর্ম্মের আস্ফালন করিলে ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে না, বরং শিথিল হইয়া ক্রমশঃ ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়া যাইবে। ইহাকে প্রাণের মধ্য দিয়া, কর্ম্মের মধ্য দিয়া, আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া অনুভূতি করিতে হইবে। তবে ইহার যথার্থ উপলব্ধি হইবে, কার্য্যে পরিণতি হইবে! নতুবা বাগাড়ম্বরেই ইহার পর্য্যবসান। এইজন্য এই ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাই মনুষ্যজীবনে মুখ্যতম কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি পৌরাণিক মন্ত্রার্থ অবগত হইলেই ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে না। যেমন—

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসো গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে ॥

বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ার দ্বারা লভ্য মানবীয় গুণই ধর্ম্ম নামে আখ্যাত। এবং নিষিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্য মানবীয় গুণই অধর্ম্ম বলিয়া কথিত। সুতরাং ইহাই মাত্র বুঝিয়া রাখিলে চলিবে না। ইহার গভীরতা ও সার্থক্য অনুভূতি করিতে হইবে। ব্যবহারে আনিতে হইবে। জীবনে পরিণতি করিতে হইবে, তবে "ধর্ম্ম রক্ষা! এইজন্য এই ধর্ম্ম বিশাল ও সার্ব্বভৌমিক এবং বিরাট ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার কোন অংশ পরিত্যজ্য নহে। সকল অংশই গ্রহণীয়। হিন্দুর স্নানাহার হইতে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি একটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সকল ধর্ম্মই একসূত্রে গ্রথিত, যতক্ষণ এরাজ্যে যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধির মধ্যে, ততক্ষণে ঐ সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

তারপর—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে, সকল সংশয় নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং নির্ব্বাণকর্ম্মও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এইজন্য গীতাতে শ্রীভগবানও বলিতেছেন—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণংব্রজ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য প্রয়াণে।

(শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী)

নহে ত' মানব, মানবের বেশে ওই নারায়ণ আজি,
বৈকুণ্ঠ হইতে মরতে নামিল ধরম বসনে সাজি।
শিরায় শিরায় প্রবাহিত তাঁর ভকতি, পীরিতি
ধারা,
সে ধারাপানে বিরাট এ বঙ্গ হইল গো
আপনহারা।
ভুবনে ভবনে চারিভিতে ঐ ছুটিল মধুর সৌরভ,
তাঁহার পদে লুটায়ে পড়িল, গাহিল নামের
গৌরব।
কোটি কোটি জন মুগধ পরাণে শুনিল আশার
বাণী,
হৃদয় মন্দিরে স্থাপিল যতনে শ্যামের মূরতি
খানি।
নরনারী ওই ডাকিল শুধু কোথায় আছ প্রাণধন,

এস প্রভু গো, মোহন বেশে বিতর করুণা অনুক্ষণ।"
ভাবিল চৈতন্য বিপুল হরষে "পেয়েছে সবে সন্ধান,
কি ফল এ প্রবাসে আর, পেয়েছে জীব যবে দিব্যজ্ঞান।
আজি শান্তি, সুখ সিঞ্চিতে বিশ্বে ওঠে আনন্দ-কলরব,
পাপী তাপী ঐ পুণ্যে মগন, গাহে প্রভুর জয় রব।
ধন্য বঙ্গ, ধন্য নদীয়া, ধন্য জননী করুণা অপার,
সার্থক এ আগমন হেথা, সার্থক নরজন্ম আমার।
ধন্য ভক্ত, ধন্য প্রেমিক, ধন্য বনিতা মোর বিষ্ণুপ্রিয়া,
চিরবন্ধনে বাঁধিলে মোরে, ত্যজিতে সবে আকুল হিয়া।
কিন্তু আজি অবসান করমের, করে আহ্বান নিয়তি,
করি অবহেলা সেই আহ্বান, নাহি যে মোর শকতি।"
এতেক ভাবিয়া শ্রীচৈতন্য চাহিলা বারেক বঙ্গপানে,
গৈরিক অঞ্চলে মুছিয়া নয়ন, কহিলা শান্ত আননে ;—
"বহুক বঙ্গে ধর্ম্মস্রোত, কুশলে রহুক মম ভকত,
প্রেমধারাপানে সুখ সম্পদে হ'ক নিমগন সতত।
যদি কভু তারা ভুলে যায় নাম,—ভুঞ্জে অশান্তি, বেদনা,
সে মোহ করিয়া দূর দিওরে নদীয়া তাদের চেতনা ;
আসিব আবার খেলিতে হেথা সে দুঃখ রজনী প্রভাতে,
আবার মাতি, কৃষ্ণপ্রেমে যাব দ্বারে দ্বারে নাম বিলাতে।
প্রবাস ত্যজিয়া প্রেমের ঠাকুর চলিলা আপন লোকে,
ভরিল বিশ্ব, ভরিল বঙ্গ, ভরিল নদীয়া শুধু শোকে।
বহুদিন পরে আজিকে প্রভু, স্মরি তব আশ্বাস-কথা,
নদীয়া পানে চাহিয়া কাঁদি, জাগে পরাণে অযুত-ব্যথা।
ভুলিয়া তোমা ভুলিয়া ঠাকুরে পেতেছি যাতনা অশেষ,
সদা ভয় হয় আর বুঝি ফিরে আসিবে না হে প্রাণেশ!
করিবে কি ক্ষমা! ত্যজিবে কি মান ;
আসিবে কি প্রাণধন?

শুনাবে কি মধুর নাম শিখাবে কি মুক্তি পথের
পণ ?
তুমিই বলেছ, প্রয়োজন মত আসিবে তুমি,
আসিবে,
ধর্ম্মের কেতন উড়ায়ে বিশ্ব দ্বারে দ্বারে প্রভু,
ফিরিবে।
আজি ডুবেছি মোরা পাপ পঙ্কে, চারিদিকে ঐ
হাহাকার,
ধরার কলুষ হ'য়ে সঞ্চিত, ধ'রেছে ভীষণ
আকার।

অভিমান ত্যজি বারেক হেথা এস গো তুমি
ক্ষমাময়,
তোমারি রচিত মোহন বিশ্বটী বুঝিবা হইল লয়।
এস গো এবে আকুল স্মরণে লইয়ে কণ্ঠে কৃষ্ণ-
গীতি,
এস হে প্রভু মোহন বেশে লইয়ে সেই ভকতি
প্রীতি ;—
শুনাও আবার সেই মধুনাম, হাহাকার যাক থামি,
পূত করিয়া ধরা, আসুক শান্তি অমরা হইতে
নামি। *

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ।

২৬।

কিরণময়ীর কোন নিষেধ না শুনিয়া অশ্রু বিন্দুবাসিনীকে একটী পত্রে তাঁহার অসুখের কথা জানাইয়াছিল। সেই পত্র পাইয়াই সুরেশ কলিকাতায় চলিয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু পুত্রের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যোন্নতি হয় নাই দেখিয়া এবং কলিকাতায় যাইয়া আবার অসুখে পড়িতে পারে ভাবিয়া বিন্দুবাসিনী সুরেশের প্রস্তাবে মত দেন নাই। তিনি অশ্রুকে উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, কিরণময়ীর অসুখের কিছু বাড়াবাড়ীর লক্ষণ হইলেই সে যেন একটী তার করে এবং তার পাইবামাত্র তিনি কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইবেন। কিরণময়ীর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। ডাক্তারও বলিয়া গেল এবং তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কোন্ দিন হঠাৎ মারা যাইবেন। সেইজন্যই অশ্রুকে

(* পারিজাত সমাজের সাহিত্য শাখার ষষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত।)

টেলিগ্রাম করিতে মানা করিয়াছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর অশ্রু অত্যন্তই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। দুইদিন বিছানা হইতে উঠিতে পারিল না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া কেবল কাঁদিয়াই সময় কাটাইয়া দিল। তৃতীয় দিনের দিন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল বিন্দুবাসিনীকে লিখিত কিরণময়ীর সেই পত্রের কথা—যে পত্রের বিষয়ে তিনি অশ্রুকে মৃত্যুর দিন বলিয়া গিয়াছিলেন। অশ্রু তাড়াতাড়ি সেই পত্রখানি বাক্স হইতে বাহির করিয়া রতনের হাতে দিয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্রটী পাঠাইয়া দিয়া সেই লাল রংয়ের খাতাটীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, যে খাতাটীতে, কিরণময়ী মৃত্যুর দিন বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সমস্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই খাতাটীর কথা মনে হইতেই অশ্রুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু খাতাটী তাহাকে দেখিতেই হইবে, জননীর জীবনী তাহাকে জানিতেই হইবে। সিন্দুক হইতে সেটীকে বাহির করিয়া অশ্রু সিন্দুকটীকে বন্ধ করিয়া দিল এবং খাতাখানিকে হাতে করিয়া নিজের ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। তাহার তখন সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল—একটা কিসের আশঙ্কায়, কিসের ভাবনায়, সে খাতাখানির দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই পারিল না। যাহাই কেন কিরণময়ীর জীবনী হউক না, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অশ্রু ভাবিল—তাহার জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, যদি সেই জীবনী পড়িয়া জননীর উপর তাহার একটা সন্দেহ অবিশ্বাস ক্রোধ আসিয়া পড়ে! মানুষের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। ঐ ইতিহাসটীর প্রত্যেক ছত্রের সহিত অশ্রুর জীবন সম্বন্ধ। ঐ ইতিহাসটী পড়িয়া তাহার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা একদিনে, এক মুহূর্ত্তে ওলোট পালোট হইয়া যাইতে পারে। এতদিন সে যেভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে, যে পথে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে হয়ত সমস্তই তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জননীকে যে চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, যে ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, যেরূপে ভালবাসিয়া আসিয়াছে হয়ত এই জীবনীটী পাঠ করিয়া তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। না, না, তাহাতে কাজ নাই। এতদিন যেমন ইহা গোপনে থাকিয়া আসিয়াছে এখনও তাহাই থাকিবে, চিরকালই তাহাই থাকিবে। এ রহস্য ভেদ করিয়া গুপ্ত জিনিসটীকে প্রকাশ করিয়া জীবনের পট পরিবর্ত্তন করিতে অশ্রুর ইচ্ছা হইল না। কিরণময়ী অশ্রুর জননী, পূজ্য দেবী। অশ্রুর নিকট তিনি সকলের অপেক্ষা

পবিত্র, সুন্দর এবং আপনার। সেই কিরণময়ীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া একটা যুগান্তর আনিতে অশ্রুর প্রবৃত্তি হইল না। খাতাটী পুনরায় না উল্টাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

কিন্তু অশ্রু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল কিরণময়ীর ইতিহাস তাহাকে জানিতেই হইবে। তাহার জননীর শেষ আদেশ, কর্ত্তব্যের কঠিন আজ্ঞা সে কোন মতেই অবজ্ঞা করিতে পারে না। জীবনীটী না পাঠ করিলে তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইতে পারে। এমন একটা কিছু তাহার মধ্যে থাকিতে পারে যাহা অশ্রুর জানা নিতান্ত আবশ্যক, যাহার উপর হয়ত তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা নির্ভর করিতেছে, যাহা জানিতে পারিয়া এখনও সে তাহার জীবনের গতি ফিরাইতে পারে।

কিরণময়ীর শেষ আদেশটীও লঙ্ঘন করা সে যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিল না। প্রয়োজনীয় কিছু না থাকিলে তিনি কখনই অমন করিয়া অশ্রুর হাত ধরিয়া ইতিহাসটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন না। অশ্রু প্রতিজ্ঞা করিল যাহাই কেন সে ইতিহাসটীর ভিতর থাকুক না জননী কে সে আজন্ম যে চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে সেই চক্ষেই দেখিয়া আসিবে! কিরণময়ী তাহার 'মা' এটুকু সে কখনই ভুলিতে পারিবে না।

গতকল্য যেখানে খাতাটী রাখিয়াছিল আজ সন্ধ্যার পর আবার সেটী হাতে তুলিয়া লইল। সর্ব্বাঙ্গ আবার কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু অনেক করিয়া নিজেকে সামলাইয়া, মনকে শক্ত করিয়া অশ্রু খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কিরণময়ীর সেই লাল রঙের খাতাটীকে পড়িতে আরম্ভ করিল।

* * * *

সমস্ত ইতিহাসটী আগাগোড়া পাঠ করিয়া অশ্রু একটী দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিল এবং টেবিলের সম্মুখেই কিরণময়ীর একটী অয়েল পেন্টিং করা ছবি ছিল সেই দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "মা, আরও কিছুদিন আগে যদি আমায় জানাতে।" একদৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু কত কি ভাবিতে লাগিল। কিরণময়ীর করুণ কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অশ্রু কতবার কাঁদিয়াছিল, কতবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত জীবনীটী শেষ করিয়া অশ্রু যখন একবার ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ভাবিয়া লইল তখন সমস্ত চোখের জল শুকাইয়া গিয়া তাহাকে শক্ত করিয়া দিল। কিসের চিন্তার বোঝা তাহার মাথাটীকে নত করিয়া দিল? অশ্রু আর মায়ের দিকে চাহিয়া থাকিতে

না পারিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

রতন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি ভাবচ দিদিমণি ? সন্ধ্যাবেলায় অমন করে শুয়ে আছ কেন ?" ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া অশ্রু বলিল, "[illegible], তুমি [illegible] জানতে ?" অশ্রুর হাতে লাল খাতা খানি দেখিয়া রতন সমস্তই বুঝিতে পারিল, বলিল, "জানতুম্ বৈকী দিদিমণি।" অশ্রু বলিল, "এত দিন আমায় বলনি কেন ?"

উঠিয়া বসিয়া অশ্রু বলিল, "কিন্তু রতনদা, যদি তোমরা আগে আমায় জানাতে তাহ'লে আজ আমি এত ভাবনায় পড়তুম না, এত চিন্তায় আমাকে জর্জ্জরিত হ'তে হ'ত না, আর আমার বোধ হয় মাও তাহ'লে এত শিগ্‌গির মারা যেতেন না। কেন জান ?" রতন বলিল, "সবই জানি দিদি মণি। মানুষ যুক্তি ক'রে, বিবেচনা ক'রে সাব্যস্ত করে একরকম কিন্তু অবস্থার ঘুর্ণীতে পড়ে হ'য়ে যায় আর একরকম।" অশ্রু বলিল, "বুঝতে পাচ্চ রতনদা' এটা আমায় না জানিয়ে তোমরা আমার কতটা দায়িত্ব, কতটা গুরুভার বাড়িয়ে দিয়েছ। মার শোক ভুলে গিয়ে এখন আমি শুধু এই কথাই ভাবচি।" রতন বলিল, "তাও বুঝতে পাচ্চি দিদিমণি।"

সমস্ত রাত্রি অশ্রু ঘুমাইতে পারিল না। চিন্তা করিয়া বিনিদ্র অবস্থাতেই কাটাইয়া দিল। আপাততঃ জননীর শোক ভুলিয়া গিয়া, অশ্রু সুরেশ এবং বিন্দুবাসিনীর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল সুরেশকে ভুলিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই, তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে নির্ম্মূল করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। ইহাতে যদি তাহাকে হৃদয়ের শেষ তন্ত্রীটিকে ছিন্ন করিতে হয়, মনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিষ্ঠুর ভাবে উৎপাটিত করিতে হয়, যদি জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও তাহাকে করিতে হইবে। কিরণময়ীর পাপের জন্যই হউক আর তাহার পিতার পাপের জন্যই হউক কিংবা তাহার নিজের জন্যই হউক প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে। সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে তত্রাচ তাহাকে ফিরিতে হইবে। যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল ঠিক সেইখানেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যে পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে সে পথে চলিলে আর চলিবে না। পথ তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। তাহাকে নিজের অতীত ভুলিতে হইবে, সুরেশকে ভুলিতে হইবে, বিন্দুবাসিনীকে ভুলিতে হইবে, ইন্দুকে ভুলিতে হইবে, সকলকে ভুলিয়া আবার তাহাকে নূতন করিয়া নূতন

ভাবে জীবন আরম্ভ করিতে হইবে। জীবনে অতীত বলিয়া কিছু তাহার থাকিবে না, ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকিবে না, স্মৃতি কিংবা আশা বলিয়াও কিছু থাকিবে না ;—শুধু থাকিবে বর্ত্তমান, থাকিবে কর্ম্ম, আর থাকিবে কর্ত্তব্য।

সুরেশকে ভুলিতে হইবে। তাহার স্মৃতি একেবারে হৃদয়পট হইতে অনুতাপের জলে প্রায়শ্চিত্তের সাহায্যে শাস্তির স্বরূপ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে গেলে অনেক বিপদ আপদ, অনেক বাধা বিঘ্ন তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। যে পথে সে কখন চলে নাই, যে পথে জীবনে কখন চলিতে হইবে বলিয়া আশা করে নাই, কল্পনা করে নাই, সেই পিচ্ছিলময় অজানা অন্ধকার পথে তাহাকে একাই চলিতে হইবে ; পিতামাতার কর্ম্মফল মাথায় লইয়া, কলঙ্কের রাশি শিয়রে তুলিয়া, তাহাকে একাই হাঁটিয়া যাইতে হইবে। পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিলে চলিবে না। শুধু আশে পাশে, শুধু সম্মুখের দিকে চাহিয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। সুরেশকে ভুলিতেই হইবে। যাহা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, কল্পনাও করে নাই, সত্য সত্যই তাহাকে তাহাই করিতে হইবে।

যে সুরেশ প্রথম দিন হইতেই তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে, কৃতজ্ঞতাপাশে এবং ঋণের কঠিন শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, করুণায়, দয়ায় এবং সহানুভূতিতে তাহার সমস্তটাই জয় করিয়া ফেলিয়াছে সেই সুরেশকে ভুলিতে হইবে ;

যে সুরেশকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, যাহাকে বিপদে বন্ধু, আপদে সহায়, সম্পদে সুখ ভাবিয়া হৃদয়ের পবিত্র স্থানে যত্নে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে, যে তাহার চিন্তায় তৃপ্তি, নয়নের দৃষ্টি, দেহের শোণিত, জীবনের লক্ষ্য, হৃদয়ের শান্তি, যে তাহার প্রাণ দান করিয়াছে, মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, পুনর্জীবন সার্থক করিয়াছে, যাহাকে সে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভাবিয়া, তাঁহারই প্রেরিত ভাবিয়া, হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছে প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া, কৃতজ্ঞতার পুষ্পমাল্য দিয়া যাহার চরণ পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই সুরেশকে আজ—এতদিন পরে ভুলিতে হইবে!

না, না, অশ্রু তাহা কখনই পারিবে না। এত ত্যাগ, এত কঠোর কর্ত্তব্য অশ্রুর মত দুর্ব্বল হৃদয় কখনই পালন করিতে পারিবে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অশ্রু দেখিল এতটা তাহার দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। সে সুরেশকে ভুলিতে পারিবে না কিন্তু এমন একটা কিছু

করিতে হইবে যাহাতে সুরেশ অশ্রুকে ভুলিয়া যায়। অশ্রু সমাজচ্যুত হইয়াছে বলিয়া, মনুষ্যবর্জ্জিতা হইয়াছে বলিয়া সুরেশকেও ঐরূপ হইতে হইবে ইহা অশ্রু কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিল না। সুরেশ যদি অশ্রুকে ভুলিয়া না যায়, তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া ফ্যালে তাহা হইলে সমাজে আর তাহার স্থান হইবে না, মানুষের কাছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দ্যাখাইতে পারিবে না। জানিয়া শুনিয়া অশ্রু সুরেশের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কলঙ্কের কালিমায় আবৃত করিয়া দিতে পারিবে না। তাহাদের পবিত্র সংসারে পাপের ডালি মাথায় লইয়া প্রবেশ করিয়া সুখের সংসারকে বিষাদ সাগরে ভাসাইয়া দিতে পারিবে না। সে সুরেশকে ভুলিতে পারুক আর নাই পারুক, সুরেশ যাহাতে তাহাকে ভুলিয়া যায় সেই চেষ্টা অশ্রুকে করিতেই হইবে। সুরেশের স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া, সুরেশের প্রতিমূর্ত্তি, সুরেশের চরণদ্বয় পূজা করিয়া অশ্রু একাই জীবন-পথে যাত্রা করিবে। তাহারই চিন্তা, অশ্রুর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আমরণ বসিয়া থাকিবে। তাহাকে ভাবিয়া হৃদয়ে বল পাইবে। অন্ধকারে দিশেহারা নাবিকের মত পথহারা পথিকের মত যখন সে আকুল নয়নে হৃদয়ের মধ্যে সুরেশের দিকে চাহিবে সুরেশই তাহাকে পথ দ্যাখাইয়া অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া দিবে, পিচ্ছিল এবং দুর্গম পথ তাহারই হাত ধরিয়া পার করিয়া দিবে। অশ্রু সুরেশকে ভুলিতে পারিবে না কিন্তু সুরেশের হৃদয় পট হইতে অশ্রু নিজেকে নিশ্চয়ই সরাইয়া লইবে। এমন ভাবে সরাইয়া লইতে হইবে যে একটী আঁচড় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে না। এখন হইতে অশ্রুকে জাহ্নবীর মত স্ফীত বক্ষে স্ফীত মুখে প্রবাহিত হইলে চলিবে না। ফল্গুর মত শুষ্ক বালুকায় ভরাবদনে অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতে হইবে। যা কিছু স্নেহের ধারা, করুণার প্রস্রবণ, প্রেমের স্রোত কর্ত্তব্যের শুষ্ক এবং কঠিন আবরণে আবৃত করিয়া বক্ষের ভিতরে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। মানুষ যেন তাহা দেখিতে না পায়, সমাজ যেন হাসিবার সুযোগ না পায়, সুরেশ যেন বুঝিতে না পারে। যদি কখন ঢাকিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও হৃদয়ের কোন নিভৃত কোন্ হইতে সুদূর ভবিষ্যতে কোন দিন হৃদয়ের কোন কথা, কোন ধারা, উৎসের আকারে বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে ধারা সুরেশেরই চরণে পড়িয়া তাহারই চরণ ধৌত করিয়া দিবে। যে মানুষ অশ্রুকে ত্যাগ করিয়াছে, যে সমাজ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে

তাহারা কেহই কোন দিন জানিতেও পারিবে না, বুঝিতেও পারিবে না।

সকালে উঠিয়া অশ্রু দেখিল তাহার হৃদয় অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। কিরণময়ীর ইতিহাস খানি পাঠ করিবার পর যে ভাব তাহার হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়াছিল সেটী ধীরে ধীরে আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া গেল। অশ্রু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যতদূর দেখা যায় তাহার সম্মুখে সুপ্রশস্ত সোজা পথ পড়িয়া রহিয়াছে। আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সে পথে অনেকেই যাওয়া আসা করিতেছে বটে কিন্তু কেহ কাহারও সহিত একটীও কথা কহিতেছে না। অশ্রু ভাবিল তাহাকে একাই ইহাদের মত মুখ বুজিয়া এই অজানা পথে হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

সম্মুখে কিরণময়ীর প্রতিমূর্ত্তির কাছে যাইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া অশ্রু বলিয়া উঠিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা যেন নির্ব্বিঘ্নে এই অজানা পথে হেঁটে গিয়ে তোমাদের কাছে পবিত্র ভাবে পৌঁছিতে পারি।

বৈকালে রতন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল,—"দিদিমণি, বাবু আর মা আমায় ছেড়ে যেমন চ'লে গ্যাছেন্‌ তুমিও কি তেমনি চলে যাবে?" অশ্রু রতনের কথা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল,—"কেন রতন দাদা?" রতন বলিল,—"এক'দিনেই তোমার যা চেহারা হয়েছে তুমি ত আর বেশী দিন বাঁচবে না দিদিমণি।" অশ্রু একটু ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল,—"আমার তো এখন মরাই ভাল রতন দাদা। এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই কি শ্রেয় নয়?" রতন বলিল,—"মা বাপের কর্ম্মফল সন্তানকে তো বইতেই হবে দিদিমণি। তুমি যদি এখন স্বেচ্ছায় মারা যাও তাহ'লে তো বাবুর আর মার কখন মুক্তি হবে না। তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত, তাঁদের মুক্তি যে তোমারই উপর নির্ভর কচ্চে। তুমি যে তাঁদের সন্তান দিদিমণি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অশ্রু বলিল,— "রতন-দা আমায় কখন তুমি ছেড়ে যাবে না?" রতন বলিল,—"মৃত্যুর ওপর তো কারুর হাত নেই। তার আগে তোমায় কখন ছাড়ব না। তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব? বাবু মরবার সময় মাকে আমার কাছে দিয়ে গিছ্‌লেন। তিনি বলেছিলেন,—'রতন, তোমার মাকে দেখ। তুমি ছাড়া ওর আর কেউ রহিল না।' আর মা মরবার সময় তোমাকে আমারই হাতে দিয়ে গ্যাছেন দিদিমণি।"

সজল নয়নে অশ্রু বলিয়া উঠিল,—"চল রতন-দা' আমরা কোথাও চলে যাই। এখানে আর আমার থাক্‌তে ভাল লাগচে না।" রতন বলিল,—"কোথায় যাবে দিদিমণি? আমাদের তো কোথাও কেউ নেই।" কিন্তু কয়েক দিন হইতে রতন ঠিক ঐ কথাই ভাবিতেছিল এবং সংসারের একটা মোটামুটী বিলি ব্যবস্থা করিয়াও ফেলিয়াছিল।

অশ্রু বলিল,—"এত বড় পৃথিবীতে আমাদের দুজনকার স্থান হবে না রতন-দা? আবার কিছুদিন পরে এখানে না হয় ফিরে আসব।" রতন বলিল,—"ফিরে তো আসতেই হবে দিদিমণি। বাড়ী ঘর ছেড়ে কোথায় যাবে? এই বাড়ীই বাবুর আর মার প্রাণ ছিল।" অশ্রু বলিল,—"সেই জন্যেই তো বল্‌চি রতন-দা আবার আমরা ফিরে আসব। কিন্তু আপাততঃ কিছু দিনের জন্যে কোথাও না গেলে আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি না।" রতন বলিল,—"মাঠাকরুণ আর ডাক্তার বাবু ফিরে আসুন। তাঁদের না বলে তো যাওয়া হ'তে পারে না দিদিমণি।" তাঁহাদের নাম শুনিয়া অশ্রু একটু চমকিয়া উঠিল এবং সমস্ত জল যেন চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইবার মত হইল। বলিয়া, উঠিল,—"না না রতন-দা, তাঁদের আসবার আগেই আমাদের চলে যেতে হবে। তাঁরা এসে পড়লে তো আমাদের যেতে দেবেন না।"

সেই জন্যই তো অশ্রুর যাওয়া। তাঁহাদের সহিত আর দ্যাখা না করাই তো তাহার উদ্দেশ্য। তাঁহাদের সহিত দ্যাখা হইলেই অশ্রুর হৃদয়ের সমস্ত বাঁধ, সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইবে। তাঁহাদের সহিত দ্যাখা না করিয়াই অশ্রুকে নিষ্ঠুরের মত চলিয়া যাইতে হইবে।

* * * *

অশ্রুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ বলিল,—"তারা কেউ এখানে নেই মা। পাশের বাড়ীর লোকেরা বল্লে দুদিন হ'ল তারা কোথায় চলে গ্যাছে।" অশ্রুকে এবং রতনকে লইয়া আসিবার জন্য তিনি সুরেশকে পাঠাইয়া দিয়া বারবাড়ীর দালানে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাল রেতেই হঠাৎ তাঁহার খুব জ্বর আসার দরুণ তিনি নিজে যাইতে পারেন নাই। সুরেশের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি! ঠিক ক'রে পাশের বাড়ীর লোকদের জিগ্যেস্ করেছিলি তো? বাড়ীতে তালা বন্ধ আছে ঠিক দেখেছিলি?" সুরেশ বলিল,—"হ্যাঁ মা, সত্যিই তারা কেউ এখানে নেই। কোথায় গ্যাছে, কবে আসবে, তাও কাউকে বলে যায়নি

নি।" বিন্দুবাসিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"চল দিকি আমি একবার দেখে আসি। আমাদের না বলে কোথায় তারা যাবে?"

সুরেশের কোন নিষেধ না শুনিয়া অন্য গায়েতেই তিনি অশ্রুর বাটী যাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শয্যায় শুইয়া বিন্দুবাসিনী কেবল মাত্র একবার বলিলেন,—"সুরো!" জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সুরেশ বলিল,—"কেন মা?"

উভয়ের মধ্যে কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। উভয়েরই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে প্রতিলোম বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার।

(শ্রীললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ)

অসবর্ণ বিবাহ প্রধানতঃ দুই প্রকার:—অনুলোম ও প্রতিলোম। ইতঃপূর্ব্বে আমরা অনুলোম বিবাহ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।* অদ্য আমরা প্রতিলোম বিবাহ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত ছিল। এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে উচ্চ বর্ণের স্ত্রী ও নীচ বর্ণের পুরুষের যে বিবাহ হইত, আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ উহাকেই প্রতিলোম বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিতেন। যখন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রথম প্রচলিত হয়, তখন অসবর্ণ নারীর গর্ভজাত সন্তানগণ (অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে জাত) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। তাই মহর্ষি বিষ্ণু বলিতেছেন,—

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাত স এব সঃ।

২-২৯।

এই যুগে যেমন অনুলোমজগণের পৃথক সংজ্ঞা হয় নাই; তদ্রূপ প্রতিলোমজগণেরও কোন পৃথক সংজ্ঞা পরিকল্পিত হয় নাই; ক্রমশঃ পরবর্ত্তী যুগে সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনুলোমজগণের ন্যায় প্রতিলোমজগণও

* নব্যভারত—১৩২৭ ফাল্গুন।

"অপসদ" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নীচ বলিয়া কথিত হয়েন এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে থাকেন। তথাহি মনুসংহিতায়াং:—

"বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেহপরেপ্যপসদা স্ত্রয়ঃ॥
১৭—১০ অধ্যায়।

আযোগবশ্চক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমোনৃনাম্।
প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপ সদাস্ত্রয়॥
১৬—১০ মনুসংহিতা।

বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমেজাত "মাগধ" (ভাট) "বৈদেহ" এবং ক্ষত্রিয় হইতে প্রতিলোম ক্রমে জাত "সূতা" এই তিন জন এবং শূদ্র হইতে প্রতিলোমজক্রমে জাত "আযোগব" "ক্ষত্তা" ও "চাণ্ডাল" এই তিন জন অর্থাৎ মোট ছয় জন "অপসদ" সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। আর্য্য শাস্ত্রানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে এই বিলোমজগণ দ্বিধা বিভক্ত—প্রথম দল আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত, দ্বিতীয় দল অনার্য্য অর্থাৎ বিজিত দাস জাতি (শূদ্র) হইতে আর্য্যাতে জাত। প্রথমতঃ যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রতিলোমজ অর্থাৎ আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত উহাদিগের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া নিকৃষ্ট প্রতিলোমজগণের (যাঁহারা শূদ্র ও আর্য্যায় জাত) বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রতিলোম বিবাহ জাত সূত; মাগধ (ভাট) ও বৈদেহগণ "অপসদ" সংজ্ঞায়? বিষয়ীভূত হইলেও উহারা আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত বলিয়া উপনয়নাদি সর্ব্ব সংস্কারে অধিকারবান্ ছিলেন। কারণ মহাত্মা মনু বা ভৃগু বলিতেছেন:—

* তথা আর্য্যাৎ জাত আর্য্যানাং সর্ব্বং
সংস্কার মর্হতি।" ৬৯।১০ অধ্যায়।

আর এই সকল প্রতিলোমজগণ যে দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেন তাহা মহর্ষি উসনার—
"নৃপাৎ ব্রাহ্মণ কন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াঃ।"
জাত সূতঽত্র নির্দ্দিষ্ট প্রতিলোমজ বিধি দ্বিজঃ॥২-১

এই উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীত হয়। প্রাচীন সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও এই উক্তির সারবত্তা সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হয়। রোমহর্ষণ প্রভৃতি সূতগণ (ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়জাত) ঋষিগণকে মহাভারত ও পুরাণাদি শ্রবণ করাইতেন। ক্ষত্রিয় যযাতির

* অবশ্য কল্লুকাদি এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু মূলে যখন— "আর্য্যাৎ আর্য্যায়াং জাতসর্ব্বং সংস্কারং অর্হতি" রহিয়াছে এবং অনুলোম কি প্রতিলোম কিছুরই উল্লেখ নাই তখন উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করা ঘোরতর অবিচার মাত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কি প্রকৃত আর্য্য নহেন?

ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানির গর্ভে যদু ও তুর্ব্বশু জন্মগ্রহণ করেন। * এই যদুবংশ প্রসূত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সুতগণ তদানিন্তন সমাজে ক্ষত্রিয়বৎ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, কালে যখন প্রতিলোম জাতি গুলি জন্মগত হইয়া দাঁড়াইল, মূলবর্ণ চতুষ্টয়ের ও অনুলোমজাতি গুলির যেরূপ বৃত্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, ঐরূপ এই বিলোমজগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। এই বৃত্তি গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে সুত, মগধ ও বৈদেহগণ কেহই নীচ বৃত্তি অবলম্বী ছিলেন না † তবে পরবর্ত্তী যুগে ইহাদিগের দ্বিজোচিত গুণের অভাববশতঃ ও বৃত্তিগত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিলে পর ইহারা "অপধ্বংসজ" বা "বর্ণ সঙ্কর" আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েন এবং শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়েন। তাই যে মনুসংহিতায় যথা—"আর্য্যা জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারং অর্হতি" লিখিত রহিয়াছে সেই মনুসংহিতায় সূত, মগধ ও বৈদেহগণ ও নিকৃষ্ট প্রতিলোমজ অর্থাৎ আয়োগব ক্ষত্তা ও চাণ্ডালগণের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। তথাহি মনুসংহিতায়াং—

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সুতোভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ রাজ বিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥"

১১—১০অ।

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ॥"

১২-১০ অ।

"শূদ্রানাস্তু স্বধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেহ সধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।"

৪১—১০ অ।

"যে দ্বিজা নামপসদা, যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।

৪৬—১০ অ।

তাবুভাপ্য সংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ॥

৬৮—১০ অ।

শাস্ত্রানুসারে প্রতিলোম বিবাহ জাত সন্তানগণের মধ্যে যেখানে অনার্য্য রক্তের সংস্রব ঘটে নাই তাঁহারা জন্মগত "বর্ণসঙ্কর" পদবাচ্য হইতে পারেন না। এ কারণ আমাদিগের মনে হয় যে, পরবর্ত্তী যুগে কোন রক্ষণশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক মনুসংহিতায় দশম অধ্যায়ের ১১, ৪১, ৪৬, এবং ৬৮ শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কারণ একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ে এরূপ বিভিন্ন মতের

---

* যদুঞ্চ তুর্ব্বশুঞ্চৈব দেবযানি ব্যজায়ত :—"বায়ুপুরাণ।

† "সুতানামশ্বসারথ্যং * * * * * ।
অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। বৈদেহকানাং স্ত্রী কার্য্যং মাগধানাং বণিকপথঃ।

৪৭-১০ মনু।

স্তুতিক্রিয়া মাগধানাং স্ত্রীরক্ষাতজ্জীবনং বৈদেহকানাম্ অশ্বসারথ্যং সুতানাং।" বিষ্ণুসংহিতা।

সমাবেশ থাকা সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্কর কে? *

জগদাত্মা গীতা বলিতেছেন :—

"স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"

ভগবান মনুও বলিয়াছেন :—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানাম বেদ্যাবেদনেন চ।

স্বকর্ম্ম ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।

২৬-১০-অ।

বর্ণের মধ্যে যদি ব্যভিচার সন্তান হয় তবে সে সন্তান বর্ণসঙ্কর, আর যদি কেহ অবেদ্যা বেদন অর্থাৎ অবিবাহ্যাকে বিবাহ করে সেও বর্ণসঙ্কর হইবে আর যদি কেহ স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করে তবে সেই স্বকর্ম্মত্যাগীও ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্য ভজনা করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজে বর্ণসঙ্কর কে তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা পাইব। মনে করুন যদি ব্রাহ্মণ শ্রীহরিপদশর্ম্মা অন্য ব্রাহ্মণ পত্নী শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীর গর্ভে গান্ধর্ব্বাদির দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া সন্তান উৎপাদন করেন * তবে সেই সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে কেন না সে ব্যভিচার জাত।

অবেদ্যা বেদন জনিত বর্ণসঙ্কর। অবেদ্যা বেদন দুই প্রকার (১) সপিণ্ডজ বা স্বগোত্রজ বিবাহ। যদি কেহ সহোদরা, খুড়তুত, জ্যেঠতুত পিসতুত মামাত † বা মাসতুত ভগ্নিকে বিবাহ করে ও তাহাতে পুত্র জন্মায় তবে সেই সন্তান "বর্ণসঙ্কর" পদবাচ্য হইবে। কেন না ইহা স্বগোত্রা বা সপিণ্ডা বিবাহ। তবে যদি ব্রাহ্মণ (মুখ্য ও গৌণ) ব্যতিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সপিণ্ডা ব্যতীত স্বগোত্রা বিবাহ করেন এবং উহাতে সন্তান জন্মায় তাহা হইলে উহাতে কোন সাঙ্কর্য্যস্পর্শ হইতে পারে না। কারণ ব্রাহ্মণগণ যে ঋষির সন্তান তাঁহারা সেই সেই গোত্র ভাক্ উক্তাক্ষ।

* বিভিন্ন বিভিন্ন দুই বর্ণের বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হয় উহারাই সাধারণতঃ বর্ণসঙ্কর (mixed class) বলিয়া বর্ত্তমান সমাজে অভিহিত কিন্তু "বর্ণসঙ্কর" শব্দের প্রকৃতার্থ উহা নহে—বর্ণেষু-সঙ্কর (অবকর সঙ্করোৎকর স্মৃত—অমর) ইব বর্ণসঙ্কর যাঁহারা সমাজে সম্মার্জ্জনী নিক্ষিপ্ত ন্যাদির ন্যায় হীন তাঁহারাই বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য

* "হরেৎ যত্র নিযুক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরসঃ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্ম্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ।
১৫৫-৯ মনু।

† ভারত ভুবা অর্জ্জুন সপিণ্ডবিচার না করিয়া মাতুল কন্যা সুভদ্রার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও মাদ্রাসী ব্রাহ্মণগণ মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মহাত্মা মনুর "অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ" ৫—৩ স। এই বাক্য সত্য হয় তাহা হইলে এই বিবাহ জাত সন্তানগণ কি "বর্ণসঙ্কর" নহেন?

"গোত্রং বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং
ব্রাহ্মণরূপম্ ।"

পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের গোত্র স্ব স্ব পুরোহিত হইতে সমাগত। তদুক্তংশ্রুতৌঃ—

"পৌরহিত্যাৎ রাজন্য বিশাং প্রবৃনীতে।"

অগ্নিপুরাণও বলিয়াছেন—

"ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং।
তথান্য বর্ণ সঙ্করানাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ।"

দ্বিতীয়—আবেদ্যা বেদন। শাস্ত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে, যে শূদ্রের শূদ্রাই ভার্য্যা অন্য বর্ণ নহেন। অনার্য্য দ্বারা আর্য্য শোনিত কলুষিত হইতেছে দেখিয়া প্রাচীন সামাজিকগণ অনার্য্য ও আর্য্যায় বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এই প্রতিলোম বিবাহ সমাজে অবেদ্যা বেদন বলিয়া প্রখ্যাপিত হয় এবং এই বিবাহ উৎপন্ন সন্তানগণ "বর্ণসঙ্কর"—নামের বিষয়ীভূত হন।

স্বকর্ম্মত্যাগজনিত বর্ণশঙ্কর। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে মূলবর্ণ চতুষ্টয়ের এবং অনুলোমজ ও বিলোমজগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যদি কেহ সেই বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপর বৃত্তি গ্রহণ করে সেও ক্রিয়াগত বর্ণ-সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এতদ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে প্রতিলোমজগণ কেহই ব্যভিচার জনিত বর্ণসঙ্কর নহেন। মহর্ষি দেবলের "বিবাহ বিধিনা প্রাপ্তা ন সাঙ্কর্য্যং ভবেৎ কচিৎ" এই বিধি অনুসারে সুত মাগধ (ভাট) ও বৈদেহগণের জন্মগত সাঙ্কর্য্য থাকিতে পারেনা। এক্ষণে আমরা নিকৃষ্ট প্রতিলোম বিবাহ বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শূদ্র ও আর্য্যায় যে বিবাহ উহাই নিকৃষ্ট প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বাদৌ শূদ্র হইতে প্রতিলোম বিবাহ জাত সন্তানগণ "অপসদ" সংজ্ঞার—বিষয়ীভূত হইলে পরবর্ত্তী যুগে অনার্য্য রক্ত দ্বারা আর্য্য শোনিত কলুশিত হইতেছে দেখিয়া সমাজ-তত্ত্ব-বাদিগণ অনার্য্য ও আর্য্যের বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাই বর্ত্তমান ভৃগুক্ত মনুসংহিতায় লিখিত রহিয়াছে "শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য" এবং শূদ্রস্তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধিয়তে।" মহর্ষি মনু বা ভৃগুর এই বিধান অনুসারে শূদ্রের ঔরসে আর্য্য কন্যার গর্ভজাত অযোগর ক্ষত্তা ও চাণ্ডালগণ আবেদ্যা বেদনজ বলিয়া বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য এবং সমাজে হীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন * এবং বর্ত্তমান সময়েও

* মহাত্মা মনুর—"স্বকর্ম্মত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" যদি এই বাক্য সত্য হয় তবে বর্ত্তমান সময়ে ভারতের—প্রায় আদ্য হিন্দুজাতির পতন ঘটিয়াছে বলিতে হইবে নাকি?

উঁহারা হীন অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন। যাহা হউক এতাবৎ আমরা দেখিলাম যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রতিলোমজগণ কেহই মূলতঃ ব্যভিচারজনিত বর্ণসঙ্কর নহেন।

তবে অযোগব ক্ষত্তা ও চাণ্ডালগণের পিতা অনার্য্য বলিয়া সঙ্কীর্ণ পদবাচ্য। কালের পরিবর্ত্তনে ও নানা সামাজিক বিপ্লবে উৎকৃষ্ট প্রতিলোম বিবাহ জাত সন্তান সূত, মাগধ ও বৈদেহগণ স্বকর্ম্মত্যাগ জনিত বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত-হেতু শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়েন; তেমনি প্রতিলোম বিবাহটী ও কালে, সমাজে * ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল বলিয়া অনুমান হয়। † অধমবর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না এরূপ শাস্ত্র বাক্য ও দেখিতে পাওয়া যায়। ‡

বৃথা অভিজাত্য গৌরবে স্ফীতবক্ষ আমরা কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রতিলোম বিবাহ উৎপন্ন জাতি গুলিকে এতাবৎ নানা প্রকারে নিপীড়িত ও পদবিদলিত করিয়া আসিতেছি। জন্মগত কিঞ্চিৎ হীনতা নিবন্ধন যদি উঁহারা সঙ্কীর্ণ ও হেয় হন তাহা হইলে আমরা ব্যাস বশিষ্ঠ (বেশ্যা পুত্রো বশিষ্ঠ) সত্যকাম, জাবাল ও পরশুরাম প্রভৃতি এবং সীতা, শকুন্তলা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু প্রভৃতির জন্মের কথা ভাবিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? এবং এ হিসাবে বর্ত্তমান ভারতের—বার আনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিগুলি সংকীর্ণ ও হেয় হইয়া দাঁড়ায় না কি? বৃথা অভিজাত্যে আমরা এরূপ মত্ত হইয়াছি যে নিজেদের কথা একবার না ভাবিয়া অপরকে ঘৃণা করি। যে হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" সেই হিন্দু সন্তান আমরা সমাজের তথা কথিত নীচ জাতিগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি ও অশেষ অকল্যাণের সৃষ্টি করিতেছি!! ঘৃণা করিবার জন্য কি ভগবান আমাদিগকে কোন সনদ দিয়াছেন? তথাকথিত নীচ জাতিগুলি কি সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে না? আমাদের দেহগুলি যে উপাদানে গঠিত উঁহাদের দেহও কি সেই

এবং শাস্ত্রানুসারে উঁহারা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাও স্বীকার্য্য।

* ব্যাস দেবের "নাধমঃ পূর্ব্ব বর্ণজাত" এবং মনু সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকে ইহার সাক্ষ্যতায় এগুলি যে পরবর্ত্তী যুগের রচনা তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

† ব্রহ্মাবতরণং অযোগবানাং বাধ্যতা পুক্কসানাং (মনুর ক্ষত্তা) বাধ্যসভিস্থ চাণ্ডালানাং বিষ্ণুসংহিতা।

‡ "শূদ্রানাং তু স্বধর্ম্মাণঃ সার্ব্বেহপধ্বংসজাস্মৃতা।"

৪১-১০ মনু।

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীন শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা।" শুদ্ধিতত্ত্ব

উপাদানে বিরচিত—নহে? ভূমা ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের রাজ্যে জন্মগত উচ্চ ও নীচ বলিয়া কি কোন প্রভেদ আছে? যদি না থাকে তাহা হইলে প্রতিলোম ও অন্যান্য * অন্ত্যজজাতিগুলি যাঁহারা বর্ত্তমান সময় শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া বিশাল হিন্দু সমাজের উন্নতি কল্পে সামাজিক অধিকার লাভে সচেষ্ট হইতেছেন ভারতের কল্যাণার্থে তাঁহাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া উদারতা প্রকাশ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

গো-রক্ষা বা হিন্দু দর্শন।

(শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য)

অদ্যাপি ধূমায়মান য়ুরোপীয় মহাসমরানলের অগ্ন্যাধান বহ্নিসমিন্ধন প্রভৃতি ব্যাপারে অতি স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইয়াছে যে বুদ্ধি প্রাখর্য্য পাশবশক্তিপ্রাচুর্য্য প্রভৃতির কোনটীই কামাফলদায়ী নহে। দৈবই সর্ব্বত্র কার্য্যকর, সর্ব্বত্রই প্রধান। ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন "দৈব ঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্"—দৈবই কর্ম্মের পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তর কারণ। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব" ভগবানের এই অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করিলে কাহার না বোধ হয় যে প্রতিকার্য্যেই দৈব সর্ব্ব প্রধান এবং তাহার গতি অপ্রতিরোধনীয়? বহুদিন হইতে আর্য্যসন্তানগণ এই দৈবকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আজ তাঁহাদের অবনতি। সমাগত সঙ্কটে মূঢ়ের মত প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া, উদ্ধারের উপায় না খুঁজিয়া, "হাহুর্দ্দৈব" বলিয়া চীৎকার করিলে এবং অল্পেই অভিভূত জড়ের মত হইয়া ঘোরঘূর্ণি মধ্যে নিমগ্ন হইলেই যে দৈবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহা নহে। দেবতায় দৃঢ়-বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহাকেই বিপৎ পরিত্রাণের অপ্রতিরোধনীয় প্রধান কারণ জানিয়া, ভক্তি বিনম্রহৃদয়ে আরাধনায় তৃপ্ত করিয়া তাঁহার দিব্যাশীষ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বীরের ন্যায় বিপদের সম্মুখীন হইলেই দৈবের প্রতি প্রকৃত ভক্তির পরিচয় দেওয়া হয়। ভারতের সে ভক্তিস্রোতঃ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চির দৈববাদী আর্য্যগণের দৈবে প্রকৃত আস্থা বিলুপ্ত হইয়াছে!

* অন্ত্যজগণের মধ্যে অনেকে দ্বিজাতিঃ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, ইহা আমরা পরে দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

তাহারই ফলে আর্য্যগণ আজ বিশ্বাসের বল হারাইয়া অবিশ্বাসের দুর্ব্বলতামাত্রই আশ্রয় করিয়াছেন, আর ক্রমাগতই অধোদিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই অধঃপতন হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে কে? শাস্ত্র ও ধর্ম্ম। অস্ত্র শস্ত্রে যাহা হইতে পারে অন্ধকার পাশ্চাত্য জগৎ তাহা রণভেরীর ভীষণ নিনাদে ঘোষণা করিতেছে—ধ্বংস! ধ্বংস! ধ্বংস! বৈদেশিক অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র কেবল ধ্বংস ও অন্নকষ্টই আনয়ন করিয়াছে। ভারতের আর্য্যগণও সেই বৈদেশিক শাস্ত্রের অণুবর্ত্তী হইয়া আজ ঘোর অন্নসমস্যায় পতিত হইয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছেন। প্রতীচ্যের শাস্ত্র হইতে আসুরী সম্পৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে সম্পৎ ধ্বংসেরই অগ্রদূতী। তাহাতে সুখ নাই শান্তি নাই; আছে মাত্র স্বধর্ম্ম ও নিজ শাস্ত্র পরিত্যাগ হেতু বিপত্তি ও দুর্গতি। ভগবান আপনমুখেই বলিয়াছেন "যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ, ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্"—যিনি শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়েন তাঁহার কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ হয় না। সুখ তাঁহার নাই, উত্তমগতি ও তাঁহার নাই অর্থাৎ দুর্গতিই তাহার প্রাপ্য। "জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি" শাস্ত্রবিধি অবগত হইয়া তদুক্ত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য"।—আপন আপন শাস্ত্রোক্ত আপন আপন কর্ম্মদ্বারা দৈবকে পরিতৃপ্ত করাই বিধেয়। প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের নীতি প্রতীচ্যের ধর্ম্ম অধিকতর দুঃখ দুর্গতিরই কারণ হইয়াছে। "স্বধর্ম্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" অন্নের দায়ে দিনে দিনে শীর্ণ দেহ ক্লিষ্টহৃদয় ভারতবাসী আজ ভগবৎ প্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া নিজশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ভারতের দৈব, ভগবানের চির-প্রিয় আর্য্যজাতির দৈবে আস্থাহীন হইয়া আজ অতলে নিমগ্ন হইতে চলিয়াছে। তাঁহার শাস্ত্র কিন্তু বলিতেছে "অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ ভবতিপর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম-সমুদ্ভবঃ"॥ অন্ন হইতে ভূত (শরীর) সমূহ সঞ্জাতঃ; মেঘ হইতে সেই অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞ হইতে মেঘের উৎপত্তি, এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত। বৈধদৈব কর্ম্মসমূহ দ্বারা অন্ন লাভ যে অবশ্যই হয় গীতাই তাহা বলিয়া দিতেছেন। "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।" অনেন অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা। যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে তৃপ্ত কর, তাঁহারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যে অন্ন সমস্যার মীমাংসা নাই, আমাদের

সনাতন শাস্ত্রে তাহার কেমন সহজসাধ্য উপায় প্রদর্শিত আছে। যজ্ঞ কর অন্ন, ধনরত্ন, সমস্তই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে করা যায়? হে বিচক্ষণগণ। আপনারা বিশেষরূপেই অবগত আছেন যে, যজ্ঞ আজকাল এক প্রকার অসম্ভব। নানাপ্রকারে ভারতের ভিতরে বাহিরে ভারতের গো-সমূহের বিনাশই যজ্ঞলোপের প্রধান কারণ। পুণ্য ভারতভূমি ন্যূনাধিক অষ্টাদশকোটী গো-রত্নের অধিকারিণী। বৎসর বৎসর তাহার প্রায় এক কোটী শমনের করালকবলে নিপতিত হয়। এক কলিকাতাতেই প্রতিদিন তিন শত গো রত্নের তিরোধান হয়। জন্মাদি বিবিধ উপায়ে কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হইলেও প্রতি বৎসরেই গো সংখ্যা বিশেষরূপে হ্রাস পাইতেছে। এরূপ কত বৎসর হইতেছে এবং ইহারও পূর্ব্বে কত কোটী কোটী বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে যজ্ঞ লোপের কারণ বুঝিতে বোধহয় কাহারও অধিক বিলম্ব হইবে না। দৈবও এই লোপের সর্ব্বোত্তর কারণ বটে। তথাপি গো-হত্যা নিবারণে ঔদাসীন্যই দৈবকে আমাদের প্রতিকূল করিয়াছে। ইংরাজী ভাষাতেও বলে আপনাদের দুর্গতি দূর করিতে যাহারা নিজেই যত্নবান্ হয় দৈবও তাহাদের সহায়তা করে। সুতরাং যত্ন করিয়া প্রতিকূল দৈবকে অনুকূল করিতে হইবে। নচেৎ অন্য উপায় নাই। গো-হত্যা নিবারণ করিতেই হইবে। যেরূপেই হউক, গো-রক্ষা করিয়া আবার যজ্ঞের প্রবর্ত্তন দ্বারা দেবের তৃপ্তি-সাধন করিলে ভারতের দুর্গতির অবসান হইবে। হে ভারত-জননীর সন্তানগণ। হে মহালক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রগণ! "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উদারহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান-গণও আজ আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। গো-হত্যা নিবারণকল্পে তাঁহাদিগের সহানুভূতি দৈবপ্রদত্ত বরস্বরূপ। সেই বর সাদরে শিরে ধারণ করিয়া গো রক্ষায় বদ্ধপরিকর হউন। গো-রক্ষায়, গো-সেবায় গোগ্রাসদানে আপনাদের সমস্ত বৈধ দৈব কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সুসাধিত হইবে। গো-মাতার শরীর সর্ব্ব দেবদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। উপনিষদাদি বলেন—এইটীই তাঁহার সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর। গো শব্দের একটী অর্থ 'গির্' অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম বা তৎস্বরূপ প্রণব; অথবা বেদবাক্য বা ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষৎ, বা তৎপ্রতি-পাদ্য প্রণব বা অক্ষর। গো-মাতার এক মূর্ত্তি এই প্রণব বা অক্ষর। এই জন্যই গীতার বন্দনায় উপনিষৎকে গো মাতার স্বরূপ বলা হইয়াছে

কেবল দোহনের উপমা নির্ব্বাহের জন্ত নহে। গো শব্দের আর একটী অর্থ 'ইন্দ্রিয়'। (প্রণব বা) চৈতন্য ও ইন্দ্রিয় এই উভয় সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরকে আশ্রয় করিয়াই কার্য্য করে। পৃথিবীই গো-মাতার এই স্থূল শরীর। সেই হেতু গো শব্দের আর একটী অর্থ পৃথিবী। অতএব গো-মাতার সেবায় আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলই সাধিত হয়। যজুর্ব্বেদ বলেন,—গো-মাতার মহিমা অবর্ণনীয়—"গোস্তু মাত্রা ন বিদ্যতে" গো-মাতার তুলনা নাই। সামবেদ বলেন,—"অমৃতস্য নাভিঃ"—গো-মাতা অমৃতের খনি। ভগবান্ বাদরায়ণি মহাভারতে ধৌম্য উপমন্যু সংবাদে বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, গো-মাতার পূজায় চিত্তশুদ্ধি হয় ও ভগবদ্ ভজনে অধিকার জন্মে। এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। বিষ্ণু সংহিতা বলেন—"গবাং হি ধর্ম্ম স্তাসাং সততং প্রণামং কুর্য্যাৎ।" গো-মাতাতে ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছেন। অতএব সতত তাঁহাকে প্রণাম করিবে। কলির প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর-সংহিতা বলেন,—"স্পৃষ্টাশ্চৈবাবঃ শময়ন্তি পাপং, সংসেবিতাশ্চোপনয়ন্তি বিত্তম্। তা এব দত্তাস্ত্রিদিবং নয়ন্তি, গোভির্নতুল্যং ধনমস্তিকিঞ্চিৎ"। স্পর্শ করিলে গো-মাতা পাপ বিনাশ করেন; সম্যক্ সেবা করিলে সম্পৎ আনয়ন করেন; দানে স্বর্গে লইয়া যান; গো-মাতার তুল্য ধন আর নাই। বিরাটের গো-ধনের কথা সকলেই বিদিত আছেন। যেখানেই গো-ধন সেইখানেই বিরাট্। গো-মাতা যে অমূল্যধন তাহা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে লিখিত আছে,—গো-মাতা সর্ব্বরোগেরই ঔষধালয়। এমন কোন ব্যাধিই নাই যাহা গো-মাতার পূজায় ও পঞ্চগব্যের যথাবিধি ব্যবহারে বিদূরিত না হয়। গো-মাতার ধ্যানে দেখি—তিনি ভক্তের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। মহারাজ দিলীপের গো-সেবা করিয়া রঘুর ন্যায় অভীপ্সিত পুত্র লাভই তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। গোগ্রাস মন্ত্রে দেখি—গো মাতা সর্ব্বলোক হিত-কারিণী। গোগ্রাস দানের ফলে দেখি গো-মাতার পূজায় ও গোগ্রাসদানে আর্য্য-জাতির শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্ম্মই সুসমাহিত হয়। যিনি গোগ্রাস প্রদান করেন, অত্রি-সংহিতা বলেন, তাহার তিন অগ্নিতে হোম, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ ও সমস্ত দেব-পূজার যাবৎ অঙ্গ-বৈগুণ্য তিরোহিত হইয়া সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া যায়। যে গৃহে একটীও গাভী নাই সে গৃহে চির অমঙ্গল চির অন্ধকার ও সে গৃহ প্রেতভূমি। এবম্বিধা সর্ব্বদেবময়ী গো-জননীর রক্ষণ, পালন ও

পূজার্চ্চনায় আমাদিগের চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? অপিচ গো-পালনের আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। করুণাময় শ্রীহরি সুদামাদিকে সঙ্গে লইয়া গোচারণ কালে এই আনন্দই তাঁহাদিগকে উপভোগ করাইতেন। তাঁহারা বিভোর হইয়া থাকিতেন, বুঝিতেন না—কিসের আস্বাদে বিভোর হইতেছেন। গো-পালন বশতঃই নন্দ যশোদাদি গোপ গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। যেখানেই গো ধন সেইখানেই বিরাট। যেখানেই গো-পালন পূর্ণব্রহ্মও সেইখানেই। তিনি যে গোপাল নন্দন। গো-পালনের আনন্দ যিনি উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই গোপাল নন্দনকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পান। যতদিন না আমরা এই আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিতেছি ততদিন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার অধিকারী হইব না। ততদিন কংস-কেশি বিনাশন শ্রীমধুসূদনের কৃপারও অধিকারী হইব না। অতএব হে সনাতন আর্য্য-বংশধরগণ! হে ভারতমাতার সুসন্তানগণ! ধন প্রাণ পণ করিয়া গো-রক্ষায় যত্নবান্ হউন, কায়মনে গো-মাতার পূজায় রত হউন। সংঘবদ্ধ হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া, উৎসাহীদিগকে উপযুক্ত অর্থাদি সাহায্য করিয়া আপন আপন গৃহেও যথাশক্তি গোসেবার সুব্যবস্থা করিয়া গোরক্ষায় আত্মনিয়োগ করুন। এক গোরক্ষায় গোব্রাহ্মণ উভয়ই রক্ষা পাইবে। আর্য্যের সনাতন ধর্ম্ম সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। রক্ষার অভাবে গোকুল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণ অধোগত, বর্ণাশ্রম বিপর্য্যস্ত, আর্য্যজাতিও সমুৎসন্ন। ভারতভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। ভারত সন্তান ভারতকে রক্ষা করুন। এক গোরক্ষাতেই ভারত রক্ষা পাইবে। মাত্র ভারত কেন? সমগ্র জগৎ রক্ষা পাইবে। ব্রাহ্মণের উদ্ধার হইবে, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের উদ্ধার হইবে, অধঃপতিত আর্য্যজাতিও সমুন্নত হইবে। দেখিবেন আবার স্বরত্রয়সংবলিত বেদমন্ত্রের সুমধুর মঙ্গল নিঃস্বনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইবে। পবিত্র যজ্ঞ-ধূমের নির্ম্মল সৌগন্ধে আধিব্যাধি মহামারী সুদূর দিগন্তে পলায়ন করিবে, যথাকালবর্ষণে দুর্ভিক্ষাদি তিরোহিত হইবে। সর্ব্বোপরি গোব্রাহ্মণ হিতে রত জগদ্ধিতের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ সর্ব্ব মঙ্গলময় শ্রীনারায়ণের পরম প্রীতি সংসাধিত হইবে। আর তাঁহার করুণায় সূর্য্যের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল কিরণে সমগ্রজগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ৺কাশীধামে ও ৺জগন্নাথধামে

গোবর্দ্ধন মঠে যথাশাস্ত্র গোরক্ষা ও গোপূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্রই এই মহাপুণ্যকর্ম্মের প্রচার হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্নপূর্ণা।

("গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত)

একটা আকাশ কাঁপান হাসি প্রাণটাকে ছু'চির ক'রে বেরিয়ে পড়ে—যখন মনে প'ড়ে যায় মায়ের আমার আর একটী নাম অন্নপূর্ণা! মা আমার অন্নপূর্ণা! আমি অন্নহীন? মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী—আমরা তাঁর পুত্র—ভিখারী? মা পতিতপাবনী—পুত্র পতিত! মা শক্তিময়ী—পুত্র শক্তিহীন? মা পূর্ণানন্দের স্পর্শমণি—পুত্র পাপসংক্ষুব্ধ ত্রিতাপদগ্ধপাতকী—অস্পৃশ্য? মা হিমগিরিশেখরশোভা স্নিগ্ধ নির্ঝর—পুত্র তপ্ত মরুশায়ী তৃষাতুর? একটা সর্ব্বস্ব-হারানর উন্মাদ হাসি—ঠিক তোমার সর্ব্বস্ব-গ্রাসিনী করালিনী-কালী-মূর্ত্তির অট্টহাস্যের মত—অথবা কতকটা সেই রকমের একটা হাসি ছাড়া আর যে কিছু আসে না মা,যখন তোমার ও আমার মাঝে এ বিসদৃশ ব্যবধান প্রত্যক্ষ করি! তুমি অন্নপূর্ণা—তোমার পুত্রের দীনতা কেন? তোমায় দেখলে দীনতা থাকে না, তোমায় না দেখাই দীনতার কারণ—ঋষিরা এ কথা সত্যের ঝঙ্কারে ঘোষণা করেছেন সত্য, কিন্তু কেমন করে দেখ্‌ব তোমায় আমরা—প্রভাত যা'দের কুজ্ঝটিকাময়, মধ্যাহ্ন যা'দের দাহনজর্জ্জর, সন্ধ্যা যা'দের অবসাদাচ্ছন্ন, নিশায় যারা তমোমূঢ়। কেমন ক'রে দেখবে তারা, যা'দের নয়নতারা জ্যোতিঃহীন, প্রজ্ঞানেত্র যা'দের মিথ্যাবৃত। মিথ্যাদর্শনে—মৃত্যুদর্শনে রোরুদ্যমান ব্রহ্মরা চোখে শোচনশীল শূদ্রের চোখে কেমন করে তারা দেখবে সত্য-জীবন তোমায়! শিবের মত ভিখারী না পেলে যে তুমি স্বর্ণ মন্দিরের দ্বার খোল না! ব্রাহ্মণের চক্ষু না খুললে তুমি যে হৈমবতী হয়ে আস না! শূন্য ঝুলিতে—ভিক্ষা তুমিও দাও না—একমুটা অন্ন ঝুলিতে না থাকলে তুমিও বিমুখ হও অন্নপূর্ণা!

ঋষি বলেন,ভিক্ষা পাবার উপযুক্ততা তোমার ঝুলির আছে;—মুষ্টিমেয় অন্ন আছে তোমার ঝুলিতে চেয়ে দেখ। তুমি নাকি বিশ্বরচনা করে তিনটী অন্ন আপনার জন্য কল্পনা করেছিলে।

মন বাক্ ও প্রাণ। ইহার মধ্যে দুটি দিয়াছিলে—প্রসাদ ক'রে দেবতাদিগকে আর একটী দিয়েছ প্রাণীদের। দেবতাদের দিয়াছিলে মন ও বাক্ আর আমাদিগকে দিয়েছ প্রাণ—তাই আমরা প্রাণী। প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা আমাদের বেঁচে থাক্‌তে হয়। প্রাণই আমাদের অন্ন।

তুমি তিনটি অন্নেরই ভোক্তা। "অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ।" দেবতাদের দিয়াছিলে বাক্য ও মন। দেবতাদের ক্ষুধা মেটে নাই—তারা আব্দার করলে তিনটিই চাই—আর আমরা বোধ হয় আব্দার করতে না পারলেও শিশুর মত তোমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম তাই তুমি ব্যবস্থা করলে, প্রাণীরা দেবতাদের প্রাণ দেবে আর দেবতারা তার বিনিময়ে আমাদের দেবে বাক্ ও মন। পরস্পর এইরূপে পরস্পরের ভাবনা ভাববে পরস্পর পরস্পরের শ্রেয় অন্বেষী হবে।

ব্যবস্থা করেছিলে ভাল। কিন্তু আমাদের প্রাণটুকু আমরা দেবতাদের দিতে আর চাহি না। তাই দেবতারাও আমাদের আর বাক্ ও মন দেন না। দেবতারা তাই আজ প্রাণহীন প্রায়—আর আমাদের যা' বাক্য ও মন আছে, তা' মিথ্যায় ভরা মিথ্যা। আমরা বলি মিথ্যা, ভাবি মিথ্যা আর সেই মিথ্যার পেষণে প্রাণ অন্নটুকুও মিথ্যার বিষে মাখান।

হায় সেই সত্যের যুগ! যখন আমরা দেবতাদের না দিলে প্রাণ ভোগ করতুম না, যখন আকাশকে দেখতুম দেবতা, সূর্য্যকে দেখতুম দেবতা, চন্দ্রকে দেখতুম দেবতা; বায়ুকে অগ্নিকে, জলকে, পৃথিবীকে, সমস্তকে বাঙ্ময় মনোময় দেবতা বলে দেখতুম জানতুম প্রাণ দিতুম্; নাম ও রূপাত্মক বাহ্যকে নাম বা বাঙ্ময় ও রূপ বা মনোময় দেবতা বলে প্রাণ দিয়ে বা যজ্ঞরূপ প্রাণময় ক্রিয়া দিয়ে তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতুম্, আর বিনিময়ে কল্যাণ আশীষ লাভ করে হ'তুম্ সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্প সত্যদর্শী ব্রাহ্মণ। বাক্ ও মন ইহারই অন্য নাম "নাম ও রূপ" আর প্রাণই যজ্ঞ বা কর্ম্ম। বাহ্য যজ্ঞ প্রাণ যজ্ঞেরই বাহ্য বিকাশ। তাই তখন প্রাণ আমাদের থাক্‌ত সত্যের দ্বারা আবৃত। নামরূপকে সত্য বলেই ঋষি বলতেন, আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করতুম্। প্রাণ হ'ত আমাদের অমৃত—থাক্‌ত সত্যের আধারে সত্যের দ্বারা আবৃত হয়ে। "তদেতৎ ত্রয়ং সদেকমযমাত্মা একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ং তদেতৎ অমৃতং সত্যেন চ্ছন্নম্। প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ তখনই আত্মস্বরূপিণী তোমায় চিন্ময়ী মনোময়ী বাঙ্ময়ী প্রাণময়ী অন্নপূর্ণারূপে যথার্থ দর্শ

করতুম্। তোমাকেই চিনতুম্ তিনরূপে—ব্রহ্মরূপে দেবীরূপে আত্মরূপে।

আর আজ নাম ও রূপকে মিথ্যা বলতে শিখেছি। কর্ম্ম মিথ্যা বাক্ মিথ্যা মন মিথ্যা—মিথ্যায় আজ প্রাণটা প্রচ্ছন্ন। যা করি তা মিথ্যা যা দেখি যাহা শুনি যাহা ভাবি যাহা অনুভব করি সব মিথ্যা—মিথ্যা কুহেলি! তোমাকে দেখবার পূর্ব্বেই যারা ভাবে তোমায় দেখেছে যারা বাচাল তর্কে মনে করে তোমায় চিনে নিয়েছে যারা প্রাণরূপ অন্ন বাঙ্ময় ও মনোময় দেবতাদের না দিয়ে, বাক্ ও মনকে বা নাম ও রূপকে মিথ্যা করে দিয়েছে অথচ সেই মত বাক্যে ও মনের সাহায্যেই তোমার প্রতিষ্ঠান-বেদী আবিষ্কার করতে প্রয়াস পায়, তারাই ক্রমে ক্রমে কুহেলি জমাট করে তোমার সন্তানদের চক্ষু আচ্ছন্ন করেছে—অন্ন বিষময় করেছে। তারা বিষ ভক্ষণ করেছে—আত্মহনন করেছে—আর তোমার ও আমার মিলনের মূর্ত্ত সুখাসন যাহা তোমার দেবমূর্ত্তি—বাঙ্ময়ী মনোময়ী ব্যবহারময়ী মূর্ত্তি তাহা ভেঙ্গে চূর্ণ করেছে। আজ তোমার পতিত সন্তানরা "ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যা আত্মাই আছেন আর সব মরীচিকা" এই রকম আবৃত্তি করে—এমন একটা সুবর্ণের প্রস্তরাধার নির্ম্মাণ করে—যাতে সুবর্ণও পাওয়া যায় না প্রস্তরও দুর্লভ, সুতরাং আধার বাঙ্মাত্র।

তাই ওগো ঋষি। আমার অন্ন আছে সত্য কিন্তু সে যে বিষময়—সে যে প্রাণহীন প্রাণ—সেত অন্ন বলে গ্রহণ করা যায় না! ঝুলিতে মুষ্টিমেয় অন্নের বদলে ভস্ম নিয়ে গেলে কি ভিক্ষা মিলবে গুরো!

ঋষি বল্লেন—তোমার ঝুলি তোমার অন্তর ঝুলি মহিমময়। অন্তরের ঝুলিতে যাকে যা বলবে সে তাই হয়ে যাবে, ছাই সোণা হবে বিষ অমৃত হবে, মৃত জীবিত হবে মিথ্যা সত্য হবে, শত্রু মিত্র হবে পর আপন হবে—শুধু যদি তুমি বল—সেই ঝুলির ভিতর নিয়ে গিয়ে বল। তুমি সেইখানে মিথ্যা বলেছ বলেই প্রাণ মিথ্যায় ভরে গিয়েছে, বিষ বলে দর্শন করেছ বলেই প্রাণ মন বাক্য বা নাম রূপ কর্ম্ম বিষ হয়েছে। সত্য বল সত্য হয়ে উঠবে, অমৃত বল অমৃতে প্রাণ পূর্ণ হবে। এ অন্তরই তোমার ব্রহ্মপুর সত্য "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্।" ও আমার ভিক্ষার ঝুলি অন্তর—ওরে আমার অন্তর্যামিনীর শয়নঘর, ওরে আমার কৃষ্ণ মিলনের কেলিকুঞ্জ, ওরে আমার শব সাধনার মহাশ্মশান, ও আমার পরশমণির গুপ্তগৃহ তুমি এমন? আর এই এমন তোমাকে আমি

শুধু না জেনে ছাই ভস্মে পূর্ণ করে রেখেছি। আমি অন্নপূর্ণার পুত্র হযেও তাই অন্নহীন !

সহস্র সহস্র প্রণাম তোমাদের চরণ প্রান্তে ঋষিবৃন্দ—সহস্র সহস্র সাবেগ লুণ্ঠন সেই ধূলিতে —যে ধূলিতে তোমরা পদক্ষেপ করেছ ! কি দেখালে—কি দেখালে ঋষি ! আমার অন্তরের যত ধূলির উপর শুধু অন্তর্যামিনীর পদচিহ্ন আমার প্রাণের গায়ে যত ধূলি—এ যে প্রাণময়ীর পদধূলি আমার তপ্ত ললাটের যত চিন্তা এ যে মায়ের চুম্বন পরশ আমার মূঢ়তার বিষ অন্ন সঞ্জীবতায় স্তনধারা তোমারই—মা—তোমারই ওগো ভিখারীর অন্নপূর্ণা !

চিনেছি মা তোমায় চিনেছি ! আমার আকাশ তুমি—আমার বায়ু তুমি—আমার অগ্নি তুমি—আমার জল তুমি—আমার ভূমি তুমি—আমার বাক্ তুমি—আমার মন তুমি—আমার প্রাণ তুমি—আমার নামরূপ কর্ম্ম—নামরূপ কর্ম্মাত্মক আমার এ বিশ্ববোধ তুমি মা তুমি অন্নপূর্ণা ! নাম অন্ন—রূপ অন্ন—কর্ম্ম অন্ন—তুমি এ অন্নের ভোক্তা, তুমি এ অন্নের দাতা তুমি এ অন্নরূপিণী অন্নপূর্ণেশ্বরী অন্নদা। আমার ভিক্ষার ঝুলি তোমার অন্নে পূর্ণ। আমার বাহ্য-জগৎ এ তোমারই অন্ন তুমি—আমার অন্তর্জ্জগৎ এ তোমারই অন্ন তুমি—আমার আমি এ তোমারই অন্ন তুমি। আমার ঝুলিতে অন্ন আছে মা আছে, শূন্যাধার নয় মা, তুমি ভিক্ষা দাও।

আমার সকল ব্যর্থতার ব্যথা—আমার সকল দীনতার দলন—আমার সকল মোহের মূঢ়তা—আমার সকল ছিন্ন আশার ধূলিলুণ্ঠন—আমার বিশ্বমর্ম্মের আর্ত্তনাদ—আমার সুপ্তশোকের তপ্ত অশ্রু—আজ তোমার পূজায় পুষ্পসম্ভার হয়েছে ! আমার প্রতিবেদনায় তোমার স্নেহাশ্রুর পরশ অনুভব করেছি—আমি ব্যর্থ নই দীন নই কাঙ্গাল নই ব্যথিত নই শোকগ্রস্ত শূদ্র নই। আমি তোমার পুত্র, আমি শিবাশিস্য শিব—আমি আর কারও ধনের ভিখারী নই, তোমার ধনের ভিখারী তোমার ভিখারী—এস তুমি আমার অন্তরে। আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত, মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত—দেবদ্বয় তাদের বরণ করে এক করেছি আমার বাক্য মন—তুমি আমার অন্তরে এস। তুমি দিতে এস—তুমি নিতে এস—তুমি দেখতে এস—দেখা দিতে এস—তুমি দ্বৈতে এস—অদ্বৈতে এস—আমার মুক্তি অন্তরে তুমি এস। আমার প্রাণে এস—আমার মনে এস—আমার বাক্যে এস—আমার ভাবে এস আমার ভবে এস—আমার বিশ্বে এস আমার বিশ্বাসে এস, আমার অবিশ্বাসে এস আমার গমনে এস

আমার ঐশ্বর্য্যে এস আমার সগুণে এস আমার নির্গুণে এস। এস—এস আমার অন্তরের ধন অন্তঃশায়িনী অন্তর্য্যামিনী অন্নপূর্ণে! এস আমার নামে রূপে কর্ম্মে!

ওঁ জ্ঞানতাজ্ঞানতা বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃতামিদং সর্ব্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে॥

কোন্ পথে?

(শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী)

ধনের আশা, মাবার নেশা
আজও কি তোর ছুটবে না রে?
অন্ধকারে বদ্ধ হয়ে
নাশ্‌বি কি তুই জীবনটা রে?

মেকির মায়া ঘুচবে না তোর,
থাক্‌বি চির কালটা পাগল?
দেখ্‌বি না তুই চোক্‌টা মেলে,
কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল?

রঙ্গিন দেখে আজও কি তুই
বিষয় বিষই কর্‌বি রে পান?
মাথার মুকুট মনে ভেবে
খুঁজবি কেবল সুযশ মান?

ভুলের পথেই চল্‌বি চির,
টুট্‌বে না তোর মোহের বাঁধন?
পদের মদেই র'বি বিভোর,
ফুট্‌বে না তোর জ্ঞানের নয়ন?

আঁখি মুদে প্রাণের পুরে,
প্রাণারামকে দেখরে বোকা!
রূপ দেখে তার হবি পাগল,
ঘুচ্‌বে রে তোর সকল ধোকা।

ভোগের টানে যাস্‌নে ভেসে,
বাড়াস্‌নে আর পথের ভার:
রোগের বীজ আর রোপিস্ না'ক,
ত্যাগের মন্ত্র কর রে সার।

দ্রৌপদী (১)

(কুরুসভা)

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতি

(শ্রীমতিলাল চট্টোপধ্যোয় এম-এ ,

কুরুরাজ শ্বশুর তুমি আমার। আমি
তব প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু-পুত্রবধূ।
বলিতে আমারে শ্রেষ্ঠা সর্ব্ববধূ হতে।
কোথা তব ভাল বাসা কোথা তবস্নেহ
তোমারি তনয় দুষ্ট কর্ষিছে আমারে
তোমারি সমক্ষে এই সভা মধ্যস্থলে!
কুরুকুলবধূ আমি তোমারই স্নুষা!
ভীষ্মদেব ব্রহ্মচারী কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি
তোমারি ত্যাগের বলে ভ্রাতুস্পুত্র তব
লভিয়াছে রাজ্যধন অতুল সম্পদ
তুমি কেন মৌনভাবে রহিছ বসিয়া?
যবে পিতা বলি তোমা ডাকিত অর্জ্জুন
বলিতে হে পিতা নহ পিতামহ তুমি
হইত তখন তব অশ্রুপূর্ণ আঁখি
দেখিয়া পিতৃবিহীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
কোথা তব দয়া কোথা তব স্নেহ মায়া
তোমারি সমক্ষে কেশে ধরেছে আমার
তোমারি অধর্ম্মাচারী পৌত্র দুঃশাসন।
দ্রোণাচার্য্য পিতৃবন্ধু তুমি হে আমার
শুধু নও গুরু তুমি জনক সমান
তোমারি সমক্ষে হয় কন্যা অপমান
রহিছ নিশ্চেষ্ট হয়ে গতাসুর প্রায়!
সোমদত্ত কৃপাচার্য্য সভাসদগণ
বল মোরে কোন শাস্ত্রে বলে আনিবারে
ধর্ম্ম-পরায়ণা সাধ্বী সতীরে সভায়?
নিরুত্তর বৃদ্ধগণ! বালক বিকর্ণ
একমাত্র বন্ধু মম আর দাসী-পুত্র
কেবা শোনে তাহাদের অরণ্যে রোদন?
জানিলাম বন্ধু নাহি আছয়ে আমার
পতিহীনা বন্ধুহীনা আশ্রয়বিহীনা
একমাত্র গতি তুমি মম বাসুদেব
আমি তব প্রিয়সখী শিষ্যা অনুগতা
রাখহ আমারে নাথ এ ঘোর বিপদে
বিবস্ত্রা করিছে দুষ্ট দুঃশাসন মোরে

কেশে ধরি আকর্ষিছে দিতেছে অশেষ
ক্লেশ মোরে, অপমানে অবসন্ন তনু।
কেহ দেখাইছে মোরে বস্ত্রহীন উরু
কেহবা হাসিছে আর বলিতেছে দাসী।
দয়াময় হৃদে মম হও আবির্ভাব
মান অপমান যেন সমবোধ হয়
সুখ দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় বিপদ সম্পদ।
নতুবা আমারে দাও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবল
যাহাতে হইব এই দুঃখার্ণব পার।
দেখিতেছি দয়াশূন্য তোমরা সকলে
তবে দাও প্রত্যুত্তর প্রশ্নের আমার।
অগ্রেতে নির্জ্জিত রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতে
তার পর পণ রাখিলেন তিনি মোরে।

দাসের সম্পত্তি কিছু নাই এ সংসারে
জানতো তোমরা সবে, তবে কি করিয়া
আমি গণ্যা হই তাঁর সম্পত্তি স্বরূপে ?
কি প্রভুত্ব তাঁর মমো'পরি সেই কালে ?
এ কারণ পূর্ব্বে পাঠালাম জিজ্ঞাসিয়া
অগ্রে জিতা আমি কিম্বা জিত যুধিষ্ঠির
যবে প্রাতিকামী দূত গেল অন্তঃপুরে
লইয়া আসিতে মোরে এ সভা ভিতরে।
এই অবস্থায় যদি তোমাদের মতে
(কুরুসভা শ্রেষ্ঠ সভা সংসার ভিতরে
পরিপূর্ণ জ্ঞান-বৃদ্ধ সভাসদগণে)
হই আমি পণ জিতা দাসী হব আমি
মহানন্দে প্রবেশিব কুরু অন্তঃ পুরে
জানিব নাহিক ধর্ম্ম এই ভূমণ্ডলে।

ওমর খৈয়ামের বাণী। *

(শ্রীসন্তোষকুমার দাস এম্-এ)

আজ আটশত বৎসর অতীত হইল ওমারের বাণী নীরব হইয়াছে কিন্তু তাঁহার কান্ত পদাবলী নরনারীর প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহা প্রকৃতই অভিনব, প্রকৃতই মনঃপ্রাণমদ, অনন্তসাধারণ সন্দেহ নাই। ভাবের প্রাচুর্য্যে, রসের মাধুর্য্যে ও ছন্দের লীলায়িত নর্ত্তনে ইহাদের প্রতি ছত্র—

"বীণা পঞ্চমে বোলেরে।"

এ বীণার ঝঙ্কার যাহার কর্ণে একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে সে ইহা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। ইহাতে আছে সেই তৃষ্ণা—মুগ্ধ্যা [illegible]

* ব্যাটরা 'পারিজাত সমাজে'র একাদশ 'সংক্রান্তি সম্মিলনে' পঠিত।

সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া মানুষের চিন্তাকে বিব্রত হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে শত দর্শন শত বিজ্ঞান যাহার গভীরতার ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমরা কোথা হইতে আসি কোথায় যাই? কেহ বা ভাগ্যবান হয় কেন? কেহ চোখের জলে বসন তিতাইয়া দীর্ঘ জীবনের বোঝা বহিতে বহিতে মরে কেন?—এই সকল প্রশ্ন ওমরের চিত্তে সর্ব্বদা জাগিত; এবং এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তাঁহার কবি-চিত্ত তাঁহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য সর্ব্বদা আকুলি বিকুলি করিত।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন "ওমারের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠ্‌ছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন—কোথায় ছিলাম, কেনই আসা। এই কথাটা জানতে চাই * * * যাত্রা পুনঃ কোন্ লোকেতে? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরে ওমর যা বলেছেন তা' নিয়ে অনেকেই ভ্রান্তিতে পড়েছেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মতে 'ওমর বলেছেন "সব ক্ষণিকের...আসল—ফাঁকি, সত্য-মিথ্যা, কিছুই নাই...আসল সত্য এই যে জগৎও মিথ্যা, ব্রহ্মাণ্ডও মিথ্যা।† শ্রদ্ধেয় জলধর সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"ওমর বল্‌ছেন সব মিথ্যা, ব্রহ্ম মিথ্যা" ‡ কিন্তু আমার মনে হয় ব্রহ্ম মিথ্যা একথা ওমর কখনই বলেন নাই, ব্রহ্ম আছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই—এই কথাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন; তবে যত সংশয়, যত প্রশ্ন, যত কলহ এই ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া। ওমর একস্থলে বলিয়াছেন—

"পাপ হতে বল কি ভয় আমার,
অসীম যে তব করুণাগার।
পথের সম্বল কেন আহরিব, বহিয়া তব দয়ার ভার॥
তোমার পুণ্য পরশ যদি গো—
উজলে মম হৃদয় মাঝ।
তিলেক শঙ্কা নাহি এ পরাণে,
যতই অসিত হউক সাজ॥

অন্যত্র বলিয়াছেন—বিন্দু কাঁদিয়া কহিল—"হায় আমি জলধি হইতে পৃথক্ হইলাম।"

জলধি হাসিয়া কহিল—"আমি সর্ব্বব্যাপি।"

সত্যই আর কিছুই নাই শুধু আছেন খোদা।

ঠিক যেন একটী বিন্দু বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বহুতর বিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে।

† শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র ভূমিকা।

‡ ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।

আবার—

মাঝে মাঝে তুমি বদনমণ্ডল সবার
চক্ষুর অন্তরাল কর।
মাঝে মাঝে তুমি বিশ্বরূপে
আপনাকে প্রকাশ কর ॥
এই রহস্যের দ্রষ্টাও তুমি স্রষ্টাও তুমি।
তুমি দৃষ্ট বস্তু, তুমিই দর্শন ॥ *

ওমরের এইরূপ অনেক রোবাইয়াৎ আছে যাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মের সত্তা সম্বন্ধে ওমরের মনে কখনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। যাঁহারা এই বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে ই, এইচ্ হুইনফিল্ড প্রণীত ওমর খেয়ামের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯৫, ৪০২ প্রভৃতি সংখ্যক চতুষ্পদী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। †

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়াই যত গণ্ডগোল; ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার আর একটা নাম হচ্ছে—বিশ্ব সৃষ্টির গূঢ় রহস্য কি তাহা উদ্ঘাটিত করা। এই প্রশ্ন যেমন একাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি ওমরের মনে জাগিত তেমনি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি টেনিসনের মনেও উদিত হইয়াছিল। টেনিসন তাঁহার In Memoriam এ লিখিয়াছেন—

O life as futile then, as frail !
O for thy voice to soothe and bless ?
What hope of answer or redress,
Behind the veil, behind the veil.

ওমর লিখিয়াছেন—

"রুদ্ধ-দুয়ার জীবন-ঘরের কুঞ্জি কাটির
নাইকো খোঁজ,
দেখ্তে না পাই ভাগ্য-বধুর ঘোম্টা-ঢাকা
মুখ-সরোজ।

---

* অন্যত্র বলিয়াছেন—

হে প্রভু! আমার এই হীন অবস্থায় আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দুর্ভাগ্য, এই দারিদ্র্য।

তুমি নাস্তি হইতে অস্তি সৃষ্টি কর। তুমি আমাকে আনয়ন কর এই মায়াময় নাস্তি হইতে আমার সত্য অস্তির মধ্যে।

আর একস্থলে লিখেছেন—

নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন—যেই নিয়েছে খেলার ভার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেল্ছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য-খেলায় করেন যিনি কিস্তি মাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু—জয় পরাজয় তাঁরই হাত।

† শুধু ইহাই নহে। Mr. E. G. Browne তাঁহার "Literary History of Persia নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"Immediately before his death he (Omar) reading in the "Shifa" of Avicenna the chapter treating of the One & the Many and his last words were—"O God, verily I have striven to know Thee acording to the range of my powers; therefore forgive me, for indeed such knowledge of Thee as I possess is my (only) means of approach to Thee (P. 251).

বারেক হুবার কণ্ঠে কাহার

শুন্‌ছি শুধু নামটী মোর—

কয়দিনই বা ?—সাঙ্গতো হয়

সর্ব্বনাশের নেশার ঘোর !"

কিন্তু টেনিসন এই পর্দ্দার অন্তরালটাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। আর ওমর ইহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি সারা জগতে কেবল সমাধির স্তূপ দেখিতেন। * বাস্তবিক, কালের ইঙ্গিতে কোথা হইতে ঐ ফুলটী আসিল, মুহূর্ত্তের জন্য হাসির রেখা ফুটাইয়া আবার কোন্ অজানা দেশের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল ! যে উপাদানে ফুলের দেহ গঠিত তাহাত এখনও ধরার বুকে লুটাইয়া আছে—তবে কিসের অভাবে আর সে ফুল আসে না—আর সে গন্ধ দান করে না। কে এ বিরাট্ রহস্য মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবে ? ...মরাই বা কোথায় ছিলাম কেহ জানি না ! কোথায় যাইতেছি তাও বলিতে পারি না। এ নিয়তি চক্রের উপরত্ত আমার কোন অধিকার নাই। আমি যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র—

"Ther's Divinity that shapes our ends
Rough hews them how we will."

সেক্সপীয়র বলিয়াছেন "Divinity দৈবশক্তি কিন্তু সে যদি Divinity হয় তবে তার কার্য্য-কলাপ Divine নয় কেন ? সে যদি "Divinity" হয় তবে কেন ঐ আশ্রয়হীন বিধবার একমাত্র নয়নপুত্তলী, তার ভগ্ন বুকের একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি সম পুত্রবত্ন অকালে তাহার হৃদয় চূর্ণ করিয়া শমনের দ্বারে খসিয়া পড়িল ? একি পাপের প্রায়শ্চিত্য ? তা যদি হবে তবে ঐ নবজাত দেবসম শিশু কোন পাপের ফলে রোগ যাতনায় ছট্‌ফট করিতেছে ? মনোহর মৃগশিশু কোন্ পাপে শার্দ্দূলের উদরপূর্ত্তি করিতেছে ? যে Divine দেবতা এই হত্যা অভিনয়ের উদ্যোক্তা, তাঁর কোন Divine উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হইতেছে ? ঐ দেখুন, দার্শনিক সপেনহ'র্ তারস্বরে বলিতেছেন—না না কখনই নয়, সে দেবতা Divine নয়, উহা অচেতন প্রেরণা মাত্র

---

* বলিতেছেন--

"কভু মনে হয় ঐ যে গোলাপ প্রভাত অরুণে দিতেছে লাজ
না জানি কাহার লোহিত শোণিতে পরিয়াছে উহা অমন সাজ
যে ফুল কোমল, কুন্তলে গাঁথি, বিহ্বল কানন সুরভি সার
প্রতি কলি তার উঠেছে ভেদিয়া না জানি শিথিল কবরী কার।
ঐ যে শ্যামল স্নিগ্ধ প্রবাহ সুপ্ত প্রসারিত তটিনী ধার
তীরে সখা,হেথা চরণ ফেলিয়া কিশলয়ে যেন বাজে না তার।
হয়তকাহার অধর কমলে শিকড় উহার পরশি ধায়
কত লিপ্ত আঁখি যাহার লাগিয়া,একদা ঝরিছে নিশীথবায়।"

(Unconscious Will)! উহা কিছু বুঝে না, কিছু তার কানে পশে না—এ ধরার আকুল ক্রন্দন, ব্যথিতের মর্ম্মবেদনা, উৎপীড়িতের সহস্র মিনতি কিছুই তার হৃদয়স্পর্শ করে না। কিন্তু ওমর বলিতেছেন, না, সে শক্তি অজ্ঞান নয়, অচেতন নয়, সে সজাগ শক্তি, সে স্বেচ্ছাচারী বিরাট অভিনেতা; সে আপনার মনে আপনি ভাবে, আনন্দ করে, লীলা করে, ভাঙ্গে গড়ে—আপনার মন লইয়া আপনি ব্যস্ত থাকে। সে যদি অজ্ঞান হইত তাহা হইলে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এমন সুশৃঙ্খলায় চলিত না। যে প্রচণ্ড শক্তিতে কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র বিমান পথে বিহার করিতেছে, কোন্ দিন তাহারা পরস্পরের সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তাই ওমর বলেন, সৃষ্টির এই যে সৌন্দর্য্য সমাবেশ, পৃথিবীর এই যে লীলাবৈচিত্র্য ইহা সেই স্রষ্টার নিজের সুখের জন্য—তুমি আমি তাঁর সৃষ্টির উপকরণ তাঁর সুখাস্বাদনের উপাদান মাত্র। কবির কথাটাই Andrew Lang প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন।—

"The Pitchers we whose maker
makes them ill?
Shall he torment them if they
chance to spill?
Nay like the broken potsherds are
we cast
Forth and forgotten end what
will be will."

তাই ওমর 'কুজানামা'য় বলিতেছেন—গৃহী হাঁড়ি লইয়া কাজ করে—হঠাৎ যখন কোন আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া যায়, সে উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নূতন হাঁড়ি লইয়া কাজে লাগে। আমরাও সেই বিশ্বশিল্পীর প্রস্তুত মৃৎপাত্র মাত্র। আমাদের জীবন ধারণে বা মরণে তার কিছুই যায় আসে না। সুতরাং যে বলে এ জীবনে দুঃখকে বরিয়া লও পরলোকে সুখ পাইবে সে যেমন ভ্রান্ত, যে পরকালের নরকাগ্নির উল্লেখ করিয়া এ জীবনের সুখরাশি বর্জ্জন করিতে বলে সেও তেমনি ভ্রান্ত। দুঃখের কশাঘাতে তুমি আমি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে অপর কোটী কোটী জীব এ সৃষ্টিকে মুখরিত করিয়া রাখিবে। তুমি আমি কে যে এই পৃথিবীর বাহিরে মরণের পরপারে আমাদের জন্য বিধাতা এক বিরাট স্বর্গপুরী গড়িয়া রাখিবেন? তাই ওমর বলিতেছেন—

Oh come with old Khayam and
leave the wise
To talk one thing is certain, that
life flies;

One thing is certain that rest is lies
The flown that once has blown for
ever dies.

তাই কবির মতে যাহারা পার্থিব সুখের আশায় অথবা নরলোকে স্বর্গ লোকের আশায় কঠোর সাধনায় জীবনাতিপাত করিতেছে—তাহারা সকলেই ভ্রান্ত !

"How sweet the mortal sovereignty
think some
Others how blest the Paradise to
come !
Ah ! take the Cast is hand and
waive the rest
Oh ! the brave music of a distant
drum !"

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"নগদ ফলের আশায় যোদ্ধা মরছি খেটে
রাত্র দিন।
মরণ পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা
পলক হীন॥
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের শব্দ পাই—
মূর্খ ওরা, আসল জোরের হেথায় হোথায়
কোথাও নাই॥"

কবি যে শুধু ভবিষ্যতের ভাবনা করিতে নিষেধ করিতেছেন তাহা নহে অতীতকেও তিনি ভুলিতে বলিতেছেন—

"অতীত যা তা দুঃখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের
ভাবনা ঘোর—
দিল পিয়ারা সাকী গো আজ পেয়ালা ভরে
ঘুচাও মোর।
আস্‌ছে যে কাল—তার কথা থাক—মিশবে
গিয়ে হয়ত আজ
তুচ্ছ স্মৃতির গৌরবেতে লক্ষ অতীত কালের
মাঝ।"

অন্যত্র বলিতেছেন—

"অনুশোচনার শীত পরিধান
ফাল্গুন আগুনে দহন কর।
আয়ু বিহগ উড়ি চলি যায়
হে সাকী, পিয়ালা অধরে ধর॥

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইব যে, ওমর নানা ভাবে নানা ছন্দে বিশ্ববাসীকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে জীবনকে মধুময় করিতে বলিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, ওমরের কবিতায় অনেকেই কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের চিহ্ন— রসের আস্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন "ব্রহ্মমিথ্যা" বলেন নাই, তেমনি শুধু নাচ, গান ও সুরা পান করার জন্য একার কর্তৃত্বের মত লেখনী ধারণ করেন নাই।

আপনারা জানেন সাধনার মার্গ তিনটী—জ্ঞান-মার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্ম্মমার্গ। এই তিনটী মার্গ পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ; কিন্তু ইহারা সকলেই সমান সুগম নহে। ভক্ত রামপ্রসাদ ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহাকবি হাফেজও তাই। কিন্তু ওমর খৈয়াম ধরিয়াছিলেন জ্ঞান-মার্গ। হাফেজ বিচার বুদ্ধির প্রতীক্ষা রাখেন নাই —তাই তিনি সন্দেহের দোলায় দুলিত হন নাই —তাই তাঁর জীবন প্রেমানন্দের বাসর সজ্জায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ওমর ছিলেন—জ্ঞানের রাজ্যে—তাই আনন্দের পূর্ণপশরা সহসা তাঁহার নিকট পৌঁছে নাই। অন্তরে তিনি যে আনন্দ-জগতের পরিকল্পনা করিতেন—বাস্তব জগতে সে নন্দনকাননের সন্ধান পাইতেন না। তাই যখন তিনি অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অবিচার দেখিতে পাইতেন তখন তাঁহার চিত্ত জগতের প্রতি আস্থাহীন হইয়া উঠিত। তখন তিনি কর্ম্ম-মার্গেও অগ্রসর হইতেন না—কেননা আশাই লোককে কর্ম্মে প্রেরণা দেয়। তখন তিনি জগৎ বা সমাজ হইতে সুখের আশা করিতেন না। তিনি চাহিতেন—লোকালয় ছাড়িয়া দূরে—দূরে গহন কাননে নদী সৈকতে তাঁহার মনের ভিতর-কার সেই আনন্দপুরীর সন্ধান করিতে। কখনও তিনি সদানন্দময় ভগবানের উদ্দেশ্যে আবাহন গীত গান, কখনও তাঁহার নিষ্ঠুর বধিরতায় ব্যথিত হইয়া সুরা গীতি ও নারীসৌন্দর্য্যের তন্ময়তায় আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চান কিন্তু চাওয়া তাঁহার যথার্থ চাওয়া নয়—এ তাঁহার চিত্তের নিবেশ নয়—বিক্ষেপ মাত্র। শুধু এই কথাটী মনে রাখিলে আমরা ওমরের বাণী সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব।

ত্রিবেণী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বিএ

২৭।

"তখন আমি আট বছরের। বিয়ে কাকে বলে জানতুম না। স্বামী কি জিনিস্ তাও বুঝতুম না। একদিন শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল।

বিয়ের আগে গায়ে হলুদের দিন আমার খুব

আমোদ হ'য়েছিল। সেদিন আমার কি আদর! কি যত্ন! একটা লালপেড়ে শাড়ী প'রেছিলুম, গায়ে সব হলুদ মাখিয়ে দিলে! আরও কত কি ক'ল্লে সব কথা মনে নেই। শ্বশুর বাড়ী থেকে যারা গায়ে হলুদ এনেছিল তারাও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আরও পাড়ার অনেক মেয়েরা এসেছিল। সকলেই আমার সুখ্যাতি কত্তে লাগ্‌ল'। সবাই ব'ল্লে আমার কি সৌভাগ্য! কি কপাল!

আমার নাকি খুবমস্ত বড় এক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে হ'চ্ছিল। অমন ভাল কুলীন আমাদের গ্রামে নাকি ছিল না; তাছাড়া আশে পাশে কোন গ্রামেই ছিল না। অতএব ভাল পাওয়া পাছে হাত ছাড়া হ'য়ে যায় ব'লে আমার বাপ মা তাড়াতাড়ী ক'রে ওর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিলেন। তার ওপর আমার বিয়ের বয়সও হ'য়ে উঠেছিল। একটু একটু যেন মনে প'ড়চে অনেকে নাকি ব'লেও ছিল বিয়ে না দিয়ে আমাকে আর রাখা যেতে পাচ্ছিল না। কেন না গৌরীদানের সময় উৎরে গেলে আমি অরক্ষণীয়া হ'য়ে প'ড়তুম—গ্রামের লোকে তা হ'লে বাবাকে একঘরে ক'রবে বলেছিল।

বিয়ের দিন রাত্রিতে আমায় সবাই খুব সাজিয়ে দিলে। ভাল করে চুল বেঁধে দিয়ে কপালে আর দুটো গালে চন্দনের কৌটায় ভরিয়ে দিলে। ঠোঁট দুটো একটু আলতা দিয়ে রাঙা ক'রে দিলে। গায়ে ছিল একটা খুব ভাল জামা পরণে ছিল সবুজ রংয়ের একখানা শাড়ী। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সবাই আমায় সোণার আর রূপোর গয়নায় ভরিয়ে দিয়েছিল; পা দুটো আলতায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। আমার সাজ গোজ দেখে সুখ্যাতি না ক'রে কেউ থাকতে পাল্লে না! অনেকে আবার ব'লেছিল "রাঙা মুখ না হ'লে কি আর এ সব মানায়। এই তো সেবার বোসেদের বড় মেয়েটা ঠিক এই রকমই সেজেছিল। মাগোমা, কি মানানই মানিয়েছিল! ঠিক যেন ক্যাওড়া ছুঁড়ী! আর দ্যাখ দিকি বাছা আমাদের জগত্তারিণীর মেয়েটীকে। ঠিক যেন লক্ষ্মী পিরতিমেটী! যেমন বাছা দেখ্‌তে তেমনি মুখ চোখ ভাল, দেহের গড়ন সুশ্রী আর তেমনি সাজগোজ্‌টী। কায়েতের ঘরে কি ওসব মানায় বাপু! বামুনের ঘরেই পোষায়। এই কথা ব'লে তিনি আর একজনকার কাঁধটা ঠেলে দিয়ে ব'লেছিলেন "তুই-ই না হয় বল্‌না খেঁদির মা, কথাটা কি সত্য বলিনি?" খেঁদির মা বলেছিলেন "ঠিক বইকী ছোট বৌ কিন্তু ভাই সেবার আমার বোনঝীকে এরচেয়েও যেন একটু ভাল মানিয়েছিল।"

আরও অনেকে অনেক কথা ব'লেছিল। সব আমার মনে নেই। সকলের সুখ্যাতি শুনে আমার মনে মনে খুব গর্ব্ব হ'চ্ছিল। মনে হ'চ্ছিল আমার মত সুন্দরী, আমার মত দেখতে ভালো পৃথিবীতে বুঝি আর কেউ নাই। আমাদের ওপোরকার ঘরে একটা বড় আয়না ছিল, আমি তারই সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম কমলদা যদি একবার এ সময়ে আসেন তো বেশ হয়। তিনি ভারী নিজের চেহারার গর্ব্ব কত্তেন সকলকে বোলে বেড়াতেন তাঁর মত সুন্দর বুঝি গ্রামের ভিতর আর কেউ ছিল না। আমাকে ত কাল পেঁচি বোলেই উড়িয়ে দিতেন। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কত ঝগড়া হ'য়ে গেছে, কত কান্নাকাটী হয়ে গেছে। শেষকালে বাজী ফেলে তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে বিচারের জন্যে দাঁড়াতুম। আমাদের মধ্যে সর্ত্ত হোত যে, যে হারবে সে দশটা কিল খাবে আর সে দিন কাঁচা আমের ভাগ পাবে না। আমরা যখন তাঁর মার কাছে গিয়ে বলতুম, আমাদের মধ্যে দেখতে কে সব চেয়ে ভাল, তিনি হেসে বলতেন আমরা দুজনেই দুজনকার চেয়ে দেখতে ভালো। কাজেই কিলটা আর আমের ভাগটা আমরা সমান সমান বেঁটে নিতুম।

কিন্তু আজ আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'ল কমলদার চেয়ে আমিই দেখতে ভালো। হঠাৎ আরশীর ওপোর কমলদার' ছায়া পড়াতে, পেছন ফিরে দেখলুম ঘরের চৌকাঠের উপর কমলদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমায় দেখে ব'লে উঠলেন,* "বা তোকে তো আজ বেশ মানিয়েচে!" আমি অমনি ব'লে উঠলুম "দেখলে তো এবার কে সুন্দর। এতদিন তোমার ভারী জাঁক ছিল। আমাকে বেশ দ্যাখাচ্চে না কমলদা? মুখখানা তোলো হাঁড়ীর মতন করে তিনি বল্লেন, "ছাই ভাল দেখাচ্চে, পাঁশ ভাল দেখাচ্চে—ঠিক যেন বাঁদরী।" আমার বড্ড রাগ হয়ে গেল। বলে উঠলুম—"তুমি বাঁদর। তোমায় ঠিক যেন রাখাল বাগ্দীর মতন দ্যাখাচ্চে। আবার তেড়ী কাটা হ'য়েচে! ছড়ী হাতে নেওয়া হয়েচে! ভারী তো কোট, ভারী-তো কাপড়! মোজাটা আর জুতোটা কি বিশ্রী!"

"আহা কি মানানই হয়েচে! ঠিক যেন কৈবর্ত্তদের সেই মেয়েটা!" আমি খুব রেগে ব'লে উঠলুম, "তোমার সঙ্গে আর আমি কক্ষণ খেলা ক'রবনা। দেখি কে তোমার আম ছাড়িয়ে দ্যায়, এটা ওটা সেটা, তোমার হুকুমে দিয়ে আসে।"

"তাতে তো আমার ভারী বয়ে গেল। তুই

না হ'লে তো আম ছাড়িয়ে দেবার লোকের ভারী অভাব হবে।"

"আচ্ছা দেখব কে তোমায় আম ছাড়িয়ে দ্যায়। তখন কিন্তু আমায় ডাকতে এলে আমি যাব না।"

"আচ্ছা দেখিস্। আমার ভারী বয়ে গ্যাছে তোকে ডাকবার জন্যে। তোর সঙ্গেও আমি কখন আর খেলা কোরব না। দেখি কে তোর জন্যে আম্ পেড়ে দ্যায়, লিচু পেড়ে দ্যায়, পুকুর থেকে পদ্মফুল এনে দ্যায়।"

"তুমি না দিলেতো ভারী বয়ে গেল। তোমায় আমি সাধতেও যাব না।"

"কে তোকে তাহ'লে দেবে? শেষকালে দেখিস্ আমাকেই খোসামোদ ক'ত্তে হবে। তখন কিন্তু আমি কান্নাটান্না শুনবো না।"

"তোমাকে খোসামোদ ক'ত্তে ভারী আমার দায় পড়েচে। যার সঙ্গে আজ আমার বিয়ে হবে সেই আমার সব ক'রে দেবে, গাছ থেকে আম পেড়ে দেবে, লিচু পেড়ে দেবে, পুকুর থেকে পদ্মফুল এনে দেবে। পুতুলের পোষাক তৈরী ক'রে দেবে।" হো হো করে হেসে উঠে কমলদা ব'ল্লেন "সে ঘোড়ার ডিম করবে। তার যা চেহারা! বাবারে! আমার মনে কল্লেও ভয় করে। এই লম্বা দাড়ী! এই প্রকাণ্ড গোঁপ! আর দেখতে যেন আমাদের বড় গেটটার থাম গুলোর মত।" তাঁর কাছ থেকে আমার ভাবী স্বামীর বর্ণনা শুনে ভয়ে আমি শিউরে উঠে বল্লুম, "সত্যি কমলদা? তুমি কি ক'রে তাকে দেখলে? তোমার তো গোঁপ দাড়ী বেরোয় নি কমলদা'! তোমার চেহারা তো সেই থামটার মত নয়। আবার হো হো ক'রে হেসে কমলদা বল্লেন, "সে দেখতে ঠিক আমাদের বড় পণ্ডিত মশায়ের মত। বয়সেও প্রায় তাঁরই মত হবে কিম্বা তাঁর চেয়ে কিছু বড়ই হবে। সে দিন যে, সে বাবার কাছে এসেছিল।" আমি কমলদার কাছে গিয়ে তাঁর হাতটা ধ'রে ব'ল্লুম "তা হ'লে কমলদা, পণ্ডিত মশায়ের মত তিনি মারেন?"

"মুখখানা দেখে মনে হ'লো পণ্ডিত মশায়ের চেয়েও কাঠ, তাঁর চেয়েও গম্ভীর। দেখেই আমি তো সেখানে থেকে পালিয়ে গিছলুম।" আমি প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে কমলদার দুটো কাঁধে হাত দিয়ে বল্লুম "তুমিও তাহ'লে আমায় সঙ্গে চল কমলদা। আমায় যদি মারে? কে আমায় বাঁচাবে কমলদা?"

পণ্ডিত মশায় পাঠশালায় যখনই আমায় মাত্তেন, কমলদা আমায় জড়িয়ে ধরে থাকতেন কখন কখন আমায় টেনে নিয়ে বাহিরে চলে যেতেন। কমলদা আমাদের গ্রামের জমিদারের

ছেলে। তার ওপর পণ্ডিত মশায় জমিদার বাড়ীতেই খেতেন দেতেন থাকতেন। কাজেকাজেই কমলদা আমায় জড়িয়ে ধরলেই তাঁর হাতের বেত হাতেই থেকে যেত।

আমার কাঁদ কাঁদ মুখখানা দেখে কমলদারও চোখদুটো ছল্ ছল্ কোরে উঠেছিল, ব'ল্লেন, "নাই বা দেড়ে-বুড়োর সঙ্গে গেলি। চল্ আজ রাত্তিরটা আমাদের বাড়ী লুকিয়ে থাক্‌বি। কাল যখন বুড়োটা চ'লে যাবে, তখন না হয় এখানে চ'লে আসিস্।" কমলদাকে জড়িয়ে ধোরে বল্লুম "তাই চল কমলদা।" কিন্তু হঠাৎ আরসীর দিকে নজর পড়াতে বলে উঠলুম "ইস্, তোমার সঙ্গে যাব বই কি? যার সঙ্গে আমার আজ বিয়ে হবে তারই সঙ্গে যাব। তার সঙ্গে যাব ব'লে কেমন সব গয়না পরেচি কাপড়-জামা পরেচি, পায়ে আলতা দিয়েচি। পণ্ডিত মশায়ের মতন হ'লে মা কক্ষণ আমায় এমনি ক'রে সাজিয়ে দিতেন না। তোমার সব মিথ্যা কথা!

"তা হ'লে আমার সঙ্গে যাবি নি?"

"না।"

"যাবি নি?"

"না।"

"আবার বলচি, যাবি নি?"

"না, না, না। তোমার সঙ্গে যেতে আমার বয়ে গ্যাচে।" আমাকে ঠেলে দিয়ে কমলদা' বলে উঠলেন, "তবে মরগে যা। তোর বিয়েতে আমি তাহ'লে একটা সন্দেশও খাব-না।"

"না খেলে তো আমার ভাবী ব'য়েই গেল।"

কথাটা কমলদার কানে গেল কি না জানি না। তিনি তখন রাগের মাথায় খুব জোরে জোরে পা ফেলে সি ড়ি দিয়ে নেমে গ্যাছেন।

এ যেন কালকের ঘটনা বলে আজ আমার মনে হ'চ্চে।

শুভদৃষ্টির সময়ে আমার স্বামীর চেহারা দেখে সত্যই আমি কমলদার নাম ক'রে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলুম। অনেকে এর জন্যে তখন ব'কেছিল আবার অনেকে অনেক কথা ব'লে বুঝিয়েও ছিল। আমার একটু একটু মনে পড়্‌চে এক জন নাকি ব'লে উঠেছিল, "কি আলাতুনি মেয়ে বাবা। বুড়ো মাগী, আট বছরের ঢেঁকি, ঢলাচ্চে দ্যাখ না। আমার তো বাপু, পাঁচ বছরে বিয়ে হয়েছিল। এমন ধারা ক'রেছিলুম ব'লে তো মনে পড়ে না।"

তার পরদিন সকালে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করবার আগে আবার সবাই মিলে আমাকে সাজিয়ে দিলে! আমার স্বামীটীর মুখখানি যতবার আমার মনে পড়ছিল আমি কেমন শিউরে উঠছিলুম। কিন্তু সাজগোচের আমোদে

আর পাল্কী ক'রে দশ ক্রোশ পথ যাব এইটে ভেবে মনে মনে খুব আমোদ হচ্ছিল।

যাত্রা করবার সময়ে মা কাঁদতে কাঁদতে আমার কতবার চুমু খেলেন আর বলে দিলেন যে আট দিন পরেই আমি আবার আসব। বাবাও খুব কাঁদছিলেন। তাঁদের কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেল্লুম।

কিন্তু পাল্কীতে চ'ড়ে কান্নাটান্না সব ভুলে গেলুম। আমি একাই একখানা পাল্কিতে ছিলেম। কালকে রাত্তিরের মত আবার গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লুম। জমিদার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়েই যাবার রাস্তা। আমি ভাব্‌ছিলুম, কেমন জমিদারদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে পাল্কী চড়ে যাব আর কমলদা তাই দেখে কত হিংসে করবে। কমলদা' না হয় বয়সেই আমার চেয়ে ছ'বছরের বড়। কিন্তু আজ আমি অন্য সব বিষয়ে তাঁর চেয়ে কত বড়। মোড় ফিরতেই দূরে বড় গেট্‌টার ভেতরে জমিদারদের সাদা তিন মহলা বাড়ীখানা দেখতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কিসের একটা স্ফূর্ত্তী জেগে উঠল। এইবার নিশ্চয়ই কমলদার সঙ্গে ছাখা হবে। হিংসেতে নিশ্চয়ই তিনি ফেটে পড়বেন।

গেটের সামনে দিয়ে পাল্কীখানা বেরিয়ে যেতেই কমলদার ঘরের দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলুম, তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেয়ারা খাচ্চেন। আমি বেশ বুঝতে পাল্লুম আমাকে ছাখবার জন্যই তিনি ওখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখা-চোখী হ'তেই, যেন আমাকে দেখিয়েই, জানলাটা ঝনাৎ করে বন্ধ ক'রে দিলেন। আমার বড্ড, রাগ হ'ল। আমিও পাল্কীর কপাট্‌টা বন্ধ ক'রে দিলুম। আমি বুঝলাম কাল রাত্তিরে ঝগড়ার পর থেকে এখন তাঁর রাগ পড়ে নি। আমার তো তাতে ভারী ব'য়ে গেল। আমিও পাল্কীর কপাট বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। ওরই রাগ হ'তে পারে আমার যেন হ'তে জানে না।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মনের ভেতরটা কেমন ধারা ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ী ক'রে কপাট্‌টা খুলে দিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলুম জমিদার বাড়ী অনেকদূর ছাড়িয়ে চলে এসেছি। তবুও আমি দেখতে পেলুম বাড়ীটার পেছন দিক্‌কার ছাদের ওপরে কমলদা' দাঁড়িয়ে আমার পাল্কীর দিকে চেয়ে আছেন। আমার যেন মনে হল তিনি কাঁদচেন। আমিও কেঁদে উঠলুম। হাতছানি দিয়ে কমলদাকে ডাক্‌লুম। তিনিও অমনি ধারা ক'রে আমায় ডাকলেন। আমার

তখন একবার মনে হ'ল বেয়ারাদের বলি বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাক্। একবার ইচ্ছে হ'ল লাফিয়ে পড়ি। আসলে কিছুই করা হ'ল না। দুপাশের ধান ক্ষেত দেখ্তে দেখ্তে কাঁদ্তে কাঁদ্তে এগুতে লাগ্লুম। খানিকক্ষণ পরে আবার পেছন ফিরে দেখলুম। তখন জমিদার বাড়ীটা তত স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাওয়া গেল না। তবুও যেন মনে হ'ল কমলদা' তখনও তেমনি ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েচেন। আর একটা মোড় ফিরতে সমস্ত অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

শ্বশুরবাড়ী এসে আমার একদণ্ডও ভাল লাগে নি। কমলদা'র জন্যে, মার জন্যে, বাবার জন্যে সদা সর্ব্বদাই কত ভাবতুম, কত কাঁদতুম। বৌভাতের দিন আশা ক'রেছিলুম বাবার সঙ্গে কমলদাও আসবেন। কিন্তু বাবাকে একলা আসতে দেখে কমলদা'র ওপোর আমার বড্ড রাগ হ'ল। মনে মনে বল্লুম, "এঃ ভারী গুঁয়োর হয়েচে। না এল না এল ব'য়ে গেল।" প্রতিজ্ঞা কল্লুম কমলদার বিষয়ে বাবাকে কক্ষণ কিছু জিজ্ঞেস্ ক'রব না। কিন্তু বাবাও যখন যেচে কিছু ব'ল্লেন না, তখন আমি আর না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস্ করে ফেল্লুম, "কমলদা আলেননি কেন বাবা ?"

"তুই যেদিন চ'লে আসিস্ মা, সেই দিন রাত থেকেই তার বড্ড জ্বর হয়েচে। আসবার জন্যে সে ছট্ ফট্ কচ্ছিল কিন্তু অত জ্বরে কি পারি মা, আর তার বাপ্ মাই বা ছাড়বে কেন।"

বাবা তো সন্ধ্যার আগেই চ'লে গেলেন। আমি সে রাত্রে কিছুতেই স্থির হ'তে পাল্লুম না। কমলদার জন্যে সমস্ত রাত কাঁদলুম। আমার খালি খালি মনে হতে লাগল কেন আমি বিয়ের দিন রাত্রে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিলুম। না ক'ল্লে বোধ হয় কমলদা'র জ্বর হত না।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম। হঠাৎ বুকের ওপোর একটা কিসের চাপ পড়তে ভোরের বেলায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখলুম আমার স্বামীটী পাশে শুয়ে আছেন। তাঁর একটী হাত আমার বুকের ওপর রাখা ছিল। তাইতে এবং তাঁর নাক ডাকাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলুম। আমার চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ব'লে উঠলেন, "কি হয়েচে, কি হ'য়েচে ?" কথা কইতেই তাঁর আকর্ণ গোঁফ জোড়াটা আর আবক্ষ দাড়ীটা সবেগে ন'ড়ে উঠল। আমি আরও জোরে কেঁদে উঠলুম, ওরে বাবারে, মারে, কমলদা তুমি কোথায় রে।" আমার চ্যাচানির বহর দেখে তিনি ধড়ফড়

ক'রে উঠে বসে ব'ল্লেন, "ভয় কি ? ভয় কি ? আমি তো তোমার কাছেই রইচি।" আমাকে কোলের উপর তুলে নিলেন। তাইতে আরও আমার ভয় লেগে গেল। সাহস ক'রে তাঁর দিকে চাইতেই পাল্লুম না। তাঁর বুকের ভেতর মুখ লুকিয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ব'লতে লাগলুম, "কমলদা তুমি কোথায় আছ রে, আমায় নিয়ে যাও রে।" ভয়ে চেঁচিয়েও কাঁদতে পাচ্ছিলুম না।

আট দিন পরে বাপের বাড়ী ফিরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। বাড়ীতে পৌঁছুবার কিছু পরেই কমলদার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলুম তিনি একটা কি ছবি আঁকচেন। আমি পা টিপে টিপে গিয়ে পেছন দিক থেকে চোক দুটো চেপে ধরলুম। ছবির দিকে নজর পড়তেই দেখলুম আমারই একটা ফটোগ্রাফের ওপর একটা পাতলা কাগজ রেখে পেন্সিল দিয়ে আমার চেহারাটা আঁকচেন। আমি চোখ দুটো ছেড়ে দিয়ে ব'লে উঠলুম,—"আমার ছবিটা যে বড় নষ্ট করচ ? এই জন্যেই কি তোমায় দিয়েছিলুম নাকি ?" আমার পায়ের ওপর ছবিখানা ফেলে দিয়ে বল্লেন,—"এই নে তোর ছবি, আমি চাই না। ভারীতো একটা ছবি। আট দিন পরে তাই নিয়ে ঝগড়া কর্ত্তে এল।" ছবিখানা আমি রাগের মাথায় জানালা গলিয়ে বাগানের ভেতর ফেলে দিয়ে বল্লুম, "দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।"

"না নিস্ না নিবি যা। আমার তো তাতে বড্ড ক্ষতি।"

পেন্‌সিলের মাথায় ছুরীটা দেখে আমি বল্লুম,—"ভারী যে জাঁক করে বলেছিলে আমি না থাকলেও আম ছাড়িয়ে দেবার লোকের অভাব হবে না। কে ছাড়িয়ে দিস্‌ল শুনি ?"

"কে আবার দেবে, নিজে ছাড়িয়ে নিস্‌ছিলুম !"

"নিজে ছাড়িয়ে নিস্‌লে বৈকী। আমি সেখানে যেমনি ভাবে ছুরীটি রেখে গিছ্‌লুম ঠিক তেমনিই রয়েচে, আবার মিথ্যা কথা বলা হ'চ্ছে।"

"তোর ছোঁয়া ছুরী আমি ছুঁইও নি। আমি একটা নতুন ছুরী কিনেছি। তাইতে আম ছাড়িয়ে খাই।" "ঐ নতুন ছুরী দিয়েই বুঝি হাতটা কেটেছ কমলদা।" "ও একদিন একটু কেটে গিছল।"

"মদ্দানি কত্তে যাওয়া কেন ? আম গুলো সব রেখে দিলেই পাত্তে। আট দিন সবুর সইলো না ?" একটুখানি চুপ ক'রে থেকে

কমলদা ব'লে উঠলেন,—"আমার জন্যে খুব ভাবতিস্?"

"তুমি ভাবতে কমলদা?"

"হ্যাঁ"।

"আমিও কত ভাবতুম।"

একমাস পরে একদিন কমলদার কাছে প্রথম ভাগের শেষ দিকটা শেষ ক'রে, খানিকটা খেলা ক'রে, এক আঁচল কমলা নেবু নিয়ে বাড়ী ফিরে দেখলুম বাবা মুখটা গোমড়া ক'রে বাইরে ব'সে আছেন। বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখলুম মা আমার নাম ক'রে খুব কাঁদচেন। আমায় দেখে আরও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি কিছু বুঝতে পাল্লুম না। মা বল্‌ছিলেন,—"ওরে পোড়াকপালীরে, কেন তুই আমার পেটে জন্মেছিলিরে! ওরে তোর কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে। তোর মুখ যে আমি দেখতে পাচ্ছি না রে! ওরে ওযে চিরকালের জন্যে পুড়ে গেল-রে।"

প্রথমটা আমি একটু হতভম্ব হ'য়ে গিছ্‌লুম। তারপর সকলের কান্না দেখে কমলানেবু খেতে খেতে আমিও খুব কেঁদে উঠলুম। আসল কথাটা কিছুই বুঝতে পাল্লুম না।

শেষকালে শুন্‌লুম আমি নাকি বিধবা হয়েছি। আমার ঠাকুমা তখন সেখানে ছিলেন। তাঁকে বিধবা মানে জিজ্ঞেস্ কত্তে তিনি বল্লেন, যার স্বামী মরে যায় তাকে বিধবা বলে! এ শুনে আমার তো খুব আনন্দই হ'ল। সে মরে গ্যাছে ভালই হয়েছে। ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলুম আর আমায় শ্বশুরবাড়ী যেতে হ'বে না। আমার তো আরও আনন্দ হ'ল। এত ভাল খবর পেয়ে মা, বাবা, সবাই কাঁদচেন কেন বুঝতে পাল্লুম না।

ছুটে গিয়ে কমলদা'কে এ সু-খবরটা দিয়ে এলুম। তিনিও বলে উঠলেন, "যাক্ ভালই হ'য়েছে। দেড়ের কাছে আর তোকে যেতে হবে না।" আমিও হেসে বল্লুম,—"দাড়ী আর গোঁফ মনে কল্লে এখন আমার ভয় করে কমলদা। সে কি চেহারা! যেন একটা কালো মোষ।" কমলদা' হো হো ক'রে হেসে বল্লেন, "বেশ হয়েচে তুই বিধবা হয়েছিস্। কেমন তুই মাছ খেতে পাবিনে আর আমি বড় বড় মাছের মুড়ো তোর সামনে খাব।"

"ঈঃ মাছ খেতে পাব না। আমিও বড় বড় মাছের মুড়ো খাব। বিধবা হয়েছি তো কি হয়েছে! মাছ খাব না কেন?"

"তোর ঠাকুমা মাছ খায়? আমার দিদিমা মাছ খায়? ওরা তো বিধবা।"

"বিধবা হলেই বা! ওরা সে জন্যেতো মাছ

খাওয়া বন্ধ করেনি। দাঁতে চিবুতে পারে না তাই খায় না।"

"না, না, তুই জানিস্ না। ওরা বিধবা বলে খায় না!"

"তা হ'লেও ওরা বুড়ো বিধবা। আমি কত ছোট। আমি নিশ্চয়ই মাছ খাব।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কমলদা বল্লেন, "এক রকম ভালই হয়েছে। আমায় তো আর ছেড়ে যেতে পারিনি।"

"আর কক্ষণ যাব না কমলদা।' হাজার ভাল ভাল সোণার গয়না দিলেও যাব না। বা দাড়ি বাবারে! সেদিন বাস্তিবে গাটা আমার এত কুট্ কুট্ ক'রে উঠেছিল। বিছানায় শুইয়ে দেবার পর অনেকক্ষণ ধরে ঘসে ঘসে তবে কুট্কুটানি যায়। এবার যেখানে বিয়ে হবে কমলদা' তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। যাবে?"

"যাব।"

"সেই বেশ হবে। একলা আমি আর কক্ষণ যাব না।"

দেখতে দেখতে ছ'বচ্ছর কেটে গেল। সেই যে বিয়ে হবার পর পাঁচ দিনের জন্যে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম—আর যাইনি। যাবার কোন দরকারও হয় নি। যেতে কেউ বলেও নি। এই ছ'বচ্ছরের মধ্যে কত ঘটনাই ঘটে গেল। কত কি যে বদলে গেল সব এখন মনেও নেই।

(ক্রমশঃ)

"লোক" ও "জাতি" সম্বন্ধে ধারণা।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ)

জাতি—সংস্কারগত, জাতি—রাজ্যগত।

সাধারণ ব্যবহারে People (পিপল) ও nation (নেশন) "লোক" ও "জাতি" শব্দ প্রয়োগে ভাবদুষ্টি পরিলক্ষিত হইলেও বিজ্ঞান মতে ইহাদের ভাবার্থ স্পষ্ট ও পরিস্ফুট হওয়া উচিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সভ্য জাতি কর্তৃক এক শব্দ বা একার্থবাচকশব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় বিজ্ঞানও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। ইংরাজীতে People (লোক) শব্দ, ফরাসীতে People শব্দ সংস্কার বা সভ্যতা-বোধক; কিন্তু ঐ ভাবই জারমানেরা nation (ওল্ড রোমানেরা nation শব্দ) দ্বারা প্রকাশ করে। ইংরাজীতে nation শব্দে রাজ্য-বোধক ভাব প্রকাশ করে; জারমান ভাষায়

ইহার প্রতিশব্দ Volk (ভোক)। শব্দশাস্ত্র (Etymology) জারম্যান শব্দ ব্যবহারের অনুকূল বলিয়া মনে হয়, কারণ 'নেশন' শব্দ নেশিও (নেশিন) হইতে উৎপন্ন এবং ইহা জন্ম ও জন্মগত জাতিবাচক ; কিন্তু "ভোক"বা"পপুলাস" শব্দ রাজ্যান্তর্গত লৌকিক জীবন জ্ঞাপন করে। এ হিসাবে জারমানেরা মধ্যযুগে যুগপৎ "লোক" (people) ও "জাতি" (nation) ছিল। গত কয় শতাব্দীতে তাহারা "জাতি" সংজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন দেশ, অধিক কি বিভিন্ন "জাতি"ভুক্ত হইয়া "লোক" people সংজ্ঞায় পরিণত হয়।

আজ জারমান জাতি জাতিতে পুনরাবর্ত্তন করিয়াছে—প্রাণ পাইয়াছে—তবে এখনও জারমান লোকের অংশ বিশেষ জারমানেতর জাতির রাজ্যভুক্ত হইয়া আছে। অধুনা জাতীয়ত্বের ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে প্রখর হইলেও লোকত্ব (people) ও জাতীয়ত্বের ধারণা একীভূত হইয়া যায় নাই। লোক সমূহ (People) ও জাতি সমূহ ইতিহাস প্রসূত। একটী জন-সঙ্ঘ কালপ্রভাবে ধীরে ধীরে কোন বিশিষ্ট জীবনধারা ও সমাজ-বন্ধন গঠিত করিয়া আপনাদের বিশিষ্ট গণ্ডী স্থির করিয়া লয় এবং তাহাই তাহাদের চিরন্তন স্বরূপে সাব্যস্ত হয়—এইরূপেই মনত্বের ক্রমবিকাশে একটী লোক (people) গড়িয়া উঠে। যথেচ্ছ ও অসম্বদ্ধ জনসঙ্ঘ দ্বারা লোক গঠিত হইতে পারে না। লোক গঠিত করিতে হইলে পুরুষানুক্রমিক বহুদর্শিতা ও ভাগ্য বিপর্য্যয়ের একত্র সমন্বয়ের আবশ্যক এবং ইহার স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা বহু গোষ্ঠির পুরুষপরম্পরায় অর্জ্জিত জ্ঞান-গবেষণার অধিকার সম্ভূত "পৈত্রিক" ধারণার উপর নির্ভর করে।

জাতীয় অভ্যুত্থান রাজনৈতিক ব্যাপার বিশেষ। রাজ্য বা রাষ্ট্রই ইহার জনয়িতা, সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রকার (constitution) প্রবর্ত্তনে ইহার উত্থান অভ্যুত্থান সূচিত করে। কিন্তু জাতীয়তার বিশিষ্ট ভিত্তি ব্যতিরেকে জাতীয় অভ্যুত্থান কখনই নিরাপদ বা স্থায়ী হইতে পারে না।

লোক (People) গঠনে বহুতর শক্তি ও অবস্থা বিশেষের ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় ; ইহার দ্বারা লোকের উপাদান স্বরূপ জনসঙ্ঘ একটী বিশিষ্ট ভাব, বিশিষ্ট স্বার্থ ও বিশিষ্ট আচার ব্যবহার বলে নির্দ্দিষ্ট হইয়া পরস্পর সম্বদ্ধ ও অনবচ্ছিন্ন জনসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মধ্যযুগে ইয়ুরোপ খণ্ডে ধর্ম্ম বুদ্ধি এ হিসাবে যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রাচীনকালে এশিয়া খণ্ডে মানবের জীবন ব্যাপার ও চিন্তার রাজ্যে এই ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রভাব এতই অব্যাহত হইয়া

উঠিয়াছিল যে ধর্ম্ম-একতাই জাতীয়তার প্রধান ভিত্তি রূপে পরিগণিত হইত এবং অবিশ্বাসী বা ধর্ম্মে অনৈক্য-বাদীরা "বিজাতীয় বা বিদেশীয়" আখ্যায় আখ্যায়িত হইত। সম্ভবতঃ ভারতীয় ও পারসীক আর্য্যগণ ধর্ম্মানৈক্য বশতঃই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে বাসস্থান ভাষা ও জন্মগত একতা থাকিলেও ধর্ম্ম বিশ্বাসের পার্থক্য হেতু বিজাতীয় বা বিদেশীয়ের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। এবং এইজন্যই জিউইস জাতিই তাহাদের নিজ বাসভূমি ব্যাবিলন বন্দীতে; রোমের শাসনকালে এলেকজান্দ্রিয়া ও রোমে তাহাদের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এমন কি জিউইস রাজ্য ধ্বংসের পর বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন লোক মধ্যে অবস্থান কালেও ইহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং ধর্ম্ম বিষয়ে একতা অপেক্ষা ধার্ম্মিক স্বাধীনতা প্রশংসনীয় হওয়ায় "লোক" গঠন-পরিপুষ্টিতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত প্রভাব-হীন হইয়াছে। অধুনা ধর্ম্ম-বিশ্বাস অপেক্ষা জাতীয়তা এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব-শালী। সুতরাং জায়মাণ জাতি ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে রোমান কেথলিক বা প্রটেষ্টাণ্ট বহু বা প্রকৃতি বাদী (Pantheist) অবিচারে জাতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ এবং বহু বিদেশীয় বা বিজাতীয়ের সহিত, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে একমত হইলেও জাতীয়তার গৌরবে গরীয়ান্ হইয়া নিজেদের বিশিষ্টতা বা পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। লোক গঠনে ধর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা ভাষার প্রভাব অধিকতর বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণ ভাষাই লোকের বিশিষ্ট পরিচয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নিজ নিজ ভাষায় বিশিষ্ট আকার প্রদান করে; ক্রমে একভাষাভাষীদের মধ্যেও দেশ বিশেষে ভাষার আকারগত পার্থক্য হেতু বোধসৌকর্য্য অন্তর্হিত হয়। এইরূপে ভাষার আকৃতি ও বোধগত সাম্য লোক সৃজন করে অর্থাৎ যাহারা এক ভাষাভাষী ও একই ভাষা বুঝিতে পারে তাহারাই একটী বিশিষ্ট লোক পর্য্যায়ভুক্ত ও তাহার অভাবে পরস্পর বিদেশীয় রূপে গণ্য হয়। ভাষা সাধারণ ভাব প্রকাশ করে ও ভাবের আদান প্রদানে ভাষাই অবলম্বন। গোষ্ঠী মধ্যে ভাষাই পুরুষ পরম্পরায় ব্যবহৃত পৈত্রিক সম্পত্তি। জাতীয় ভাষাই এইরূপে জাতীয় ভাবসম্পদ অক্ষুণ্ণ ও দৈনিক ব্যবহারে উজ্জীবিত করিয়া রাখে। এরূপও দেখা যায় যে সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতি সমূহও কোন এক নূতন ভাষা সম্বন্ধে অধিকার লাভ করিবা মাত্র নূতন ভাবের ভাবুক হইয়া পড়িয়া জাতীয়তা হারাইয়া বসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা

যাইতে পারে—ইটালিতে অষ্ট্রোগথ ও লম্বার্ড নামক জারমাণ জাতি ইটালিয়ান হইয়াছে; ফরাসীক কেল্ট, ফ্রাঙ্ক ও বারগাণ্ডিয়ান জাতি সমূহ ফরাসী হইয়াছে এবং প্রাসিয়ার স্ল্যাভস্ ও ওয়েণ্ডস জাতিসমূহ জারমাণ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে জাতীয়তা-বোধ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ ও প্রভাবশালী হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এইগুলি:—ভাষা, সাহিত্য ও সাময়িক সংবাদপত্র। জাতীয় সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় আন্দোলন প্রসার লাভ করে। কারণ জাতীয়সাহিত্য, চিন্তা ও ভাবের ধারা একমুখে প্রবাহিত করে এবং জাতীয় ভাব-সম্পদ জনে জনে বণ্টনের সুবিধা আনিয়া দেয়।

তত্রাচ ভাষাই সব সমাজে জাতীয়তার একমাত্র নির্দ্দেশক-চিহ্ন নহে। সুতরাং লোক ও বংশানুক্রমিক এক ভাষাভাষী একই ভাবে'লোক নহে। ব্রেটন্স ও কন্দসনা নিজেদের ফরাসী লোক পর্য্যায়ভুক্ত মনে করে কিন্তু তাহারা ফরাসী ভাষা বিদেশীয় ভাষারূপে ব্যবহার করে। এ দৃষ্টান্তে জাতির সহিত রাজনীতি, অবস্থা-বিপর্য্যয়, স্বার্থ, সহানুভূতি ও সভ্যতা বিষয়ে মিলনই ফরাসী-জাতীয়তা-বুদ্ধির উন্মেষক ও প্রবর্ত্তক কারণ। অন্যপক্ষে ইংরাজেরা ও উত্তর অ্যামেরিকাবাসীরা এক ভাষাভাষী ও পরস্পর জন্মগত সম্পর্কে নিকট সম্পর্কিত হইলেও দুইটী পৃথক রাষ্ট্র জাতি রূপে পরিগণিত। এক্ষেত্রে ভাষা নহে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা চাল-চলন ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থাবৈগুণ্যই জাতীয়তার নির্দ্দেশক পরিচয়। এই দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় যে (১) ধর্ম্মবুদ্ধি (২) ভাষা ব্যতিরেকে (ক) দেশ ও বাসস্থানগত (খ) জীবন-ব্যাপার বৃত্তি ও আচার ব্যবহারগত (গ) ও রাষ্ট্রীয় মতগত (ঘ) সাম্য নূতন 'লোক' গঠনে যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়া থাকে।

রতন না মিলিল।

(শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দে)

নিশাকান্ত অনেক পুস্তক পড়িল, অনেক রাত্রি জাগিল, অনেক চিন্তা করিল. কিন্তু তাহার মনের ভিতর যে ছবি অহর্নিশ জাগিয়া উঠিত, তাহার সহিত কোনও বালিকা বা কিশোরীর

মূর্ত্তি ঠিক মিলিতেছিল না—তাই তাহার বিবাহে ঘোর আপত্তি। অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে বিবাহ করা চলিবে না। তাহার যে কি হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইত না, তবে এইটা দেখা যাইত যে সে সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক; রাস্তায়, মাঠে, ঘরের ভিতরে, ছাদে—যখন সে যেখানে থাকিত, সঙ্গে একখানা বই থাকিত। সে বইখানির পাতা কেবলই উল্টাইয়া যাইত, পড়িত খুব কম। মধ্যে মধ্যে দু-একটা জায়গা একটু পড়িত এবং ছাদের উপর অথবা দোতলায় একখানি নির্জ্জন ঘরে চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিত। কখনও কখনও চাঁদের সঙ্গে, মলয় বায়ুর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিত। হঠাৎ কাহারও পদশব্দ পাইলে চমকিয়া উঠিয়া বইখানির পাতা ঘন ঘন উল্টাইতে থাকিত।

একদিন বাটীতে অন্য কেহ ছিল না, কোথায় সকলে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছে, কেবল একমাত্র বিধবা মনোযোগের সহিত রন্ধনাদি ক্রিয়ায় নিযুক্তা। বিধবাটির নাম বীণা। বীণা নিশাকান্তের এক জ্যাঠতুত দাদার পত্নী। বিধবা হওয়ার পর হইতে নিশাকান্তদের বাটীতে নানা প্রকার গৃহকর্ম্ম করিয়া কোনও রূপে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন কাটান ভিন্ন বীণার উপায়ান্তর ছিল না। বীণা নিশাকান্তকে ছেলেবেলা হইতে অত্যন্ত আদরে মানুষ করিয়াছে। নিশাকান্তের মা ছিল না—তাই যত কিছু বায়না ও যত কিছু আব্দার সব বৌদিদির কাছেই হইত। সেদিন নিশাকান্ত রান্নাঘরে ঢুকিতেই বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরপো তুমি বিয়ে করতে চাও না কেন? বয়েস হ'য়েছে, লেখাপড়াও শিখেছ, দেখতেও কেমন সুন্দর! যেখান থেকে যত সম্বন্ধ আস্‌ছে তুমি সব ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন? আচ্ছা তোমার কি বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছা হয় না? তুমি সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে থাক, কি যেন ভাব, তোমার তেমন ক্ষিধে নেই, আর দিন দিন যেন রোগা হ'য়ে যাচ্ছ! আমার মাথা খাও, তুমি ঠিক ক'রে বল তোমার কি হ'য়েছে।"

নিশাকান্ত অনেকটা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "কি আবার হবে।"

"কিছু যদি হয় নি, তবে সর্ব্বদা তুমি কি ভাব?"

"কি আবার ভাব্‌ব"।

"সংসারে আর কোনও মেয়েছেলে নেই, আমার ইচ্ছে যে এই বৈশেখ মাসেই বিয়ের মত ক'রে ফেল!"

"কি দরকার! তুমি ত সবই কর্‌ছ। আর তা ছাড়া বিয়ে ক'রে শুধু শুধু একটা ঝঞ্ঝাট

বাড়ানো বৈ ত নয়!"

"ঝঞ্ঝাট আবার কি? এ সংসারে কে বিয়ে করে না বল? বিয়ে ক'রে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করে। বিয়ে না ক'র্‌লে মানুষের সংসার আবার কি?"

"আমি সংসার ক'র্‌ব না। সংসারে জড়িয়ে পড়্‌লে মানুষ আর কোনও ভাল কাজ কর্‌তে পারে না। আমি তাই ভাব্‌ছি, কোন্ দিকে যাব।"

"তাহ'লে আমার কথাও রাখ্‌বে না?"

"বোধ হয় রাখ্‌তে পারব না।"

"বোধ হয় টোধ হয় নয়—তুমি আমার কথা রাখ্‌বে কি না বল।"

"কি কথা?"

"এতক্ষণ পরে বল্লে—কি কথা।"

বীণা আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া, মুখখানা ঊষাকালের চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ করিয়া, চক্ষু দুইটিকে হৈমন্ত-প্রভাত-কমলের ন্যায় ঈষন্মুদ্রিত ও অশ্রুসিক্ত করিয়া, ডালনার কড়ার উপর খুন্তিখানা ঠন্ ঠন্ করিয়া ঠুকিয়া, কড়াখানা নামাইয়া ফেলিল। চুপ করিয়া নিজের মনেই কাজ করিতে লাগিল।

নিশাকান্ত বলিল, "বৌদি, রাগ ক'র্‌লে না কি?" বীণা বলিল "রাগ ক'র্‌ব কার উপর ভাই"! নিশাকান্ত বলিল "বৌ-দি, আজ বাড়ীতে কেউ নেই, আজ কেহ আস্‌বেও না; চল না, আজ থিয়েটার দেখ্‌তে যাই, ভাল পালা আছে, আর তুমি সংসারের কাজের জন্য কোথাও বেরুতেও পাওনি। যাবে?"

বীণা ভাবিল "মন্দ কি; যদি থিয়েটার টিয়েটার দেখিয়া সংসারে ঝোঁক আসে, যদি শেষকালে বিয়েতে ঝোঁক ধরে—তা মন্দ কি।" প্রকাশ্যে বলিল "বেশ ত যাব।" নিশাকান্ত যে থিয়েটারের ঘুণ হইয়া গিয়াছে, বীণা তাহা জানিত না।

নিশাকান্ত সেদিন রাত্রিতে বীণাকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে গেল। পালা খুব জমিয়া গিয়াছিল; নাচে, গানে, সিনে, একটিতে কোনও বিষয়েই কোনও ত্রুটি হয় নাই। দুজনেই মুগ্ধ হইয়া অভিনয় দেখিয়া রাত্রি প্রায় দেড়টায় বাটীতে ফিরিয়া আসিল। সে রাত্রিতে আর কাহারও ঘুম ধরিতেছিল না; সুতরাং, শুইল বটে—কিন্তু বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিল।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, আমার মাথার দিব্বি, তুমি সত্যি ক'রে বল দেখি তোমার মতলবটা কি। তুমি বিয়ে কর্‌তে রাজী কি না?"

"রাজি, কিন্তু—।"

"কিন্তু কি?"

"আমি ঐ—ঐ—"

"আমি কাহাকেও বল্‌ব না—তুমি বল না কেন।"

"বল্‌বে না?"

"না।"

"বল্‌বে না?"

"না।"

"ঠিক বলছ, বল্‌বে না?"

"মাইরি, না।"

"দেখ, থিয়েটারের ঐ শোভা ব'লে যে কিশোর বয়সের একটা সখী সাজে, আমার ঐটাকে বড্ড পছন্দ হয়।"

"সে কি ঠাকুরপো!"

"কেন, দোষ কি?"

"ওরা যে বেশ্যা, ওদের কি কেহ গেরস্ত ঘরে বৌ করে!"

"কেন দোষ কি?"

"তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি!"

"আচ্ছা, ওকে যদি আন্‌তে কোনও দোষ থাকে, তাহ'লে না হয় গেরস্ত ঘর থেকে, কি কোথাও থেকে, ঐ রকম একটা খুঁজে পাওয়া যায় না? আমাদের কলিকাতায় বাড়ী আছে, আমি লেখাপড়া জানি, দেখ্‌তেও তোমরা ত ভাল বল, আর বাবারও ত দুপয়সা আছে। কোথাও খুঁজে খুঁজে কি ঐ রকম একটা বার করা যায় না?"

"না, ঠিক ঐ রকম নাচিয়ে গাইয়ে হাব-ভাব-ভঙ্গী-ওলা মেয়েমানুষ গেরস্ত ঘরে মিল্‌বে না। দেখ্‌তে ডানা-কাটা পরীর মত জুট্‌তে পারে।"

"আচ্ছা, লেখাপড়া-জানা?"

তা—সামান্য লেখাপড়া জানা মিল্‌তে পারে। কিন্তু ও রকম ঢঙ্‌ মিল্‌বে না।"

"কিন্তু, আমি যে পড়েছি ও রকম মেলে।"

"যে সব প'ড়েছ—সে সব কেবল বইয়েতেই আছে, কিন্তু সত্যি সত্যি গেরস্তঘরে নাই—ও সব গল্প কথা।"

"না, না, গল্প কথা নয়—অনেক বইয়েতেই ভাল ভাল মেয়েদের কথা আছে তুমি জান না, তাই ও কথা বলছ।"

"তবে তাই হবে"—এই কথা বলিয়া বীণা নিশাকান্তের ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিল, এবং নিশাকান্ত কোনও বাদ প্রতিবাদ না করিয়া অশিক্ষিতা বৌদিদি ও বৌদিদির ন্যায় সাধারণ গৃহস্থবালাদিগের বোকামির কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এক-

মনে চিন্তা করিতে করিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিশাকান্ত পাশ ফিরিয়া শুইল, এবং গোটা দশ বারো কাক বাড়ীর ছাতের আল্‌সের উপর বসিয়া কা কা করিয়া কর্কশ চীৎকারে নিশাকান্তের প্রভাতী নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল।

গয়ার ইতিহাস—রাজগৃহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল্)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাজগৃহ বৌদ্ধগণের নিকট পবিত্র তীর্থস্থান। বুদ্ধদেব বহুকাল এইস্থানে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধরাজগণের রাজধানী নীত হইবার পূর্ব্বে রাজগৃহই মগধ-রাজ্যের রাজধানী রূপে জগৎ সমক্ষে বিদিত ছিল। জৈন পরিব্রাজকগণ রাজগৃহের বিষয় সুন্দর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মাটিন, উইল্‌কিন্স প্রমুখ আদিম দেশপর্য্যটক ও ইতিহাসলেখক ইংরাজ দর্শকগণ ভ্রমণে আসিয়া এই স্থানের সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার সন্নিকট নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্রাট অশোক ও কনিষ্কের সময়ে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এইস্থানে সরিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সহিত উপসেনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাজগৃহে নিগ্রন্থ বিষপ্রয়োগে বুদ্ধদেবের প্রাণ সংহার করিতে বৃথাচেষ্টা করিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট শৈলে গোতম সুরঙ্গম সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এইস্থান বৈহার, বরাহ বৃষভ ঋষিগিরি এবং চৈত্যক এই পঞ্চ শৈলদ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ুপুরাণমতে এই পঞ্চ পর্ব্বতের নাম বৈভার, বিপুল, রত্নকূট গিরিব্রজ ও রত্নাচল। কথিত আছে যে এইস্থানে রাজা জরাসন্ধের দুর্গ ছিল। বৌদ্ধযুগে এই স্থান বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের লীলা-ক্ষেত্র হইয়াছিল এবং বিহারে মুশলমান রাজত্বের সময়ে এই খানে মকদুম শরফুদ্দীন নামক এক সিদ্ধ পীর ফকীর বাস করিতেন। এই পঞ্চ পর্ব্বতবেষ্টিত চক্রাকার উপত্যকার নিম্ন দিয়া সরস্বতী নাম্নী দুইটি নদী প্রবাহিত হইতেছে গিরিসঙ্কটের দক্ষিণে ইহারা মিলিত হইয়া একতারা গ্রাম হইয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে সমতলভূমির

সহিত এই পর্ব্বতগুলি বনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব এই পর্ব্বতগুলির পরস্পর দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈভর হইতে বিপুল বার হাজার ফুট, বিপুল হইতে রত্নগিরি সাড়ে চারি হাজার ফুট, রত্নগিরি হইতে উদয়গিরি সাড়ে আট হাজার ফিট, উদয়গিরি হইতে সোমগিরি সাত হাজার ফিট, এবং সোমগিরি হইতে বৈভার নয় হাজার ফিট ব্যবধানে অবস্থিত। এখানে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল তাহা হিউএন্‌সিয়াঙ্‌ লিখিয়া গিয়াছেন। এখনও বিপুলগিরি ও বৈভার গিরির পাদদেশ ও তপোবনে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিওয়েন্‌ সিয়াঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে পীড়িত ব্যক্তি এই উষ্ণ জলে স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন এই প্রস্রবণগুলি নিজচক্ষে পরিদর্শন করিয়া উষ্ণতার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্যকুণ্ড ১২৬ ডিগ্রী, সীতাকুণ্ড ১০০ ডিগ্রী ব্রহ্মকুণ্ড ১০২ ডিগ্রী চর্ম্মকুণ্ড ১১২ ডিগ্রী হইতেছে বর্ত্তমান সময়ে পাটনা কলেজের অধ্যাপক মিঃ ব্যাকুলী এই কুণ্ডগুলির উষ্ণতা নিম্নের তালিকানুসারে বিবৃত করিয়াছেন:—সূর্য্যকুণ্ড ১১২, সীতাকুণ্ড ৯১, ব্রহ্মকুণ্ড ১০১- চর্ম্মকুণ্ড ১১০.৫ ডিগ্রী হইতেছে। উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে এই কুণ্ডগুলির উত্তাপ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ডাঃ ক্যানিংহাম সাহেব বলেন যে বৌদ্ধযুগের গিরি ব্রজপুর, বর্ত্তমান কালের গিরিয় হইতেছে। এ সম্বন্ধে মিঃ মণ্টগোমেরী মার্টিন তাঁহার "ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে বিশদবিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে গয়া জেলার বিশেষ বিশেষত্ব আছে; এবং কুর্কীহার, গয়া, বুদ্ধগয়া, দস্তগীরপুর, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানের এ সম্বন্ধে প্রাধান্য (importance) কিছু বেশী। যদিও রাজগৃহ এবং গিরিব্রজের পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে, যদিও প্রাচীনশিল্পী মহাত্মাদিগের নির্ম্মিত এই সুন্দর নগর কালের কঠোর কশাঘাতে এখন ভগ্নাবশেষে পর্য্যবসিত হইয়া বনে পরিণত হইয়াছে। তথাপি ইহার শান্তিপ্রদ প্রভাব অদ্যাবধি লুপ্ত হয় নাই। যে স্থান এককালে শত শত রাজকর্ম্মচারির কলরবে মুখরিত হইত, তাহার নিস্তব্ধতা এখন বন্য বিহঙ্গ স্বর নৈশ শব্দে ভঙ্গ হয়!!! আমি পাঁচ বা ছয়বার রাজগৃহ পরিদর্শন করিয়াছি। একবার গয়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটীবাবু প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সবডিভিসানে গিয়া সমস্ত ভগ্নাবশেষগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। জরাসন্ধের "বৈঠকখানা কোষাগার, পুষ্পবাটিকা, মন্দির প্রভৃতি দেখিবার

স্থান বটে। মন্দিরের নিকট একটি চতুর্ভুজ গণেশ জননীর ভগ্নমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক দেখিবার স্থান এইখানে আছে। সন্নিকটেই একতারা জলপ্রপাত বড়ই মনোরম। গিরিব্রজ জরাসন্ধের উদ্যান বাটিকা (country seat) এবং রাজগৃহ রাজধানী ছিল বলিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমারও ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। যেস্থলে জরাসন্ধ ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই রঙ্গমঞ্চও স্থানীয় লোকগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আজ কয়েক বৎসর হইল আমি চতুর্দ্দশবার রাজগৃহ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম সেটি আমার বোধহয় নওয়াদার সবডিভিসন অফিসার বাবু বঙ্কু বিহারী দত্তের সময় তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

দুই দিক।

(পণ্ডিত শ্রীভবদেব জ্যোতির্বার্ণব)

(১)

জানি তুমি সুবিদ্বান্, ধার্ম্মিক প্রবর;
সতত তোমার মনে রাজিছে সততা।
থাকে যদি সনে তব হীন সহচর;
রাখিতে নারিবে হৃদে শকতি সর্ব্বথা॥
দুর্জ্জন যদিও হয় গুণরাশি বিমণ্ডিত।
ভূষিত সর্পের হায় নাশে প্রাণ অতর্কিত॥

(২)

প্রাণ যদি ডুবে থাকে ভব পারাবারে;
সুকার্য্য অকার্য্য কিবা না থাকে বিচার।
ভাগ্যবলে যদি পাও কোন মহাত্মারে;
সেবিবে তাঁহার পদ যাইবে বিকার॥
তুলারাশি অগ্নিকণা ভস্মসাৎ করে যথা।
অঙ্গারে হুতাস যোগে নাহি থাকে মলিনতা॥

রত্ন কণা।

(শেখ মোহম্মদ ইদ্রিস আলী)

(১)

দেশের পর দেশ জয় ক'রে শত বিজয় পতাকা আকাশে উড়িয়ে, তুমি নিজেকে মহা পরাক্রান্ত বলে মনে কচ্ছ; কিন্তু তোমার মনোপ্রদেশে—অন্তর্জগৎটা প্রবল শত্রুতে দমন করে নিচ্ছে তা' দেখেও তুমি স্থির ধীর—সেটা রক্ষা করবার

তোমার সামর্থ্য নাই—কোন উপায়ও করতে পাচ্ছ না। বীর বটে!

(২)

পার্থিব ধন রত্ন নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য তুমি লোহার সিন্দুক কিনেছ তাতে তালার উপর তালা লাগাচ্ছ; কিন্তু পরমার্থ ধন রক্ষা করবার জন্য তোমার কোনই যত্ন চেষ্টা নাই—হৃদয় সিন্দুকের জীর্ণ তালা খুলেই রেখেছ। সাবধানী বটে!

(৩)

কেউ তোমাকে চাকুরী জুটিয়ে দিলে, তুমি তার কত গুণ গান—কত তোষামোদ কর, কথায় ও কাজে কত কৃতজ্ঞতা দেখাও; কিন্তু যিনি তোমাকে দেহ দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন—সর্ব্বোপরি ধনরত্নপূর্ণ শস্য শ্যামল ধরণীতে ধরণীর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে তুমি ভুলেও একবার ভাবনা। কৃতজ্ঞ বটে!

(৪)

দেহ রোগের চিকিৎসার জন্য তুমি বৈদ্য, ডাক্তার আন, হাসপাতালেও যাও; কিন্তু মনো-রোগের চিকিৎসার বেলায় তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন। বুদ্ধিমান বটে!

শুক্রনীতি-সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীভবতোষ জ্যোতিষার্ণব)

যিনি একমাত্র মনকে জয় করিতে অসমর্থ, তিনি কিরূপে এই সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে পারিবেন? অর্থাৎ যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন না তিনি প্রজাবর্গকেও বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন না। ॥১০০

বিষয় সমূহ (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) পরিণামে অসুখকর হইলেও ভোগকালীন আপাতমধুর বলিয়া যে নৃপতির হৃদয় সহজেই উহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে তিনি হস্তীর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েন। অর্থাৎ হস্তী যেমন মহা বলবান হইয়াও নিজ বন্ধনকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করে নৃপতিও তদ্রূপ ভোগ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকেন ॥১০১॥ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটীর এক একটীই মহা বলবান্। মনুষ্য যদি এই পাঁচটীর একটীরও আয়ত্তাধীন হয় তাহাই তাহার বিনাশের কারণ

হইয়া থাকে ॥১০২॥ পবিত্র দর্ভাঙ্কুর যাহার আহার যতদূর ভ্রমণ করিতে যে মৃগ সক্ষম সেও ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ একমাত্র শব্দরূপ বিষয়ই এস্থলে বধের কারণ ॥১০৩॥ দেখিতে পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ শক্তিতে দ্রুমকে অবলীলাক্রমে উন্মুলিত করিতে সমর্থ এরূপ মদমত্ত হস্তীও হস্তিনীর স্পর্শলোভে লুব্ধ হইয়া শীকারী কর্ত্তৃক সহজেই বদ্ধ হইয়া থাকে এস্থলে স্পর্শরূপ বিষয়ই নাশের কারণ। ॥১০৪॥

পতঙ্গ স্নিগ্ধ দীপশিখার আলোক দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর পতিত ও নাশপ্রাপ্ত হয়। এস্থলে রূপ নাশের হেতু ॥১০৫॥ কৈবর্ত্ত হইতে বহুদূরে, অগাধ সলিলে বাস করিয়াও সামিষ লৌহের (খাদ্যযুক্ত বঁড়শীর) লোভে লুব্ধ হইয়া তাহা ভক্ষণ করতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। এস্থলে রস মৃত্যুর কারণ ॥ ০৬॥ ভ্রমর দশন দ্বারা উৎকর্ত্তন করিতে এবং পক্ষ দ্বারা উড্ডীন হইতে সমর্থ হইয়াও গন্ধলোভে লুব্ধ হইয়া পদ্মের বন্ধনে নাশপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে গন্ধ ধ্বংসের হেতু ॥১০৭

অতএব এই বিষসন্নিভ বিষয় পঞ্চক এক একটীই যখন মৃত্যুর হেতুভূত, তখন ইহারা পাঁচটীতে মিলিত হইলে যে নাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ হইতে পারে ১০৮॥ দ্যূত (পণাত্মক পাশাক্রীড়া), স্ত্রী ও মদ্য এই তিনটী অন্যায়রূপে সেবিত হইলে বহু অনর্থকারী হইয়া থাকে। কিন্তু যথাশাস্ত্র ব্যবহৃত হইলে এই তিনটীই আবার ধন পুত্র ও বুদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ হয় ॥১০৯॥ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং নলাদি নৃপতিবৃন্দ দ্যূতক্রীড়াতে অবসন্ন হইয়াছিলেন। দ্যূতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কপট দ্যূতের দ্বারা ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥১১০॥ স্ত্রীগণের নামোচ্চারণই যখন আনন্দদায়ক হইয়া সকাম পুরুষের মানসকে বিকৃত করে, তখন সেই বিলাসবিলোল কটাক্ষ বিশিষ্টা নারীগণকে দর্শন করিলে যে তাহারা মুগ্ধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ॥১১১॥ রহস্য কুশলা, বক্রভাষিণী (মৃদু অথচ গদগদ ভাষিণী) হরিণনয়না কামিনী, এমন পুরুষ কে আছে যাহাকে বশীভূত করিতে না পারে? ১১২॥ সুন্দরী নারী জিতেন্দ্রিয় মুনির মনও হরণ করিতে সক্ষম ইহা নিঃসন্দেহ; তখন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে সুন্দরীর দাস হইবে ইহাতে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? ১১৩॥

(ক্রমশঃ)

উৎকৃষ্ট কলি চূণ।

"আপনারা মূল্যবান ও স্থায়ী ইমারতের জন্য সস্তার খাতিরে কদাচ খারাপ চূণ ব্যবহার করিবেন না। জিনিষের পরিচয় মূল্যে নয়—গুণে। আমাদের কোম্পানীর চূণ দেশবিখ্যাত, সরকারী, রেলওয়ে এবং সমস্ত বড় কাজে বহুকাল যাবৎ সুখ্যাতির সহিত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ইহা সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত। দরও সস্তা—৫২৲ টাকায় ১০০ মণ (বেঙ্গলের জন্য) ৩৮১ মণ বা ১৪ টনের কম অর্ডার লই না। প্রত্যেক গাড়ির অর্ডারের সহিত ১০০৲ টাকা অগ্রিম দেয়। বক্রি টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় করি। অন্য স্থানে অর্ডার দিবার পুর্ব্বে আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন।"

এল্, এম মজুমদার এণ্ড কোং।

লাইম এজেণ্টস্—

ডিহিরি—অন্ সোন্—ই, আই, আর।

হাওড়া—৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে শ্রীযুগলকিশোর সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Alochona Patrika. Registered No. C. 116.

ফোণ নং—১৯১, হাওড়া।

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

৪নং তেলকলঘাট রোড,

হাওড়া।

—:*:—

প্লাকার্ড ও পোষ্টার।

আমরা সুদক্ষ এন্‌গ্রেভার ও মিস্ত্রী রাখিয়া সুন্দর সুন্দর মনোমত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে বিভিন্ন আকারে—এক রঙে ও মিশ্র রঙে নানারকম ছবির মত সুদৃশ্য পোষ্টার ও প্লাকার্ড সুবিধাদরে সরবরাহ করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ম্যানেজার—

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।